রম্যাণি বীক্ষ্য

১১. কামরূপ পর্ব

RAMYANI BEEKSHYA
KAMRUP PARVA
(A Bengali Travelogue)
By Subodh Kumar Chakravarti
Price Rs. 8·50 (Rupees Eight & Fifty Paise) only

— এই লেখকের লেখা —

রম্যাণি বীক্ষ্য

১. দক্ষিণ ভারত পর্ব ২. দ্রাবিড় পর্ব ৩. কালিন্দী পর্ব
৪. রাজস্থান পর্ব ৫. সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬. মহারাষ্ট্র পর্ব
৭. উৎকল পর্ব ৮. উত্তরভারত পর্ব ৯. হিমাচল পর্ব
১০. কাশ্মীর পর্ব ১১. কামরূপ পর্ব

শাশ্বত ভারত

১. দেবতার কথা ২. ঋষির কথা ৩. অসুরের কথা

কয়েকখানি উপন্যাস

রূপম্ ? মণিপদ্ম তুঙ্গভদ্রা আয় চাঁদ
আরও আলো কঞ্চিকুবাচ মেঘ মৌন মন

ভ্রমণকাহিনীর সঙ্কলন গ্রন্থ

শতবর্ষের পথযাত্রা

ছোটদের জন্য

আমাদের দেশ

১. উড়িষ্যা ২. অন্ধ্র

রম্যাণি বীক্ষ্য

কামরূপ পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৩৭৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৩৭৩
প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭৩

মূল্য ৮·৫০ (আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা) মাত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী
সিদ্ধেশ্বর মিত্র

মুদ্রাকর
শ্রীপশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

উৎসর্গ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাঙলা দেশ সম্বন্ধে এখনও কিছু লিখি নি বলে চারিদিক থেকে অনুযোগ আসছে। বাঙলার কথা লিখতেই হবে, তা না লিখলে ভারতবর্ষের কথা সম্পূর্ণ হবে না।

এ যাবৎ যে দশটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে তাতে আসাম ও বাঙলার কথা বাকি ছিল। কামরূপ পর্বে সমগ্র আসাম নেফা নাগাল্যাণ্ড ও মনিপুর রাজ্যের কথা বিবৃত হল। এর পর হবে বাঙলার কথা।

একদা বিশাল ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল এমন অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি। সম্ভব হলে সে সব দেশের কথাও একে একে লেখা যাবে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি আসাম সরকারের ডাইরেক্টর টুরিজ্‌মের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দানাপুর
শ্রাবণ, ১৩৭৩

গ্রন্থকার

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যান্তু বিশ্বতঃ

Let noble thoughts come to us from every side.

—Rigveda, 1-89-i
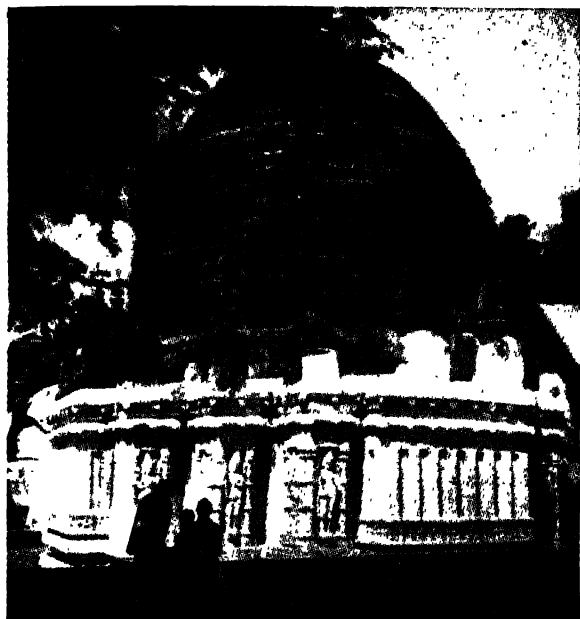
কামাখ্যার মন্দির

ফটো—লেখক
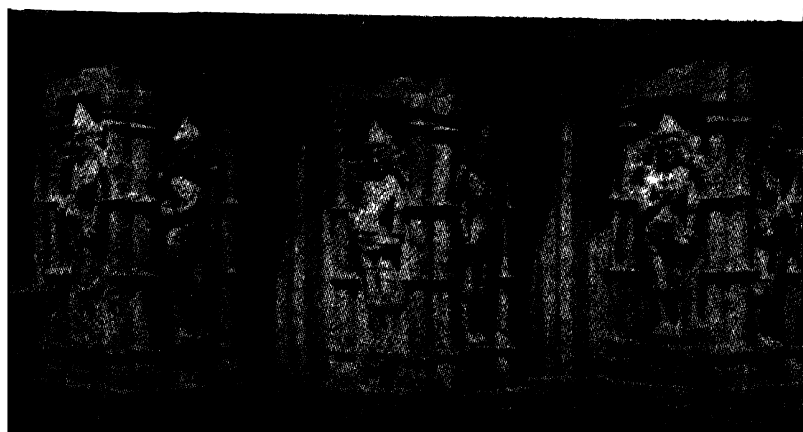
গল্ফ ক্লাব—শিলঙ

ওয়ার্ডস্ লেক—শিলঙ

চেরা বাজার

মোসমায় প্রপাত—চেরাপুঞ্জি
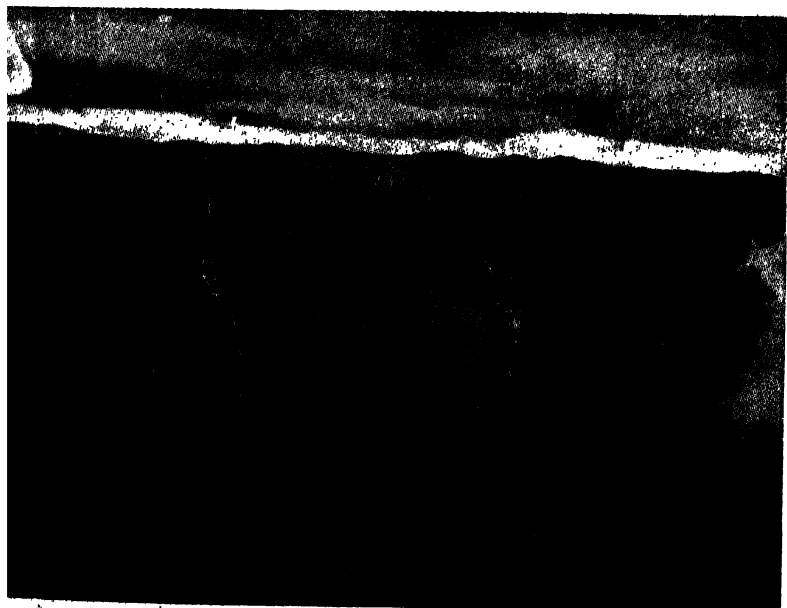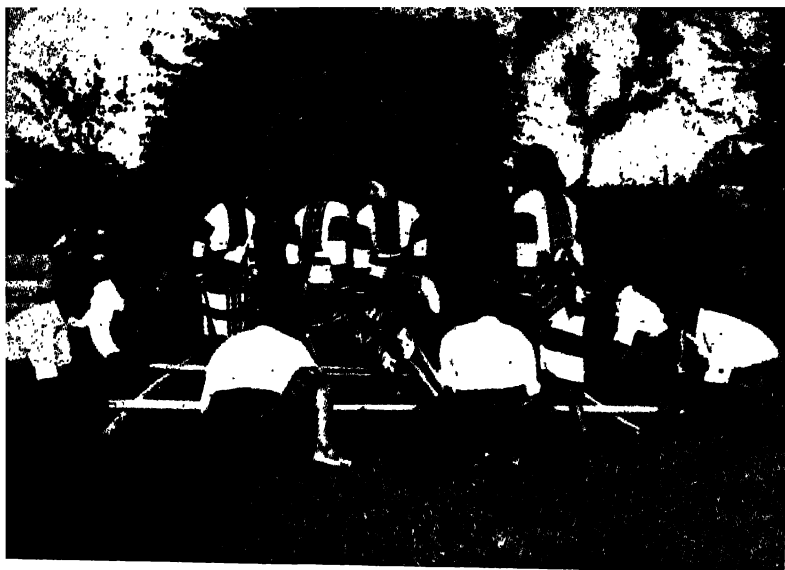
মিজো নৃত্য

বিন ডিয়েন খ্লাম উৎসব—জোয়াই
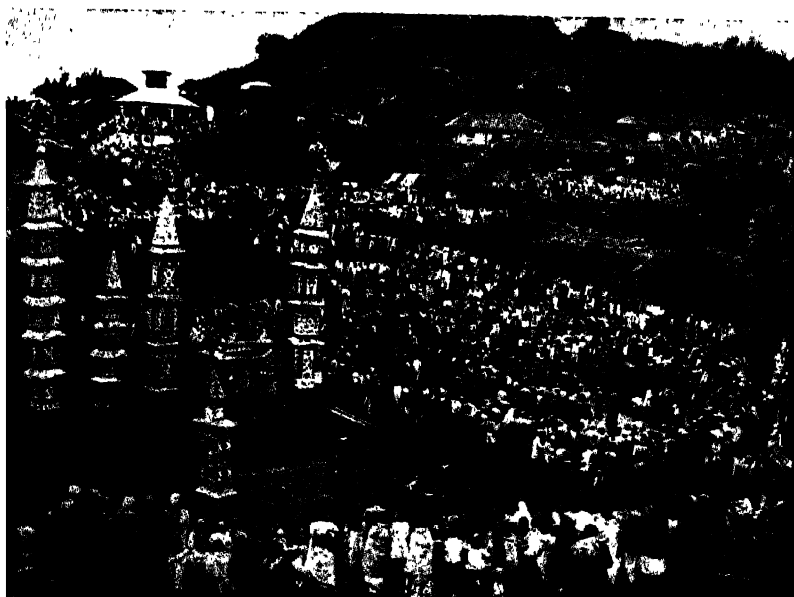
নৃত্যের বেশে খাসি কন্যা

কাজিরঙ্গা স্যাঙ্কচুয়ারিতে

চা বাগানে
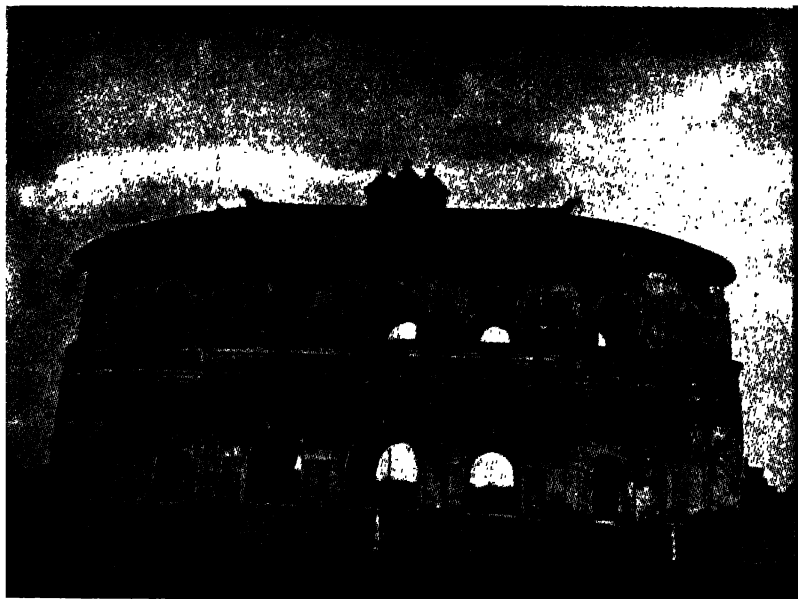
রঙ্গঘর—শিবসাগর

শিবসাগর ও শিবডোল

মানুষবাহী মানুষ

মিকির নারী
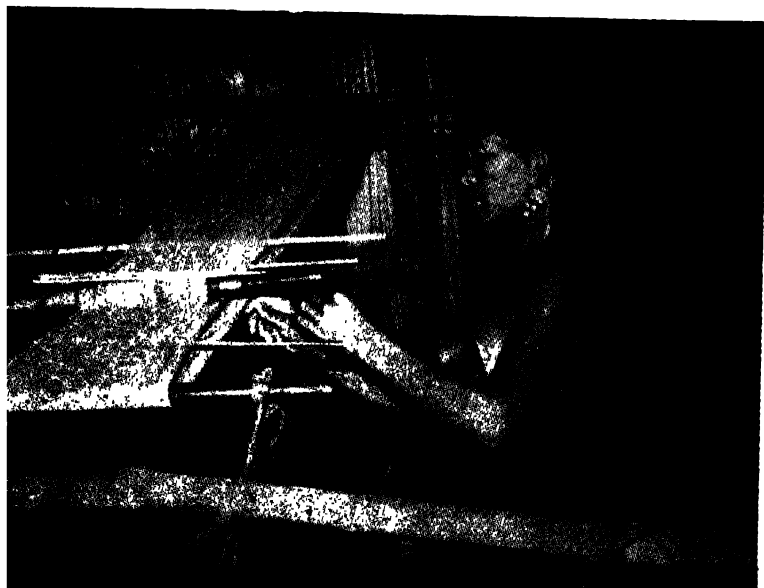
কাশ্মীর থেকে আমাকে বিদায় দেবার সময় মামা বলেছিলেন : আসামে যাচ্ছ যাও, কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রেখ। ও দেশে আশীর্বাদ কারও কাছে নিও না। শাস্ত্রে বারণ আছে।

মামী প্রশ্ন করেছিলেন : কেন ?

খুব গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন : তাহলে শাস্ত্রের বিধানটাই তোমাদের বলতে হয়।—

আশীর্বাদং ন গৃহ্লীয়াৎ পূর্বদেশ নিবাসিনঃ।
শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতি বাদিনঃ॥

বলে নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকের মানে বুঝতে না পেরে মামী বলেছিলেন : মানেটা বলবে, না হা-হা করে শুধু হাসবে !

হাসতে হাসতে মামা উত্তর দিয়েছিলেন : পূর্ব দেশের লোকের কাছে আশীর্বাদ কোন দিন নেবে না। 'শতায়ু ভব' এই কথাকে তারা 'হতায়ু ভব' বলে।

ও দেশের লোক সত্যিই শ-কে হ বলে। তাই সবাই হেসেছিলেন। কিন্তু আমি হাসতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল যে মামার হাসির উৎস তাঁর মন নয়, এটা তাঁর বাহিরের রূপ। ভিতরের কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব এই পরিহাসের আবরণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। বাঙালীর ছেলে বাঙলা দেশে লেখা পড়া শিখে দু মুঠো অন্নের জন্য যাচ্ছে আসামে। বাঙলা দেশে কিছু হল না। কিছু হল না ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও। জীবনযুদ্ধের জন্য এমন জায়গায় যেতে হচ্ছে যেখানে সে অবাঞ্ছিত। এ একটা বেদনার কথা বৈকি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেটের জন্য একটা থিসিস দাখিল করে অনেকগুলো কলেজে চাকরির জন্য আবেদনপত্র পাঠিয়ে এসেছি।

দিল্লীতে আমার বন্ধু চাওলাও আমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। সর্বত্রই সুপারিশের দরকার। তা না থাকলে সরকারের সার্ভিস কমিশনের সিংহদ্বার সকলের জন্য খোলা আছে, মুড়ি মিছরির সমান দর সেখানে। একবার তাদের জোয়াল কাঁধে নিলে সারাজীবন ঘানি টানতে হবে। ভাগ্যবানদের কথা অবশ্য আলাদা।

মামার হয়তো অন্য রকম ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছার সম্বন্ধে ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। তাঁর পয়সার অভাব নেই, ব্যবসা বাণিজ্যও আছে, তা ছাড়া প্রতিপত্তিরও অভাব নেই সরকারী মহলে। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে আমার জীবনটা অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু সে জীবনে তো আমার রুচি নেই। নিজের যোগ্যতায় যা পাওয়া যায় না, তার উপরে আমার লোভ নেই। কাঁচা ভিতের উপর তাসের ঘর গড়া যায়, মর্মরের প্রাসাদ তৈরির স্বপ্ন হবে পাগলামির মতো অর্থহীন।

আসামকে অনেকেই পাণ্ডব-বর্জিত দেশ ভাবেন। মহাভারতের পাণ্ডবরা যে দেশকে নিকৃষ্ট ভেবে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে চান নি, তারই নাম পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। কিন্তু এই সাধারণ অর্থে আসামকে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ বলা যায় না। বনবাসী অর্জুন একবার আসামের উপর দিয়ে মণিপুর রাজ্যে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন তাঁদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে। সেখানে নিজের পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন, আর জীবন ফিরে পেয়েছিলেন পত্নী উলূপীর দয়ায়। সে মহাভারতের কাহিনী।

তবে ঐতিহাসিক প্রমাণে আসামকে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ বলা যেতে পারে। প্রাচীন আর্য জাতি আসামে উপনিবেশ স্থাপন করেন নি। খ্রীষ্টের জন্মের দুহাজার বছর আগে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন পশ্চিম থেকে মালাকান্দ গিরিদ্বার দিয়ে এবং গোমল ও কুরম নদীর উপত্যকা বেয়ে। এ দুটি সিন্ধুর উপনদী। একে একে তাঁরা সিন্ধু

বিতস্তা চন্দ্রভাগা ইরাবতী শতদ্রু ও বিপাশা অতিক্রম করে সমগ্র সপ্ত সিন্ধবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের বারোশো বছর আগে তাঁরা সরস্বতী পেরিয়ে এলেন ব্রহ্মাবর্তে। আরও দুশো বছর পরে তাঁরা গঙ্গা যমুনা গোমতী ও ঘর্ঘরার উপত্যকায় কুরু শূরসেন ও কোশল রাজ্যে বসবাস শুরু করলেন। এর পরে আরও দুশো বছর ধরে পূর্বে ও পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিলেন। পশ্চিমে গেছেন অবন্তী ও সুরাটে, আর পূর্বে বিদেহ মগধ অঙ্গ ও বঙ্গে। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মেগাস্থিনিস এদেশে এসেছিলেন খ্রীষ্টের জন্মের সোয়া তিনশো বছর আগে। আর্যরা তখনও বিন্ধ্যপর্বত ডিঙিয়ে দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশ করেন নি, আর পূর্বেও যান নি বাঙলা দেশ পেরিয়ে আসামে।

ইতিহাস এ কথা মেনে নিয়েছে। অসমিয়া জাতির ইতিহাস আলোচনা করেও এ কথার সমর্থন পাওয়া গেছে। পৃথিবীর তিনটি প্রধান মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নিগ্রোদের আমরা আসামে দেখি না, দেখি ককেশীয় ও মঙ্গোলীয়দের। মঙ্গোলীয় জাতির নানা শাখা উত্তরপূর্বে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ থেকে নানা পথে এসেছে আসামে। উপজাতিরা অধিকাংশই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। তারা প্রাক্-দ্রাবিড় অথবা ভেঙ্গীদ্ প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। একসময় নাগা পাহাড়ে দুটি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে একটি ভেঙ্গীদ্ গোষ্ঠীর। আসামের উপত্যকা অঞ্চলে ককেশীয়দের দেখা পাওয়া যায়। এরা ইন্দো-আর্য, পশ্চিম-ভারত থেকে এসে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আসামে প্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও কলিতারা এই গোষ্ঠীর মানুষ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ধরে যতই এগোনো যাবে, মঙ্গোলীয় প্রভাবও ততই বাড়বে। কোন কোন অঞ্চলে এই দুই জাতির সংমিশ্রণও হয়েছে দেখা যাবে।

একটি প্রবন্ধে আমি আসামবাসীদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা পড়েছিলুম। পরে জেনেছিলুম যে সেসব কথা বিশ্বকোষে আছে।

তাদের নাকি কোন ধর্মের উপর আস্থা নেই। তারা সকলরকম মাংসই উদরসাৎ করে। মরা জন্তুর মাংসও খেতে ভালবাসে। আর ঘি তারা খায় না। তারা বহুবিবাহ করে থাকে। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীলোকের কোন আবরু নেই। তাদের অর্থের প্রয়োজন হলে নিজের স্ত্রীকেও অপর পুরুষের কাছে বাঁধা দিয়ে অর্থ নেয়। যত দিন না সেই অর্থ পরিশোধ করতে পারে, তত দিন সেই স্ত্রী পরপুরুষের কাছে থাকে। পুরুষেরা মাথা দাড়ি ও গোঁফ কামায়। সকলেই খুব সাহসী ও যুদ্ধপটু। দয়ামায়া কাকে বলে তা তারা জানে না। বড়লোকের মৃতদেহ গোর দেয়, সেই সঙ্গে তার পত্নী দাসদাসী সোনারূপো ও খাদ্যসামগ্রীও চাপা দেওয়া হয়। এই জন্যে তাদের গোরস্থানে বৃহৎ গর্ত করতে হয়। তাদের বিশ্বাস যে কবরে ঐ সব দিলে মৃতব্যক্তির আত্মা তা উপভোগ করে।

এ কোন সভ্যজাতির কথা বলে বিশ্বাস হয় না। উপজাতিদের মধ্যে হয়তো অনেক আদিম রীতিনীতির এখনও প্রচলন আছে। তবুও এসব কথা তাদের বেলাতেও প্রযোজ্য কিনা, সে বিষয়েও সংশয় আছে।

আমি কোন দিন এ সব কথা বিশ্বাস করি নি। বড়লোকের কবরে তার স্ত্রী ও দাসদাসীকেও চাপা দেওয়া হবে, এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারবেন না। তবে কেউ হয়তো যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করবেন, বলবেন, যে দেশে সতীদাহ প্রথা এই সেদিনও প্রচলিত ছিল, সে দেশে এই কবর দেবার কথাও অবিশ্বাস্য নয়। প্রভুর সঙ্গে দাসদাসীও চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, এমন নজির আমাদের দেশে আছে।

তবু আমরা আসামকে এক বিচিত্র দেশ বলে মনে করি। আসামের অধিবাসী বলতে বুঝি বিদ্রোহী নাগাদের আর খাসি জয়ন্তিয়া মিজো প্রভৃতি পার্বত্য অধিবাসীদের। তাদের সম্বন্ধে আমাদের আজও কৌতূহলের শেষ নেই।

কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে আমার সেই পুরনো কথা মনে হল। আমার বিধাতাও বুঝি আমার মতো ভবঘুরে, আর তিনিই আমাকে ভারতের পূর্বপ্রান্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। গত দু বছরে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আমার দেখা হয়েছে, দেখা হয়েছে সোমনাথ থেকে কলকাতা। এই চাকরির খাতিরে হয়তো ভারতের শেষ প্রান্তে মনিপুর পর্যন্ত দেখা হয়ে যাবে। কজনের জীবনে এমন ভ্রমণের সুযোগ আসে! এও কি সৌভাগ্য নয়!

২

দিল্লীতে চাওলা বলল : দোস্ত্, এ সবই হল চার আঙুলের খেলা।

চার আঙুলের খেলা আবার কী ?

চাওলা হেসে বলল্ : নিজের কপালটা একবার মেপে দেখ তো !

সত্যিই আমার কপালটা চার আঙুল। চাওলা তার চওড়া কপালটাও মেপে দেখলে। তার মোটা মোটা চার আঙুলে দিব্বি ঢেকে গেল। বলল : এবারে বুঝলে তো দোস্ত্। সবার কপালই নিজের চার আঙুলের সমান। তাই চার আঙুলের খেলা থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই। কপালে যা লেখা আছে তাই হবে।

এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে। পূজার ছুটির আগে যখন মনোরঞ্জনের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, তখন হরিদ্বার থেকে দেশে ফিরবারই কথা ছিল। অলৌকিক ভাবে দেখা হয়ে গেল চাওলাদের সঙ্গে। তারাই আমাকে দিল্লীতে টেনে আনল। দেখা হল মামা মামীর সঙ্গে। তারপর হিমাচল ও কাশ্মীর।

এঁরা কেউই চান না যে ডালহৌসী স্কোয়ারে কলম পিষে আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিই। আমিও যে তা চাই নে, সেকথা এঁরা জানেন না। চাওলার সঙ্গে আমার দিল্লীতেই পরিচয়, কিন্তু সেও আমার সব কথা জেনে ফেলেছে। বুঝেছে যে আসামের চাকরি আমার পছন্দ হয় নি। হতে পারে না। এই চাকরিতে আমাকে অনেক মিথ্যা বলতে হবে, অনেক সত্য গোপন করতে হবে, আর বিবেকে বাধবে এমন কাজও করতে হবে। এরই নাম ব্যবসা। এ না করলে নাকি এ যুগে চলে না। ঠকাবার কায়দা রপ্ত হলেই ঠকবার ভয় কমে।

চাওলা বলল : বিবেকের কথা ভুলে যাও দোস্ত্, ও একটা

অবান্তর কথা। এই শতাব্দীর অভিধান থেকে ও কথাটা কেটে দাও। এ দেশে কে কাকে ঠকাচ্ছে না? দেশের সরকার গরিব প্রজাকে ঠকাচ্ছে, আর প্রজারা ঠকাচ্ছে সরকারকে। মালিক মজুরকে ঠকাচ্ছে, আর মজুররা ঠকাচ্ছে মালিককে। তেমনি ক্রেতা বিক্রেতাকে আর বিক্রেতা ক্রেতাকে ঠকাচ্ছে।

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল: ক্রেতা আবার বিক্রেতাকে ঠকায় কী করে?

নিশ্চয়ই ঠকায়। খাঁটি জিনিস পুরো দাম দিয়ে কেউ নেবে না, দু পয়সা কমে পেলে ভেজাল দেওয়া জিনিসই কিনবে আগ্রহ করে।

আমি জানতুম যে এবারে দেশে ফিরে আমাকে বেকার হয়ে থাকতে হবে। আমার কর্তৃপক্ষ এত দিন অনেক ধৃষ্টতা সহ্য করেছেন। ছুটি নিয়ে আমি কখনও সময়মতো ফিরে আসি নি, কাজে অনুপস্থিত হয়েছি ইচ্ছামতো। অনেক আগেই আমাকে জবাব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার জন্যই পারে নি। তারাও তাদের কর্মীদের ঠকাচ্ছে, আর তা সজ্ঞানে করছে বলেই চোখ রাঙাতে পারছে না। এ সমস্ত ভেবেই আমি নূতন চাকরিটা গ্রহণ করেছি। এত শীঘ্র তার জন্য আপসোস করব না।

মিত্রা বলল: গোপালবাবুর ভয়ের কারণ আমি জানি। 'বংগালী খেদা'র ভয়।

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে এই 'বংগালী খেদা'র বিবরণ পড়েছি। সে এক লজ্জার কাহিনী। আজ কলকাতার লোক যদি বড়বাজারে দাঁড়িয়ে 'মারোয়াড়ী খেদা' বলে লাঠি ঘোরাতে শুরু করে তো সমস্ত বড়বাজার গড়ের মাঠ হয়ে যাবে। আমরা ভারতীয়, সম্মিলিত ভাবে আমরা আমাদের দেশ গড়ছি, এ কথা ভুললে আমাদের চলবে না। কিন্তু আমি কোন উত্তর দেবার আগে মিত্রা নিজেই বলল: এ সব ভাবনার চেয়ে ভ্রমণের এই সুযোগটাকেই বড়

করে দেখুন না। মনে বল পাবেন, উৎসাহও পাবেন। কি নাম দেবেন এই পর্বের?

বলে আমার দিকে তাকাল। আমি কিছু না ভেবেই বললুম: কামরূপ পর্ব।

মিত্রা আশ্চর্য হয়ে বলল: আসাম পর্ব নয় কেন?

বললুম: আসাম তো একেবারে নবীন নাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আহোমরা ওদেশে এসেছিল। তারা শানজাতির একটি শাখা। এই আহোম থেকেই আসাম নাম। কামরূপ নাম অনেক প্রাচীন। শুধু কালিদাসের কাব্যে নয়, পুরাণ ও তন্ত্রেও আমরা কামরূপ নাম পাই। কামরূপ নাম কেন হল কালিকাপুরাণে তার বিবরণ আছে। মহাদেবের শাপে দগ্ধ কামদেব এইখানেই তাঁর রূপ ফিরে পেয়েছিলেন। তাইতেই এই দেশের নাম হয়েছে কামরূপ।

রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা এ অঞ্চলের আরও একটা নাম পাই—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সমর্জ্জ চ। ব্রহ্মা এখানে নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন বলেই দেশের নাম হয়েছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। পরশুরামের লৌহিত্য তীর্থ নামেও এ অঞ্চল পরিচিত। কিন্তু কামরূপ ছাড়া আর সব নাম এখন পরিত্যক্ত হয়েছে।

চাওলা বলল: আমি এই কামরূপ নাম শুনি নি।

বললুম: তুমি পাঞ্জাবের ছেলে, তোমার কাছে এ নাম পরিচিত মনে হবে না। কামরূপ এখন একটি জেলার নাম। কিন্তু পূর্ব-ভারতে হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই কামরূপ নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। কামরূপকে বাদ দিয়ে আসামের কথা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না।

পুরাকালে কামরূপ একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল। শুধু আসাম নয়,

বাঙলার জলপাইগুড়ি রঙ্গপুর ও কুচবিহার রাজ্যও ছিল কামরূপে
অন্তর্গত। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এই কামরূপের সীমা বর্ণিত আছে।—

করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্তু পশ্চিমে॥
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥

করতোয়া থেকে দিক্করবাসিনী পর্যন্ত কামরূপের বিস্তার। পশ্চিমে
করতোয়া নদী ও পূর্বে তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষু নদী, উত্তরে কঞ্জগিরি ও দক্ষিণে
ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম।

ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্॥

এই সুরাসুর সেবিত ত্রিকোণাকার কামরূপ রাজ্য একদিকে একশত
যোজন ও অপরদিকে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত ছিল। রাধাতন্ত্র বলেছে
যে কামরূপ হল ব্রহ্মার মুখ। আর কামাখ্যার অধিষ্ঠানের জন্য সমস্ত
পুরাণ এই রাজ্যকে মহাতীর্থ বলেছে।

এই সব প্রাচীন নাম নিয়ে এ দেশের কেউ গবেষণা করেছেন
কিনা জানি না, তবে বিদেশীরা কিছু বলে গেছেন। দেবীগঞ্জের
নিচে পাথরাজ নামে যে ছোট নদীটি তিস্তায় পড়েছে, তারই নাম
ছিল করতোয়া। আর সদিয়ার কাছে কামরূপপুত্র নামে একটি
নদীই তার পূর্ব সীমানা। কঞ্জগিরি ভুটানের পার্বত্য প্রদেশ।
কামরূপ বুরঞ্জির মতে উত্তরে এই কঞ্জগিরি, পূর্বে মহাচীন, পশ্চিমে
করতোয়া নদী ও দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের শাখা লাক্ষা নদী।

চাওলা আর অপেক্ষা করে নি, বলেছিল: চল দোস্ত্, তোমার
জন্যে কিছু বই-পুঁথি সংগ্রহ করে আনি।

বলে তার ছোট গাড়িটা বার করেছিল। দুজনে বসবার গাড়ি।
কিন্তু তারই ভিতরে আমরা তিনজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলুম।

অনেকগুলো বই-এর দোকানে ঘুরেও আসাম সম্বন্ধে কোন বই

পাওয়া গেল না। সরকারী পুস্তিকা যা পাওয়া গেল, তা না পাওয়ারই সামিল। বাঙলার সম্বন্ধেও কিছু নেই। এই দুটো রাজ্যের সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধরনের ঔদাসীন্য উৎকট ভাবে প্রকাশ পেল। একজন বললেন: গৌহাটি বা শিলঙে আসাম সরকারের টুরিস্ট অফিসে খোঁজ করবেন। কিছু পেতে পারেন। কিন্তু বাঙলা সরকার কিছু করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

ফেরার পথে চাওলা বলল: দোস্ত্, দিল্লীর লোক তবু কলকাতায় যায়, কিন্তু আসামে যেতে চায় না।

আমি বললুম: আসামের সঙ্গে কলকাতার তুলনা করো না। দিল্লীর লোক বাঙলা দেশেও যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের অনেক জায়গায় অতিরিক্ত পয়সা দেওয়া হয় বলে শুনেছি। তা না দিলে যেতে চাইত না।

চাওলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: তোমাকে পাঠানোর পেছনেও হয়তো এই রকমের কিছু আছে। মালিকের আত্মীয় পরিজন কেউ যেতে চাইলে তোমাকে পাঠাত না।

মিত্রা তাড়াতাড়ি বলল: বনবাসী অর্জুনও তো একবার আসামে গিয়েছিলেন, আপনিও না হয় কিছু দিন বনবাস যাপন করে আসুন।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদার দেখা পেলে কী হবে?

বলে চাওলা আমার দিকে তাকাল।

সকৌতুকে মিত্রা বলল: চিত্রাঙ্গদাকে আমরা সামলাব।

চাওলা বলল: ভুল হল, আমরা সুভদ্রাকে সামলাতে পারি। বনবাসী অর্জুনকে সামলাবে কে?

আমি হেসে বললুম: সুভদ্রা নিজে।

৩

দিল্লীতে চাওলাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি কলকাতায় এলুম কলকাতা থেকে আসাম যাত্রা। কলকাতার ব্রাঞ্চ অফিসের বড় সাহেব আরও কিছু কাজ চাপিয়ে দিলেন। বললেন, প্লেনে না গিয়ে ট্রেনে গেলে কোম্পানীর সুবিধা হয়। খরচের নয়, ব্যবস্থার সুবিধা। কিন্তু যে পথে যাবার আয়োজন করে দিলেন তা অভাবনীয়। কোনও যাত্রীই সে পথে যায় না। কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে কিছু কাজ করে গঙ্গা পার হতে হবে দুবার, তারপর মালদহ। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে আসাম। পথে কয়েকটা অফিস পরিদর্শন করে যেতে হবে।

এ রকমের বেয়াড়া হুকুম না পেলে খুব সোজা সহজ পথে আসামে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের প্লেন সোজা গৌহাটি যায়, গৌহাটি থেকে আরও অনেক জায়গায়। আগরতলা শিলচর ও মনিপুর রাজ্যের ইমফলেও প্লেন যায়। ট্রেনে যাবারও সুবিধা আছে। আগে সাহেবগঞ্জ সকরিগলি ঘাটে স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে কাটিহার শিলিগুড়ি হয়ে আমিনগাঁও যেতে হত। সেখানেও স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডু ও গৌহাটি। মোকামায় গঙ্গার উপরে পুল হবার পর থেকে সে পথেও যাওয়া চলত। এখন উত্তরবঙ্গ ও আসামে যাতায়াত হচ্ছে ফরাক্কায় গঙ্গা পার হয়ে। এখানে গঙ্গার উপরে বাঁধ তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। রেলেরও পুল হবে। তখন কলকাতায় বড় লাইনের ট্রেনে উঠলে এই পুলের উপর দিয়ে সোজা নিউ জলপাইগুড়ি নামে একটা নতুন স্টেশনে পৌঁছনো যাবে। জলপাইগুড়ি থেকে অনেক দূরে শিলিগুড়ির খুব কাছে এই স্টেশন। সেখান থেকে মিটার গেজ ট্রেনে উঠলে একেবারে গৌহাটি। ব্রহ্মপুত্রের উপরে নতুন পুল হয়েছে, কিন্তু ফরাক্কায় এখনও স্টীমারে চেপে গঙ্গা পার হতে হয়।

এ সমস্ত পথেই আসাম পৌঁছতে অনেক সময় লাগে। অথচ দেশরক্ষার প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার। সরকার সে বিষয়ে সচেতন আছেন এবং জানতে পেরেছি যে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কুচবিহারের উপর দিয়ে একটা বড় লাইন পেতে আসামকে আরও কাছে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এ পথও শীঘ্র খোলা হবে, কিন্তু তাতে সময় কতটা বাঁচবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য বেরবার আগে কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা করে নিলুম। মনোরঞ্জন বলল ঃ উত্তোরপাড়ার ঘরটা তোমার ছেড়ে দিও না, এখানেই আবার ফিরে আসতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ এ তোমার অনুমানের কথা না গণনার ?

মনোরঞ্জন বলল ঃ আমার অনুমান গণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আরও যা দেখতে পাচ্ছি তা রোমাঞ্চকর।

আমার ডান হাতখানা ছিল মনোরঞ্জনের হাতের মধ্যে। সে এখন হাতও দেখছে। এ সবে বিশ্বাস না থাকলেও জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কী দেখছ ?

মনোরঞ্জন আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ একটা রেখা আর একটু স্পষ্ট হলে বলব।

সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ ভালো, না মন্দ ?

মনোরঞ্জন হেসে বলল ঃ এত ভাল যে বলতে সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু তার আগে—না থাক সেকথা। কলকাতায় ফিরেই দেখা করো, তোমার রেখাটা নজরে রাখতে হবে।

একবার ইচ্ছা হয়েছিল যে রেখাটা আমি চিনে নিই, আর নিজেই নজর রাখি তার উপর। কিন্তু তাতে আমার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে ভেবে চেপে গেলুম।

বাঙলা দেশের কাজ শেষ করে আসামে প্রবেশ করবার আগে

আমি একখানা মানচিত্র খুলে এই রাজ্যটাকে চিনবার চেষ্টা করলুম। কোম্পানীর অফিসে এই টুরিস্ট ম্যাপখানা পেয়েছিলুম। অনেকক্ষণ ধরে সেখানা দেখে মোটামুটি একটা ধারণা হল।

ব্রহ্মপুত্র নদ হল আসামের প্রাণ। এরই উপত্যকায় এ রাজ্যের প্রধান শহরগুলি গড়ে উঠেছে। শিলং শহরটি শুধু পাহাড়ের উপরে। যে হিমালয় পাহাড় সমগ্র ভারতের উত্তর সীমান্তকে প্রহরীর মতো রক্ষা করছে, তাই যেন ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার এক ফাঁক দিয়ে দক্ষিণে নেমে এসেছে। ত্রিপুরা ও মনিপুরও দুটি পার্বত্য রাজ্য।

আসামের সীমান্ত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো নয়। এর প্রায় চতুর্দিকেই আন্তর্জাতিক সীমানা। উত্তরে ভূটান তিব্বত ও চীন, পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্বে পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও মনিপুরের সঙ্গেও আসাম যুক্ত আছে। ত্রিপুরা ও মনিপুর রাজ্য দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ভারতের সঙ্গে আসামের যোগাযোগের পথ বড় সংকীর্ণ। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলা—জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার, পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। আলিপুরদুয়ার জংসন থেকে মিটারগেজ লাইন ফকিরা গ্রামের উপর দিয়ে গৌহাটি এসেছে। ফকিরা গ্রাম থেকে আর একটি লাইন গেছে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ধুবড়ি শহরে। ধুবড়ি যাবার আর একটি পথ ছিল। সেটি কুচবিহার জেলার গিতালদহ জংসন থেকে। সে পথ এখন খোলা আছে কিনা জানা নেই।

গোয়ালপাড়া জেলার প্রধান শহরের নামও গোয়ালপাড়া, কিন্তু সেখানে যাবার জন্য কোন রেলপথ নেই। যে ন্যাশনাল হাইওয়ে উত্তর বঙ্গের উপর দিয়ে আসামে প্রবেশ করেছে, তা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে যোগীখোপায় শেষ হয়েছে, গোয়ালপাড়া নদীর দক্ষিণ তীরে। সেখান থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে গৌহাটি হয়ে এক শাখা শিলঙের উপর দিয়ে পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত গেছে, আর এক শাখা উত্তর-

পূর্বে আসামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেছে। এই পথের উপরেই নওগাঁ জোড়হাট শিবসাগর ডিব্রুগড় ডিগবয় ও সদিয়া। এ ছাড়াও আরও একটি শাখা আছে। তা কাজিরঙ্গের অরণ্য ছাড়িয়ে দ্বিতীয় শাখা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে ডিমাপুর কোহিমার উপর দিয়ে মনিপুর রাজ্য অতিক্রম করে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে পেঁৗছেছে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরেও একটি প্রধান রাজপথ আছে। ধুবড়ি থেকে বিজনি তেজপুরের উপর দিয়ে লখীমপুর পৌঁছেছে। এ অঞ্চলে রেলপথও আছে। শিলিগুড়ি থেকে যে নূতন বড় লাইন আসছে আসামের দিকে, তা যোগীখোপায় আসবে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরেও আসামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রেলপথ আছে। কিন্তু শিলঙে রেল পেঁৗছয় নি। পেঁৗছয় নি ত্রিপুরা ও মনিপুরে।

কুচবিহার থেকে ফিরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আলিপুরদুয়ার জংসনে অযোধ-ত্রিহুত মেল ধরেছিলুম। ভোরবেলায় এই ট্রেন গৌহাটি পেঁৗছবে। ফার্স্ট ক্লাসে যে বার্থখানি আমি পেয়েছিলুম, ফকিরা গ্রাম জংসনে তা খালি হবে। ক্যাপ্টেন চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক রাত নটার পরে সেখানে নামবেন। গভীর মনোযোগে তিনি পাইপ টানছিলেন, কিন্তু আমাকেও যে লক্ষ্য করছিলেন তা বুঝতে পারলুম তাঁর কথা শুনে। বললেন: এ অঞ্চলে কি আপনি নতুন আসছেন?

মুখ তুলে আমি একবার চারিধারটা দেখে নিলুম। প্রশ্নটা যে আমাকেই করেছেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম: আজ্ঞে হ্যাঁ।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন: কিন্তু ম্যাপ দেখে কিছু সুবিধা করতে পারবেন না। দেখছেন তো আমাদের—

বলে নিজের মিলিটারী পোশাক আর তকমা দেখিয়ে কথাটা শেষ করলেন: আমরাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

কেন?

কোনও ম্যাপই মেলে না। যেখানে রাস্তা দেখানো হয়েছে,

সেখানে কিছু নেই ; আবার যেখানে কিছু দেখানো হয় নি, সেখানে দিব্বি পথ আছে মোটর চলাচলের।

তাও কি সম্ভব ?

এ দেশে সবই সম্ভব। এক দিকে সরকারী দপ্তরে কাগজের উপরে সড়ক তৈরি হচ্ছে, আর অন্য দিকে প্রয়োজনের তাগিদে যাতায়াত করেই রাস্তা গড়ে উঠছে। কাগজের উপরে সড়ক তৈরি বোঝেন তো ? খবরের কাগজে টেণ্ডার কল হল। কণ্ট্রাক্ট এগ্রিমেণ্ট হল, বিল এল, পেমেণ্ট হল, অডিটও হয়ে গেল। তারপর আমরা সেই পথের ম্যাপ নিয়ে লটবহর শুদ্ধ এসে দেখি, মাই গড্, পথের কোন চিহ্নও কোথাও নেই। এরই নাম হল কাগজের সড়ক।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম। কিন্তু ভদ্রলোক হাসলেন না, পাইপে আর একটা টান দিয়ে বললেন ঃ হাসলে তো আমাদের চলবে না, দাঁড়িয়ে থাকতেও আসি নি। কাজেই খোঁজাখুঁজি করে একটা পায়ে হাঁটার পথকেই জীপ চলাচলের উপযুক্ত করে নিলুম। সে পথ আপনাদের ম্যাপে উঠল না। এ সব কার দায়িত্ব বলতে পারেন ! কোন দায়িত্ব নেবার কথা আমরা ভুলে গেছি। স্বাধীনতার মানে এখন স্বেচ্ছাচারিতা।

আমি জানি যে এই মত ক্যাপ্টেন চৌধুরীর একার নয়, দেশের কথা উঠে পড়লে আরও অনেকে এই রকম কথা বলেন। দেশকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরাই বলেন এইরকমের কথা। বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা ঠেলে ওঠে বলেই বলেন। আমি তাই এ কথার প্রতিবাদ করলুম না। প্রতিবাদ করবার মতো কীই বা যুক্তি আছে !

ক্যাপ্টেন চৌধুরী নিজেই সামলে নিলেন। বললেন ঃ যাকগে এসব কথা। তার চেয়ে আপনার কথাই বলুন। বেড়াতে যাচ্ছেন, না তীর্থ করতে ?

আমি বললুম : দুটোর কোনটাই নয়। আমি যাচ্ছি কাজে।

বলে সংক্ষেপে নিজের কাজের কথা বললুম।

ভদ্রলোক বললেন : ভাল। ওই কাজের ফাঁকে বেড়ানো আর তীর্থদর্শন দুইই হবে। ভাগ্যবান লোক।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি কি বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি?

ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন, বললেন : কোকরাঝাড় বেড়াবার জায়গাই বটে।

তারপরে বললেন : ফকিরা গ্রাম জংসন থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে একটি মাত্র স্টেশন গেলেই আমার কর্মস্থান। কোন ভদ্রলোক সেখানে বেড়াতে যায় না। তবে এই লাইনের শেষেই ধুবড়ি শহরটি মন্দ নয়। ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটা উঁচু টিলার ওপরে এই শহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যে পরিচিত। শহরের পূর্বপ্রান্তে গদাধর নদী এসে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। এই জায়গাটিও মনোরম। গোয়ালপাড়া জেলার সদর বটে, কিন্তু বাঙালী-প্রধান জায়গা। আসামে এসেছেন বলে আপনার মনেই হবে না।

ভদ্রলোক বোধহয় অনেকক্ষণ মুখ বুজে ছিলেন। তাই এখন কথা বলে আনন্দ পাচ্ছেন। ধুবড়ির সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে নিজে থেকেই শুনিয়ে দিলেন। বললেন : ধুবড়ি নাম কেন হল, এ নিয়ে আমি একটু খোঁজখবর নিয়েছিলুম। তাতে জানতে পেরেছিলুম যে এখানেই ছিল নেতা ধোপানীর পাট। নেতা ধোপানীর নাম শুনেছেন তো?

অকপটে স্বীকার করলুম : শুনি নি।

এই অজ্ঞানতার জন্য ভদ্রলোক আমাকে দোষ দিলেন না, বললেন : লখীন্দর বেহুলার কাহিনী মনে আছে? মৃত লখীন্দরের শব ভেলায় নিয়ে বেহুলা ভেসে যাচ্ছে। তাই নিয়ে মনসার ভাসান গান। তাতেই আছে নিত্যা বা নেতা ধোপানীর পাট। এখানে বলে ধোপাবুড়ি, তার থেকেই ধুবড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : শহরে দেখবার কী আছে ?

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন : রাজা পরীক্ষিতের নাম শুনেছেন ?

বললুম : মহাভারতের রাজা পরীক্ষিতের নাম শুনেছি।

ভদ্রলোক আবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন, বললেন : আমি কোচবংশীয় রাজার কথা বলছি।

কোচরাজাদের কথা আমি কোথায় যেন পড়েছিলুম, কিন্তু পরীক্ষিৎ নাম পাই নি।

আপনার মনে নেই। সেই পরীক্ষিৎ এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। আর শিখগুরু তেগ বাহাদুরের আদেশে এখানে একটি গুরুদ্বার তৈরি হয়েছে। তিনশো বছরের পুরনো এই গুরুদ্বারের নাম দমদম গুরুদ্বার।

মুখে খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে বললেন : অশোকাষ্টমীতে একবার ধুবড়ি আসবেন। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে। ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য মস্ত মেলা বসে। শহরটাও দেখা হবে, পুণ্য সঞ্চয়ও হবে।

রাত নটার পর ফকিরা গ্রামে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। বললেন : একদিন গৌহাটি যাবার কথা আছে, গেলে ঠিক খুঁজে বার করব।

বললুম : খুব খুশী হব তাহলে।

৪

ক্যাপ্টেন চৌধুরী নেমে যাবার পর আমি আমার বিছানা বিছিয়ে নিয়েছিলুম। গাড়িতে আরও তিনজন যাত্রী ছিলেন। একটি পরিবার, বাপ মা ও একটি বছর পনেরো বয়সের ছেলে। যতক্ষণ ভাল লেগেছে ততক্ষণ তাঁরা পত্রিকা পড়েছেন, তারপরে কথা বলেছেন নিজেদের মধ্যে। নিজের পরিচয়ও দেন নি, আমাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহও প্রকাশ করেন নি। এইরকম নির্বিকার যাত্রীই বেশি দেখতে পাই যাঁরা অপরিচিত যাত্রীকে দূরে ঠেলে রাখতেই বেশি ভালবাসেন। আবার ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মতো যাত্রীও আছেন. যাঁরা সেধে আলাপ করেন, আর সেই আলাপকে আত্মীয়তায় পরিণত করতে চান। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই কম।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী নেমে যাবার পরে গাড়িটা আমার ফাঁকা মনে হল। খেয়েদেয়ে তাঁরা শুয়ে পড়লেন। গাড়িতে যেন আর কোন যাত্রী নেই। আমিও খেয়ে নিয়েছিলুম। ভদ্রতা রক্ষার জন্যে আমিও বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু আমার চোখে ঘুম এল না। অনেক আকাশ পাতাল কথা আমার মনে আসতে লাগল।

ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে নিচের দুখানা বার্থ দখল করেছিলেন, আর ছেলেটি আমার মতো একখানা উপরের বাঙ্কে উঠেছিল। ওই ভদ্রলোক যদি মামা হতেন, তাহলে এত শীঘ্র আমাকে উপরে উঠতে দিতেন না। ডিনারের পর পাইপে আগুন ধরিয়ে বলতেন, গোপাল অমন চুপ করে আছ কেন, কিছু বল। তার মানে, আসামের ইতিহাস শোনাতে হবে তাঁকে। কামরূপ আর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পৌরাণিক কাহিনী। বেদে উল্লেখ আছে কিনা, রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণে যা লেখা আছে সেই সব ইতিবৃত্ত। এ সব কথা শোনাতে না পারলে তিনি খুশী হবেন না।

এক সময় প্রাচীন ভারতের কথা আমি সযত্নে পড়েছিলুম। তার কিছু মনে আছে, আর ভুলে গিয়েছি কিছু। কামরূপের চেয়ে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামটা বেশি পুরনো তা মনে আছে। যত দূর মনে আছে, বেদে উল্লেখ আছে বলে পড়ি নি। রামায়ণে ও মহাভারতে আছে, আর আছে নানা পুরাণে ও তন্ত্রে। কালিকা-পুরাণেই সবচেয়ে বেশি কথা আছে, আর যোগিনীতন্ত্রে। এক সময় এদেশে তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য ছিল বলে এই তন্ত্রে অনেক কথা আছে, তখন এদেশের নাম কামরূপ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম আমি প্রথম কোথায় পেয়েছি ভাবতে লাগলুম। একটা প্রবন্ধে পড়েছিলুম যে রামায়ণে আছে, কুশের পুত্র অমূর্তরজয় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন। রামায়ণের কোথায় এ কথা আছে, তা আমার জানা নেই। আমার যা জানা আছে সে একেবারে উল্টো কথা। সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব যখন চারিদিকে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি বললেন,

যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥

বরুণালয় অতলান্তিক সমুদ্রে তোমরা সুবর্ণশৃঙ্গের বরাহ পর্বত দেখতে পাবে, চৌষট্টি যোজন তার বিস্তার। সেইখানেই দুষ্টাত্মা দানব নরকের প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে পুরী।

এই বর্ণনায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় না। সুষেণ মারীচ প্রভৃতি বানরদের পশ্চিম দেশে পাঠাবার সময় সুগ্রীব এই কথা বলেছিলেন। এর থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ মনে করা অন্যায় নয়। মহাভারতের বর্ণনাতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ত্রিগর্ত দেশ থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে

গিয়েছিল, সেখান থেকে সিন্ধু দেশে। সেই ঘোড়ার সঙ্গে ছিলেন অর্জুন। ত্রিগর্ত দেশের অবস্থান আমরা জানি, বর্তমান পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশেই ছিল ত্রিগর্ত। সিন্ধু দেশের নাম এখনও বদলায় নি। কাজেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভাবতেই আমাদের সুবিধা হয়। কৃষ্ণের পক্ষেও এই রাজ্যের রাজা নরকাসুরকে বধ করে তাঁর অন্তঃপুরিকাদের দ্বারকায় আনার খুব সুবিধা হত। কিন্তু তারপরে আর মিলবে না। নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁর কিরাত ও চীনা সৈন্য নিয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। কিরাত রাজ্য যেখানেই হোক চীনা সৈন্য পেতে হলে ভারতের পূর্ব প্রান্তেই তাঁকে থাকতে হবে। পণ্ডিতেরা বলেন, ত্রেতাযুগে ভারতের পূর্বপ্রান্তেও হয়তো সমুদ্র ছিল। কিংবা ব্রহ্মপুত্রকেই সমুদ্রের তুল্য মনে করা হত। আর পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার ভারত পরিক্রমায় কোন পরম্পরা রক্ষা করা হয় নি।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কথায় নরকাসুরের কথাই প্রথমে এসে পড়ে, কিন্তু নরকাসুরই সে রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন না। ব্রহ্মা একটি জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করেছিলেন বলে রাজ্যের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হল, কিন্তু রাজা কে হলেন তার বিবরণ নেই। পুরাণে মহীরঙ্গ নামে এক দানবরাজের কথা পাওয়া যায়, তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর। মহীরঙ্গের বংশপরিচয় আমাদের জানা নেই, কী করে এই রাজ্য অধিকার করেছিলেন সেকথাও আমাদের অবিদিত। শুধু এইটুকু জানি যে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বংশের চারজন দানব এই রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। তারপরে নরক। ষোল বৎসর বয়সে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য অধিকার করেন।

নরকাসুরের জন্মবৃত্তান্ত আমাদের জানা আছে। কালিকাপুরাণে আছে সেই কাহিনী। নরক বরাহরূপী বিষ্ণুর পুত্র, ধরিত্রী তার মা। ধরিত্রীকে পাতাল থেকে উদ্ধার করবার জন্য বিষ্ণু বরাহ

অবতার হয়েছিলেন। এই অবতারেই তিনি হিরণ্যাক্ষ অসুর বধ করেন। তারপর দীর্ঘ দিন তিনি ধরিত্রীর সঙ্গে বাস করেন। ধরিত্রীর অপবিত্র অবস্থায় জন্ম বলে নরকের অসুর ভাব ছিল। কিন্তু রাজর্ষি জনক তাঁকে সীতার পরে তাঁর যজ্ঞভূমিতে লাভ করে সাত্বিক ভাবে লালন পালন করেন। বিষ্ণু তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে যত দিন নরক মানুষ ভাবে প্রকৃতিরঞ্জন করবে, ততদিন তার সৌভাগ্য থাকবে অব্যাহত। অসুর ভাব প্রাধান্য পেলেই মৃত্যু আসন্ন হবে। বিষ্ণুর বরেই নরক কিরাতরাজ ঘটককে পরাজিত করে প্রাগ্‌-জ্যোতিষ রাজ্য অধিকার করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বৎসর। বিদর্ভ রাজকন্যা মায়াকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এর পরে মানুষ ভাবে দীর্ঘ দিন তিনি রাজত্ব করেছিলেন, আর অনেক উন্নতি করেছিলেন রাজ্যের।

ত্রেতা যুগের অবসানে তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা হল বলির পুত্র বাণের। এই অসুরভাবাপন্ন বাণ তখন শোণিতপুরের রাজা। আসামের তেজপুরে ছিল এই শোণিতপুর। অসৎ সঙ্গে যা হয়, নরকেরও তাই হল। নরক মানুষ ভাব ত্যাগ করে অসুর ভাবে জীবন যাপন আরম্ভ করলেন। দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি আর রইল না, তিনি অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। একদিন তিনি দেবকন্যাদের দিকেও হাত বাড়ালেন। ষোল হাজার দেবকন্যা হিমালয়ে বিচরণ করছিলেন। নরক সবাইকে হরণ করে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে এলেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল আনলেন হরণ করে। এই নিয়েই কৃষ্ণের সঙ্গে তার বিবাদ বেধেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

কিন্তু তার আগে বশিষ্ঠ মুনির শাপের গল্প। বশিষ্ঠ জীবনে কাউকে শাপ দেন নি। নিজের শত পুত্রকে বিশ্বামিত্র হত্যা করবার পরেও নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। বশিষ্ঠ শাপ দিয়েছিলেন শুধু নিমি রাজাকে আর নরকাসুরকে। কামাখ্যা দেবীর দর্শনের জন্য

তিনি যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এসেছিলেন, তখন নরক তাঁকে পুরীতে প্রবেশ করতে দেন নি। দেবীর দর্শন না পেয়ে বশিষ্ঠ নরককে শাপ দিলেন, উদ্ধত অসুর, দেবদ্বিজে অশ্রদ্ধাই তোমার পতনকে অনিবার্য করে তুলছে। তোমার মৃত্যু হবে তোমার জনকের হাতে, আর তোমার জীবদ্দশায় কামাখ্যা দেবী আর এখানে অধিষ্ঠান করবেন না।

অভিশপ্ত নরকাসুর ব্রহ্মার আশ্রয় নিলেন। ব্রহ্মার বরে তাঁর চার পুত্র হল—ভগদত্ত মহাশীর্ষ মদবান ও সুমালী।

তখন দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে এসেছে। কৃষ্ণ দ্বারকায় অধিষ্ঠান করছেন। ইন্দ্রের অপমানের কথা শুনে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরককে আক্রমণ করতে এলেন। এসে দেখলেন যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নগর দুর্ভেদ্য দুর্গ ও পর্বতে খুবই সুরক্ষিত। মুর নামে এক দৈত্য নগর রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। কৃষ্ণ এসে শঙ্খনাদ করলেন। মুর জল থেকে উঠে সসৈন্যে কৃষ্ণকে আক্রমণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর চক্র দিয়ে মুরের মস্তক ছেদন করলেন। একে একে নরকাসুরের সেনাপতি ও পুত্ররাও নিহত হন। তখন নরকাসুর নিজে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তুমুল যুদ্ধ হল। কৃষ্ণ চক্র দিয়ে তাঁরও মাথা কেটে ফেললেন।

নরকাসুরের মা ধরিত্রী কৃষ্ণের স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করলেন, ফিরিয়ে দিলেন অদিতির কুণ্ডল ও অন্যান্য অপহৃত দ্রব্য। নরকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগদত্তকে সিংহাসনে বসিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

ফিরে যাবার সময় কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর থেকে কী নিয়ে গিয়েছিলেন তার বিবরণ আছে হরিবংশে। কোষাগার থেকে নিয়েছিলেন বিবিধ ধনরত্ন, শয্যা ও সিংহাসন, আট লাখ হাতী ও প্রবালের অঙ্কুশ, পাখী খেলনা প্রভৃতি। আর সেই ষোল হাজার দেবকন্যা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে কন্যারা কৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করেছিলেন।

এই নরকাসুর সম্বন্ধে আরও অনেক কিংবদন্তী আছে। কামাখ্যা পাহাড়ে পথ নির্মাণের কাহিনী আমি পরে শুনেছিলুম। কিন্তু

যাত্রাগানে নরকাসুর পালার অভিনয় দেখেছিলুম শৈশবে। সে গল্প এখন আর আমার মনে নেই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগদত্তের বিক্রমের কথা আমরা মহাভারতের দ্রোণপর্বে পড়েছি। ভগদত্ত তার কিরাত ও চীনা সৈন্য নিয়ে কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এক সুসজ্জিত হাতীর পিঠে তিনি আরোহণ করেছিলেন। তাঁর গলায় মালা ও মাথায় শ্বেত ছত্র। যে হাতীতে চড়ে ইন্দ্র দৈত্য দানব জয় করোছলেন, সে হাতীর বংশধর ছিল তাঁর বাহন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ নিহত হলেন ও পাঞ্চাল সৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল। ভগদত্ত ভীমের দিকে ধাবিত হলেন। হাতীর গর্জন শুনে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয়ই ভগদত্তের হাতী, এ তো অস্ত্রের আঘাত ও আগুনের স্পর্শ সইতে পারে, ভগদত্ত আজ সমস্ত পাণ্ডব সেনা ধ্বংস করবেন। তারপর অর্জুন এসে ভগদত্তের সম্মুখীন হলেন। তুমুল যুদ্ধ হল। কৃষ্ণার্জুনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত হাতীকে চালনা করলেন। কৃষ্ণ রথ সরিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। অর্জুন শরাঘাতে হাতীর বর্ম ছিন্ন করলেন। তাই দেখে ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ করে অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে পিছনে রেখে নিজের বুকে সেই অস্ত্র ধারণ করলেন। বৈজয়ন্তীর মালা হয়ে সেই বৈষ্ণবাস্ত্র কৃষ্ণের কণ্ঠলগ্ন হল।

অর্জুন খুবই দুঃখিত হলেন। বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যুদ্ধ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। কিন্তু আমি সমর্থ ও সতর্ক থাকতেও তুমি কেন তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে!

কৃষ্ণ বললেন, ধরিত্রীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নরকাসুরকে আমি বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলাম। পিতার কাছে ভগদত্ত এই অস্ত্র পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বে এই অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই। তাই তোমাকে রক্ষার জন্যই আমাকে এই অস্ত্র ধারণ করতে হল। এখন এই মহাসুর ভগদত্তকে তুমি বধ কর।

নারাচ নিক্ষেপ করে অর্জুন ভগদত্তের বাহন হাতীটি বধ করলেন।

তার পর অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের মৃত্যু হল।

শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী ছিলেন ভগদত্তের ভগিনী। ভগদত্তের পুত্রের নাম ছিল বজ্রদত্ত। মতান্তরে তিনি ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই বজ্রদত্ত যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরেছিলেন। কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন। অর্জুন তাঁকে একজন সামন্ত রাজা বলে স্বীকার করেন। বজ্রদত্তের পরে পুষ্পদত্ত প্রভৃতি রাজারা বংশপরম্পরায় প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা হয়েছিলেন।

মহাভারতে সঞ্জয় যে সব জনপদের নাম করেছিলেন, তার মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম নেই। ভগদত্তকে কিরাত দেশের রাজা বলা হয়েছে। মনুসংহিতাতেও প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের নাম নেই। কিন্তু এই নাম প্রায় সমস্ত পুরাণেই আছে। বিষ্ণুপুরাণে দেখি কামরূপ নাম। গরুড়পুরাণেও তাই। তন্ত্ররচয়িতারাও কামরূপ নাম ব্যবহার করেছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ দুটো নামই লিখেছেন। আবার বরাহ-মিহিরের ভারত বিভাগে কামরূপ নাম অনুপস্থিত। অনেকে এ দুটি নাম ব্যবহারের একটা প্রাচীন রীতি অনুমান করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, রাজ্যের নাম ছিল কামরূপ, আর তার রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। বর্তমান কামরূপ আসামের একটি জেলা, আর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম হয়েছে গৌহাটি।

আমরা গোয়ালপাড়া জেলা অতিক্রম করে কামরূপ জেলায় প্রবেশ করেছি কিনা জানি না। সকালে আমরা গৌহাটি পৌঁছব। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটছিল, তারই একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝতে পারি নি।

৫

গৌহাটির কাছে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে একটি নতুন স্টেশন হয়েছে। বোধহয় নগণ্য স্টেশন, তাই কোন ভাল ট্রেন সেখানে দাঁড়ায় না। অন্ধকারে সে স্টেশন আমরা পেরিয়ে গেলুম। টাইম টেবল দেখা না থাকলে এ স্টেশনের নাম আমি জানতে পারতুম না।

ব্রহ্মপুত্রের উপরে নতুন পুল হবার পর থেকে পথের কষ্ট কমেছে অনেকটা। আগে সমস্ত ট্রেন এসে আমিনগাঁও-এ দাঁড়াত। সেখানে ফেরি স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডু স্টেশন। পাণ্ডু থেকে গৌহাটি ট্রেনে। বিশাল বিস্তৃত বক্ষ ব্রহ্মপুত্রের। বর্ষার সময় কূলে কূলে ভরা থাকে, অন্য সময়ে যায় শুকিয়ে। তখন কাঠের পুলের উপর দিয়ে দীর্ঘ বালির চর হেঁটে পার হয়ে স্টীমার ধরতে হয়। ওপারে হাঁটতে হয় না, পাণ্ডুর স্টেশনের নিচেই এসে স্টীমার ভিড়ত। যাত্রীদের সে অসুবিধা এখন দূর হয়ে গেছে। আমিনগাঁও পাণ্ডু থেকে খানিকটা দক্ষিণে এই পুল তৈরি হয়েছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন আর আমিনগাঁও-এ আসে না, পাণ্ডুতেও না, পুল পেরিয়ে সোজা এসে গৌহাটিতে দাঁড়ায়। অন্ধকারেই আমরা এই পুল পার হলুম, আর রাত অন্ধকার থাকতেই গৌহাটি স্টেশনে এসে পৌঁছে গেলুম। কুলিদের কোলাহলে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পড়ে বিছানা গুটিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম।

রাত্রির তখন শেষ প্রহর। অন্ধকার কিছু স্বচ্ছ হলেও তাকে প্রত্যূষ বলা চলে না। ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজেছে। ভেবেছিলুম যে স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নেব। তারপর বেলা হলে অফিসের দিকে পা বাড়াব। 'কিন্তু একজন অপরিচিত লোককে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালুম।

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে আমাদের ফার্মের একখানা কার্ড বার করল। আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকের বুঝতে বাকি রইল না যে মানুষ চিনতে তার ভুল হয় নি। হেসে বলল : আজ্ঞে, আমার নাম কাকতি, কাল বিকেলেই আপনার টেলিগ্রাম আমরা পেয়েছি।

কিন্তু আমাকে চিনলেন কী করে ?

কাকতি মাথা চুলকে বলল : অভ্যাসে। আপনি হলেও চিনতে পারতেন।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলুম যে আমার মতো একা কেউ আসেন নি। সকলের সঙ্গেই পরিবার আছে। একা কেউ এসে থাকলেও তাঁদের দিকে নজর পড়ছে না। বললুম : রাতে আপনি কষ্ট করেছেন কেন ?

বাধা দিয়ে কাকতি বলল : রাত কোথায় সার্! বাড়িতে আমরা ভোর চারটেতেই উঠি, আজ স্টেশনে চলে এসেছি। আপনি নতুন মানুষ, আপনার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলা বলছে। বোঝার উপায় নেই যে সে বাঙালী নয়। আমার বাক্স বিছানা মাথায় নিয়ে কুলি অপেক্ষা করছিল। তাকে বললুম : ওয়েটিং রূমে চল।

কাকতি কলরব করে উঠল : ওয়েটিং রূমে কেন! আপত্তি না থাকলে গরিবের বাড়িতে চলুন। অফিসেও একটা ঘর আমরা খালি রেখেছি।

আমি বললুম : অনির্দিষ্টকাল তো কোথাও থাকা যায় না, তার চেয়ে একটা হোটেলেই চলুন।

অনেক যুক্তিতর্কের পর কাকতি আমার প্রস্তাবে রাজী হল। বলল : কিন্তু বিলিতি হোটেল তো এখানে নেই, সবই দেশী হোটেল।

বললুম : আমিও তো দেশী মানুষ। দেশী হোটেলই আমার পক্ষে ভাল।

ফার্মের গাড়ি এসেছিল। সেই গাড়িতেই কাকতি আমাকে একটা হোটেলে পৌঁছে দিল। বলল : কয়েকটা দিন একটু কষ্ট করুন। এর মধ্যেই একটা ভাল বাড়ি খুঁজে বার করব। তারপর—

বলে কাকতি থেমে গেল।

আমি বুঝতে পারলুম যে সে আমার পরিবারের কথা ভাবছে। হাসলুম মনে মনে। আমার কাছে কোন উৎসাহ না পেয়ে তার পরের কথা কাকতি আর বলল না। শুধু বিদায় নেবার সময় বলে গেল : একটা নিবেদন আছে সার্।

বললুম : অসঙ্কোচে বলুন।

আমার কথা কাউকে বলবেন না।

আমি হেসে বললুম : আচ্ছা।

কাকতি মিনতি করে বলল : আমার সঙ্গে যে আপনার পরিচয় হয়েছে, কেউ যেন তা টের না পায়। আমাদের ড্রাইভার খুব বিশ্বস্ত, সে কাউকে বলবে না।

ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করি, অত ভয় কেন? কাকে ভয়? ভয় যদি এতই তো এমন কষ্ট করে এলে কেন? কিন্তু সৌজন্য বোধে কোন প্রশ্ন করতে পারলুম না। আগের মতোই হেসে বললুম : আমিও কাউকে বলব না।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই আমি অফিসে গেলুম। ফার্মের গাড়ি আমাকে নিতে এসেছিল, পরিচয় হল সকলের সঙ্গে। মিস্টার বড়ুয়া এই অফিসের ম্যানেজার, কাকতি একজন সাধারণ কেরানী, তার মতো চাকুরে আরও কয়েকজন আছে। সেলস্ ডিপার্টমেন্টে মেয়েই বেশি। মেয়েরা সপ্রতিভ, কাজে-কর্মেও তৎপর। এরা যে খাসি পাহাড়ের মেয়ে তা আমি জেনেছিলুম। শিলঙ শহরে এদের প্রতিপত্তি দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলুম।

এই অফিসটি এখনও কলকাতার অধীন আছে, আসামের অন্য অফিসগুলি এই অফিসের অধীন। অদূর ভবিষ্যতে গৌহাটির অফিসটি দিল্লীর অধীনে আসবার সম্ভাবনা আছে। কাজকর্ম দেখতে দেখতেই আমি আরও একটি কথা জানতে পারলুম। আমি কোনও নূতন পোষ্টে আসি নি। আমার আগে যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে সহসা দিল্লী থেকে তলব করে নেওয়া হয়েছে। এরকম হুকুম যে একটা আসবে তা নাকি অনুমান করা গিয়েছিল। কলকাতা থেকে বড় সাহেব এই অফিস পরিদর্শনে এসে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান নি। এই অসন্তোষের কথা আমিও জানি। কিন্তু তার কারণ জানি নে। মিস্টার বড়ুয়া আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন: কাজকর্মের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। ফার্মের দুর্নাম যাতে না হয়, তার জন্যে আমরা সবাই সমান মনোযোগী।

সকলের সঙ্গে আমার ইংরেজীতেই কথাবার্তা হয়েছে। বাঙলা আমি বলি নি। বলব না বলেই ঠিক করেছি। এ দেশের ভাষা কিছু আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজীতেই কাজ চালিয়ে যাব। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক ভাষাই বিরোধের সৃষ্টি করছে। সে সম্বন্ধে সজাগ থাকা উচিত।

অফিস থেকে ফেরার সময় গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। মিস্টার বড়ুয়া আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম: এ সময়ে আমার হাঁটতেই ভাল লাগে।

মিস্টার বড়ুয়া বললেন: সারাদিন পরিশ্রমের পর—

পরিশ্রম আর কী হয়েছে!

বলে তাঁকে নমস্কার করে আমি এগিয়ে গেলুম।

গৌহাটি শহর কলকাতা শহরের মতো নয়, এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ বা নাগপুর হায়দ্রাবাদের মতোও নয়। বাঙলাদেশের অন্য শহরের সঙ্গে কিছু মিল আছে, কিছু নেই। এক দিকে বিরাট নদী ব্রহ্মপুত্র,

অন্য দিকে পাহাড়, মাঝখানে শহর। ঠিক এ রকমটি কোথাও দেখি নি।

অল্প দূর অগ্রসর হতেই কাকতিকে দেখতে পেলুম। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, আমাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল। অফিসে আমি তার আচরণ লক্ষ্য করেছিলুম। এমন ভালমানুষের মতো এগিয়ে এসেছিল যে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগতে পারে নি। পরিচয় করিয়ে দেবার পরেই ফিরে গিয়েছিল নিজের জায়গায়। একটি কথাও বলে নি। এবারে মাথা চুলকে বলল: রাতে ঘুম হয় নি, আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললুম: বেশ ভাল লাগছে হাঁটতে। কাছে যদি দেখবার কিছু থাকে তো দেখে যেতে পারি।

কাকতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: আমি তামাশা করছি না। নতুন জায়গা দেখতে আমার ভারি ভাল লাগে।

কাকতি উৎসাহিত হয়ে বলল: এখানে দেখবার জায়গা অনেক আছে, অনেক দিন ধরে দেখেও শেষ করতে পারবেন না। কিন্তু কাছে কিছুই নেই। ছুটির দিনে দেখতে হয়।

হঠাৎ কী ভেবে বলল: জনার্দনের মন্দির দেখবেন? নদীর ধারে শুক্রেশ্বর পাহাড়ে একটুখানি উঠতে হবে। একেবারে সহরের মধ্যেই মন্দির।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও হয় নি। বললুম: অন্ধকার না হলে আর আপত্তি কী!

কাকতি পা চালিয়ে বলল: তাহলে আসুন তাড়াতাড়ি।

সহরের যে অঞ্চলে এই পাহাড় তার নাম পানবাজার। নদীর ধারেই এই ছোট পাহাড়টি শুক্রেশ্বর পাহাড় নামে পরিচিত। নিচের দিকে জনার্দনের মন্দির, ভিতরে বিষ্ণুর মূর্তি। নিকটেই শুক্রেশ্বর শিবের মন্দির। অনেকে শুক্লেশ্বরও বলেন। কামাখ্যা মন্দিরের ছবি

আমি দেখেছি, এ মন্দিরের শিখরটিও ঠিক তেমনি। কাকতি বলল: দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে প্রবাদ। লোকের বিশ্বাস যে শুক্রেশ্বর শিবের দর্শন হলে মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

অন্ধকার হতে আর বিলম্ব নেই। নামবার পথে কাকতি বলল: এখন এখানে একটি সংস্কৃত টোল আছে, আর—

আর কী?

পাহাড়ের গায়ে একটি বুদ্ধের মূর্তি আছে।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: সত্যি নাকি!

কাকতি আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে নদীর দিকে নিয়ে গেল। গাছে গাছে আচ্ছন্ন একটি জায়গায় পাহাড়ে খোদা বুদ্ধের মূর্তিটি আমি দেখলুম। দক্ষিণে মহাবল্লীপুরমে যেমন পাহাড়ে খোদা মূর্তি দেখেছি, কতকটা সেই রকম। বুদ্ধের মূর্তি বলেই মনে হল। কাকতি বলল: ভারি অদ্ভুত পাহাড় এটি। শুধু বিষ্ণু আর শিব নয়। বুদ্ধও আছেন।

আমরা যখন হোটেলে ফিরলুম, গৌহাটির অন্ধকার পথে তখন বিদ্যুতের আলো জ্বলছে।

কাকতিকে বিদায় দেবার পর আমার এক নতুন চিন্তা মনে এল। এখানে আমার সময় কাটবে কী করে! প্রথম কিছু দিন কাজে ডুবে থাকা যায়, নিজের কাজ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার জন্য তাই দরকার। আসামের নানা স্থানে এখন ঘুরেও বেড়াতে হবে। অন্তত এই রাজ্যের সবকটি অফিস তাড়াতাড়ি করে একবার পরিদর্শন করে আসতে হবে। তাতে কয়েকটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যাবে জানি, কিন্তু মনের খোরাক যোগাবার মতো কোন কাজ বা সঙ্গী না পেলে সবই নিরর্থক মনে হবে। ভাবলুম, কাল সন্ধ্যাবেলায় কোনও লাইব্রেরিতে গিয়ে বসব। বইও তো সঙ্গী।

একা বসে বসে শুক্রেশ্বর পাহাড়ের সেই বুদ্ধমূর্তির কথা মনে পড়ল। আমি যতদূর জানি, আসামে বৌদ্ধধর্মের প্রসার তেমন হয় নি। আসামের কোনও বুরঞ্জীতে নাকি আছে যে পালবংশীয় সতেরোজন রাজা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের নাম জয়ন্ত চক্রপাল ভূমিপাল ইত্যাদি। এঁরা নাকি একশো পাঁচ বছর করে রাজত্ব করেন। লক্ষ্মীপাল সাতাত্তর বছর ও তাঁর পর সুবাহু আবার একশো পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। এই অসম্ভব কথার জন্য এই বুরঞ্জীর অনেক কথাই লোকে অবিশ্বাস করেন।

চীনের বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউএন চাঙের কথা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপে এসেছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনের বর্তমান নাম পাবনা। সেখান থেকে দেড়শো মাইল পথ পূর্বদিকে অতিক্রম করবার পর একটি বিরাট নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই নদী পার হয়ে কামরূপ রাজ্য। হিউএন চাঙ নদীর নাম বলেন নি, লিখেছেন রাজ্যের নাম কিয়া-মো-লিউ-পো। কুমার ভাস্কর বর্মা তখন কামরূপের সিংহাসনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

আবার আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্মৃত অতীতে ফিরে যেতে হয়। কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কৃত কয়েকখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে মহাভারতখ্যাত ভগদত্তের বংশধরেরা বহুকাল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আধিপত্য করেছেন। প্রথমে তাঁর পুত্র কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা বজ্রদত্ত, তারপর পুষ্পদত্ত প্রভৃতি রাজারা বংশপরম্পরায় রাজত্ব করেন। ভাস্কর বর্মার পূর্বে এই বংশেই আমরা চারজন রাজার নাম পাই —ভূতি বর্মা চন্দ্রমুখ বর্মা স্থল বর্মা ও সুর বর্মা। এঁরা পিতা পুত্র ছিলেন। ভাস্কর বর্মাও সুর বর্মার পুত্র, তাঁর মাতার নাম শ্যামাদেবী। কনৌজে হর্ষবর্ধন যখন প্রবল প্রতাপে আর্যাবর্ত শাসন করছেন, ভাস্কর বর্মা তখন কামরূপের সিংহাসনে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের তিনি মিত্র ছিলেন, এবং অনেকে মনে করেন যে ভাস্কর বর্মাই তাঁর সঙ্গে

হিউএন চাঙের যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। কথাটা বিশ্বাস করবার মতো উপাদান ইতিহাসে আছে।

৫৬৫ শকে ভাস্কর বর্মা নালন্দা বিহারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে শিলাদিত্যের সঙ্গে কান্যকুব্জ বা কনৌজে গিয়েছিলেন একটা উৎসবে যোগদানের জন্য। কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখিয়ে নিজের দক্ষিণে বসতে দিয়েছিলেন।

হিউএন চাঙ ভাস্কর বর্মাকে ব্রাহ্মণ বলেছেন। অথচ বর্মা ক্ষত্রিয়ের উপাধি। শুধু এই কারণেই অনেকে হিউএন চাঙের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ব্রহ্মপুত্রবংশীয় ব্রাহ্মণেরা কামরূপে কিছুকাল রাজত্ব করেন। এই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদিন এক ব্রাহ্মণের একটি সুন্দরী মেয়ে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে গিয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র তার রূপ দেখে মুগ্ধ হন। তাদের মিলনের ফলেই জন্ম হল একটি পুত্রের। বড় হয়ে এই পুত্রই কামরূপের রাজা হলেন। তাঁর নাম জানা যায় না, কিন্তু তিনিই যে কামরূপের ব্রাহ্মণ রাজা তা মেনে নেওয়া যায়। রবিনসন সাহেবও এক রাজার কথা লিখেছেন, তিনি করতোয়ার সন্তান। নদী সেখানে মাতা রূপে কল্পিত।

ভাস্কর বর্মাকে হিউএন চাঙ শৈবও বলেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে কামরূপ রাজ্যের রাজধানীতে এসে দেখলেন যে নদীর দুই তীরে এই নগর। রাজা ভাস্কর বর্মাকে লোকে কুমাররাজও বলত। তিনি শৈব। তাই কামরূপে শতাধিক হিন্দু মন্দির দেখতে পেলেন, কিন্তু বৌদ্ধ বিহার বা সংঘারাম দেখলেন না একটিও। অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু রাজা বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না, বৌদ্ধদের বৃত্তিদানেও বঞ্চিত করেন নি।

হিউএন চাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা আরও অনেক সংবাদ পাই। কামরূপের পরিধি তখন প্রায় দুহাজার মাইল। রাজার প্রতাপ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। মনে হয় যে বর্তমান আসাম মনিপুর শ্রীহট্ট ও

ময়মনসিংহ নিয়ে সে যুগের কামরূপ রাজ্য গঠিত হয়েছিল। ভূটান ও কুশবিহার বা কুচবিহার রাজ্যও কামরূপের অন্তর্গত ছিল বলে অনুমান হয়। ধনধান্যে উর্বর ছিল দেশ, জলকষ্ট ছিল না, অধিবাসীরা ছিল সদাচার-পরায়ণ। তাদের আকৃতি খর্ব ও গায়ের রঙ কালো। মহাভারতের যুগে এদেশবাসীর রঙ কালো ছিল না। যে সমস্ত কিরাত ও চীনা সৈন্য নিয়ে ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন তাদের বর্ণ ছিল কাঞ্চনবৎ। কিরাতরা কি তবে ব্রহ্মদেশের অধিবাসী ছিল ?

হিন্দুর মন্দিরে হিউএন চাঙ পশুবলি দেখেছেন। বৌদ্ধধর্মে জনসাধারণের বিশ্বাস নেই দেখে দুঃখও পেয়েছেন। কিন্তু রাজাকে তাঁর ভাল লেগেছে। রাজার গুণে ও যত্নে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আসামে বৌদ্ধ নিদর্শন আজও বোধহয় বেশি নেই। কোন বিহার নয়, কোন চৈত্য নয়, কোন সংঘারামেরও ধ্বংসাবশেষ নয়, জনার্দন পাহাড়ে শুধু একটি মূর্তি দেখলুম। পাহাড়ের গায়ে পাথরে খোদা একটি বুদ্ধমূর্তি। জনার্দনের বুদ্ধ অবতার হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের একটি সমন্বয়ের প্রয়াস।

৬

পরের কয়েকটা দিন ফার্মের কাজকর্ম নিয়েই মেতে ছিলুম। সন্ধ্যাবেলায় যেতুম লাইব্রেরীতে। আসামের ইতিহাস পড়তে আমার মন্দ লাগছিল না। এ বিষয়ে আমি কাকতির কাছে কোন সাহায্য চাই নি। বলেছিলুম মিস্টার বড়ুয়াকে। তিনি আমাকে কোনও ক্লাবের মেম্বার হতে বলেছিলেন। গৌহাটি টাউন ক্লাব গৌহাটি ক্লাব ও ইণ্ডিয়া ক্লাব নামে ভাল ক্লাব এখানে আছে। অনেকগুলো সিনেমা হাউস আছে, কুমার ভাস্কর নাট্যমন্দির ও আর্য নাট্যমন্দিরে থিয়েটার হয়। মুখ বদলাবার জন্য রেস্তোরাঁ আছে ডিলাইট আর মধুকুঞ্জ।

আমি বলেছিলুম: এসবে আমার দরকার নেই, আমাকে একটা ভাল লাইব্রেরির সন্ধান দিন।

মিস্টার বড়ুয়া নিরুৎসাহ হয়ে আমাকে একটা লাইব্রেরিতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। শহরের সর্বত্রই সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়, কাজেই যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। ফার্মের গাড়ি নিতুম না বলে তাঁরা একটু ক্ষুণ্ণ হতেন।

শুক্রবার রাতে কাকতি এসে উপস্থিত হয়েছিল। আমি তখন লাইব্রেরি থেকে ফিরে এসেছি। একটু সঙ্কোচ করে বলল: কাল তো আমাদের আধ বেলা অফিস, আর রবিবার পুরো ছুটি। আপনি কি এ ছুটো দিন ঘরে বসেই কাটাবেন?

হেসে বললুম: নিশ্চয়ই না।

খুশী হয়ে কাকতি বলল: আমিও তাই ভেবেছিলাম।

সত্যি নাকি!

কাকতি বলল: সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ক্লান্ত শরীরেও সেদিন আপনি কত আগ্রহ করে শুক্রেশ্বর পাহাড়ে উঠলেন।

আমি কাল সকালেই গাড়ির ব্যবস্থা করব, শনি রবি ছুটো দিনই আমাদের ফার্মের গাড়ি আপনার কাছে থাকবে।

আমি ব্যস্ত ভাবে বললুম : না না, তার দরকার নেই। শহরে অনেক ট্যাক্সি আছে দেখেছি। দরকার হলে আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করব।

অপরিসীম বিস্ময়ে কাকতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : নিজের জন্য ফার্মের গাড়ি কেন!

কাকতি বলল : ফার্ম তো আপনারই, আপনার জন্যই গাড়ি।

তর্ক না করে আমি বললুম : তা হোক, আমরা ট্যাক্সিতেই যাব।

এর পরে কাকতি কী বলবে অনেকক্ষণ ভেবে পেল না। তারপরে কিছু বলবার জন্যে দ্বিধা করতে লাগল। আমি তার জন্যে চা আনতে বলেছিলুম। সেই চা এলে এক পেয়ালা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম : কিছু বলবে নাকি ?

চায়ের পেয়ালাটি আমার হাত থেকে নেবার সময় কাকতি কৃতার্থ হবার ভাব দেখাল। বলল : এই সব কারণেই আপনার সম্বন্ধে অফিসে অনেক কথা হচ্ছে।

হেসে প্রশ্ন করলুম : কী কথা ?

কাকতি বলল : আপনাকে ঠিক সাহেব বলে মনে হয় না। আপনি যেন আমাদেরই একজন।

সত্যিই তো তাই।

এ আপনার বিনয়। কিন্তু অনেকে আবার অন্য কথা ভাবেন, বলেন, আপনার 'ডাঁট' নেই।

তার কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম।

কাকতি কয়েক চুমুক চা খেয়ে বলল : অনেকে লাইব্রেরিতে গিয়েও আপনার খোঁজ নিয়ে এসেছে। কী বই পড়েন তাই দেখতে গিয়েছিল। বলছিল, সে সব বইয়ের নামও ওরা কোন দিন শোনে নি। লাইব্রেরিয়ান নাকি বলেছে যে আপনার পছন্দমতো বই এক

জায়গাতেই পাওয়া যাবে—হিস্টরিকাল ও অ্যান্টিকোয়েরিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে। ঐ ইনষ্টিটিউটের ভেতরে ঢুকতে কেউ সাহস পায় না।

তারপরে আর একটা কথা বলতে গিয়ে সে চেপে গেল। ইভা নামের একটা খাসি মেয়ের কথা। শুধু বলেছিল: ইভাকে কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে খুব ভাল করেছেন সার্, ঐ মেয়েটার জন্যেই—

বলে সে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করতে পারি নি। ইভা কার নাম, আর কখন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, আমার তা মনে পড়ল না। এরা লক্ষ্য করেছে, আলোচনাও করেছে নিজেদের মধ্যে, আর আমার অজ্ঞান আচরণ এরা সমর্থনই করেছে। কিন্তু ঐ মেয়েটার জন্যে কী হয়েছিল, কাকতি আজ আমাকে তা বলল না। হয় তো নতুন বলেই তার সঙ্কোচ হল। তবে পরে একদিন যে সে নিশ্চয়ই বলবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

চা শেষ করে কাকতি বলল: কাল তাহলে আমরা কামাখ্যার মন্দিরে যাই।

আমি বললুম: না, মন্দিরে যাব পরশু সকালে। কাল অন্য কোথাও চল।

কাকতি বলল: ঠিকই বলেছেন। মন্দিরে সকালে যাওয়াই ভাল, ইচ্ছে থাকলে পূজো দেওয়া যাবে। কাল তাহলে বশিষ্ঠাশ্রমটাই ঘুরে আসা যাক। চমৎকার জায়গা। বহু লোক সেখানে পিকনিকে যায়।

বললুম: সেই ভাল।

খুশী হয়ে কাকতি বলল: পরশু সকালে আমরা উমানন্দ ভৈরব আর কামাখ্যা দর্শন করব। ভাল লাগলে বিকেলে যাব নর্থ গৌহাটি। সেখানেও অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

যাবার আগে কাকতি বলল: একটা কথা ভেবে আমার খারাপ লাগছে।

কী কথা?

ফার্মের গাড়িটা নিলে কী ক্ষতি হত আমি বুঝতে পারি নে। শুধু শুধু অনেকগুলো পয়সা নষ্ট হবে।

বললুম: বলেছি তো, নিজের শখের জন্যে নিজের পয়সাই খরচ হওয়া দরকার।

কাকতি বলল: এ রকম কেউ করে না। যাদের সরকারী গাড়ি আছে, তাঁরা দিনরাত্রি সেই গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। বাজার হাট করছেন, সিনেমা থিয়েটার দেখছেন, শিলঙ চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত বেড়িয়ে আসছেন। পুরনো সাহেব তো—

বলেই কাকতি থেমে গেল।

আমি বললুম: সবার প্রবৃত্তি সমান নয়। কেউ এসব করাকে ঘৃণা করেন, আবার অন্যে এসব না করাকে বোকামি ভাবেন। আমরা বোকাই থাকব।

শনিবার দুপুরবেলায় আমরা বশিষ্ঠাশ্রম যাত্রা করলুম। কাকতিই একখানা ট্যাক্সি সস্তায় ব্যবস্থা করে আনল। সাত মাইল পথ নিয়ে যাবে এবং ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর আবার আমাদের হোটেলে ফিরিয়ে আনবে। রাস্তা ভাল। শিলঙের পথ ধরে তিন মাইল যেতে হবে, তারপরে অন্য পথে চার মাইল দক্ষিণে এই আশ্রম।

কাকতি পথে আমাকে বশিষ্ঠ মুনির গল্প শোনাল। বলল: বশিষ্ঠ মুনির কথা আপনি জানেন তো?

বললুম: নামটিই শুধু জানি।

কাকতি বলল: পুরাকালে দেহহীন বশিষ্ঠ মুনি এখানে তপস্যা করেছিলেন। রাজর্ষি নিমির শাপে যে বশিষ্ঠ দেহহীন হয়েছিলেন, সে গল্প জানেন তো?

বললুম: আপনার মুখে আর একবার শুনব।

অপ্রস্তুত ভাবে কাকতি বলল : এসব গল্প তো আমাদের জানা নেই, পাণ্ডাদের মুখে যা শুনেছি তা ঠিক কিনা কে জানে!

বলে রাজর্ষি নিমির গল্পটি আমাকে সংক্ষেপে বলল। সূর্যবংশের রাজা ইক্ষাকুর এক পুত্র নিমি হিমালয়ের নিকট বৈজয়ন্ত নগরে রাজত্ব করতেন. একবার তিনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞে প্রথমে বশিষ্ঠকে ও পরে গৌতমকে যাজকত্বে বরণ করেন। বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞ করছিলেন। সেখানে কাজ শেষ করে নিমির কাছে এসে দেখলেন যে তাঁর বিলম্ব দেখে গৌতম যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। বশিষ্ঠ নিমিকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু নিমি সেই কথা না শুনে গৌতমকে যজ্ঞের ভার দিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ মনে করলেন যে তাঁকে অপমান করা হয়েছে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিমিকে শাপ দিলেন যে তাঁর মৃত্যু হবে। নিমি তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। জেগে উঠে এই শাপের কথা শুনে তিনিও প্রতিশাপ দিলেন, নিদ্রিত মানুষকে শাপ দেবার জন্য বশিষ্ঠেরও মৃত্যু হবে। দুজনের শাপের ফলে দুজনেই দেহহীন হয়ে বাস করতে লাগলেন। দেবতাদের দয়ায় নিমি সকল প্রাণীর নেত্রে বাস করতে লাগলেন। এইজন্যেই সকলের নেত্র বিশ্রামকালে উন্মেষ ও নিমেষপ্রাপ্ত হয়। আর বিদেহী বশিষ্ঠ যজ্ঞ করতে এলেন এই আশ্রমে।

পুরাণের গল্প অন্যরূপ, নিমির শাপে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবেশ করল। তারপর সেই তেজ থেকেই বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম হল উর্বশীর সান্নিধ্যে।

কাকতি বলল : দেহহীন বশিষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁরই উপদেশে এই নির্জন সন্ধ্যাচলে বিষ্ণুর তপস্যা করতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁর তপস্যার প্রভাবে এখানে সন্ধ্যা ললিতা ও কান্তা নামে ত্রিধারায় প্রবাহিতা গঙ্গাকে আনলেন। তারপর সেই গঙ্গায় স্নান করে বিষ্ণুর বরে তাঁর দেহ ফিরে পেলেন।

স্থানমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পুরাণের গল্প এই রকম করেই বিকৃত

হয়। তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। বশিষ্ঠ তাঁর দেহ কী ভাবে ফিরে পেয়েছিলেন, সে কথা আমাদের কাছে বড় নয়, বড় এটি শাশ্বত সত্য। সত্যযুগের ঋষি বশিষ্ঠ আজও আমাদের ভক্তিতে বেঁচে আছেন। আজও আমরা তাঁর আশ্রম দেখবার জন্য ছুটে যাই।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা একটি নির্জন স্থানে বশিষ্ঠাশ্রম। উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে জলপ্রপাতটি বেগে নেমে আসছে, তারই নাম বশিষ্ঠ গঙ্গা। কাকতি বলল: বশিষ্ঠ মুনি প্রত্যহ ওই ত্রিধারা সঙ্গমে ত্রিসন্ধ্যা করতেন। পাণ্ডারা বলেন যে এখানে এক দিনে ত্রিসন্ধ্যা করলে পতিত সন্ধ্যার পাপ স্খালন হয়।

আমার মনে হল যে অনুতাপে সকল পাপেরই স্খালন হয়।

এর পরে আমরা বশিষ্ঠদেবের মন্দির দেখলুম। মন্দিরে তাঁর পদচিহ্ন আজও বিদ্যমান। বাহিরের গম্বুজটি ঠিক একই ধরনের। সেদিন যেমন শুক্রেশ্বরের মন্দির দেখেছি, ঠিক তেমনি। কামাখ্যার মন্দিরেও এমন গম্বুজ অনেক কটি আছে আসামের হাইকোর্টের উপরেও যে ঠিক এই রকমের একটি গম্বুজ আছে তা পরে দেখেছিলুম।

ফেরার পথে কাকতি বলল: এখান থেকে কিছু পশ্চিমে একটি শিলাচিহ্ন আছে, তা বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর। ঘন বনের ভিতর সেই জায়গাটি বিপদসঙ্কুল বলে যাত্রীরা সেদিকে যায় না।

বশিষ্ঠাশ্রমে আমরা অনেকগুলি ছোট ছোট দল দেখতে পেলুম। বশিষ্ঠগঙ্গার ধারে পাথরের উপর নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা বসেছে। সঙ্গে আছে বেতের আর প্লাষ্টিকের বাস্কেট, ফ্লাস্ক, জলের জায়গা। কাকতি বলল: ওরা সবাই পিকনিক করতে এসেছে। এ জায়গাটি লোকে খুব পছন্দ করে।

আমাদেরও ভাল লেগেছিল এই জায়গাটি।

বশিষ্ঠের সম্বন্ধে এখানে আরও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদ ঠিক নয়, এই কাহিনী আছে কালিকাপুরাণে। পুরাকালে কামরূপের এমনই মাহাত্ম্য ছিল যে এখানকার নদীতে স্নান ও দেবসেবা করেই লোকে স্বর্গে যেত। পার্বতীর ভয়ে যম কাউকে ছুঁতে পারতেন না। তাতে কাজকর্ম বন্ধ হবার উপক্রম হলে তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন, ব্রহ্মা তাঁকে বিষ্ণুর কাছে নিয়ে গেলেন। সকলে মিলে গেলেন শিবের কাছে। বললেন, মানুষের উপরে যমের অধিকার না থাকলে পৃথিবীতে নিয়ম শৃঙ্খলা কিছু থাকবে না। আপনি একটা বিহিত করুন। শিব এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তারপরে এলেন কামরূপে। এখানে উগ্রতারা ও স্বগণদের বললেন, তাড়াও এখানকার সব মানুষদের।

যা বলা, তাই কাজ। তাঁরা সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ মুনি নিজের আশ্রমে তপস্যা করছিলেন, তাঁকেও তাড়াতে এলেন। বশিষ্ঠ রেগে উঠলেন, বললেন, এ কী রকম কথা! আমি শম দম গুণবিশিষ্ট বেদজ্ঞ তপস্বী। আমাকেও তোমরা তাড়াতে এসেছ। বলে উগ্রতারাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি বামা, বেদবিরুদ্ধ ভাবে তোমার পূজা হবে; তোমার প্রমথরা ম্লেচ্ছরূপে এখানে বাস করবে। শিব আমাকে তাড়াতে বলেছেন, আমি তাঁকেও অভিশাপ দিচ্ছি, তিনিও ম্লেচ্ছের মতো অস্থি ও ভস্ম ধারণ করে এই কামরূপে বাস করবেন। যে তন্ত্রে কামরূপের মাহাত্ম্য আছে, তাও এখানে বিরল হয়ে যাবে।

অভিশাপ দিয়ে বশিষ্ঠ অন্তর্হিত হলেন। আর সেই সঙ্গেই কামরূপ বেদমন্ত্রহীন ম্লেচ্ছ জাতিতে পূর্ণ হল।

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হয়েছিল এই সময়ে। কামরূপের নদীকুণ্ড ও তীর্থগুলি গোপন করবার জন্য ব্রহ্মা এক জলময় পুত্রের জন্ম দিলেন; শান্তনুর পত্নী অমোঘা তাঁর মা। পরশুরাম এই ব্রহ্মপুত্রকে নিজের

কুঠার দিয়ে এই দেশে অবতারিত করেন। সদিয়ার উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে একটি স্থান আজও ঋষিকুঠার নামে পরিচিত।

ব্রহ্মপুত্রের জলে কামরূপের সমস্ত তীর্থ গুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু এই সব তীর্থের কথা জেনে যাঁরা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করেন, তাঁদের সমস্ত তীর্থস্নানের ফললাভ হয়। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অসামান্য। যোগিনীতন্ত্রের একটি সুন্দর শ্লোকে কামরূপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে :

দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽনং ন তৎসমম্।
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে॥

দেবীক্ষেত্র কামরূপের মতো স্থান আর নেই। অন্যত্র দেবী বিরলদর্শন, কিন্তু কামরূপের ঘরে ঘরে তিনি বিরাজ করেন।

সন্ধ্যার আগেই আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

৭

হোটেলে ফিরে কাকতি আর বসতে চাইল না। বলল: না সার্, আজ আর বসতে বলবেন না।

বললুম: কেন, বাড়িতে কাজ আছে বুঝি?

কাকতি বলল: বাড়িতে আবার কাজ কী! আপনার কাছে এসেছিলাম বললে সাত খুন মাপ হয়ে যাবে।

তবে?

মাথা চুলকে কাকতি বলল: আজ অফিসের কেউ এসে পড়তে পারে।

আমি হেসে বললুম: এলেই বা কেউ, তাতে ক্ষতি কী!

কাকতি ভয়ে ভয়ে বলল: ক্ষতি আপনার নেই, কিন্তু আমার আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন?

ভয়ের কারণ কাকতি বলল না। উত্তর দিল, এখানে কিছুদিন থাকলে সে কথা আপনিও বুঝবেন।

বলে চলে যাচ্ছিল। আমি বললুম: যদি তাদের বলি যে আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম!

তারা বলবে, এত লোক থাকতে আপনি আমাকেই বা ডাকলেন কেন?

বলব, বাজারে দেখা হয়ে গেল, তাই ডেকে আনলুম।

এবারে সাহস পেয়ে কাকতি বসে পড়ল, বলল: সেই কথাই বলবেন সার্, তাহলে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না।

হোটেলের বেয়ারা এসেছিল চা নিয়ে, তাকে আর একটা পেয়ালা আনতে বললুম। তার নিজের ভাষায় কাকতি বলল: আর দেখ, সাহেবের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে তাকে বাহিরে বসিয়ে খবর দেবে, হুট করে এই ঘরে আনবে না, বুঝলে?

বেয়ারা মাথা নেড়ে চলে গেল।

কাকতির কথার মানে আমি কতকটা অনুমান করেছিলুম, তবু সে আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। শেষে মন্তব্য করল: কী দরকার ঝামেলার। অকারণে এই নিয়ে আবার নানা কথা আরম্ভ হবে। ইভার জন্যেই এত সাবধান হতে হচ্ছে, কী কাণ্ডটাই সে করল!

কোন কৌতূহল প্রকাশ না করে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

কাকতি বলল: সে এক কেলেঙ্কারি! কিন্তু থাক সে কথা। এ কথা প্রকাশ করেছি কেউ টের পেলে আর এক ঝামেলার সৃষ্টি হবে। আমি আদার ব্যাপারী, আমার ওসবে দরকার কী!

বেয়ারা আর একটা পেয়ালা নিয়ে ঢুকছিল। তাকে দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে বসল। বলল: কেউ আসে নি তো?

এবারেও বেয়ারা মাথা নেড়ে চলে গেল।

আমি চা ঢেলে কাকতির দিকে এক পেয়ালা এগিয়ে দিলুম। সে উঠে দাঁড়িয়ে পেয়ালাটা হাতে নিল। তারপর নিজের জায়গায় বসে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বলল: এই সব কারণেই আপনাকে একেবারে নিজেদের লোক বলে মনে হয়।

কেন, আমি নিজেদের লোক নই বুঝি!

না না, তা নয়। আমরা তো ঠিক এমন ব্যবহারে অভ্যস্ত নই, তাই কেমন আশ্চর্য লাগে।

কথাটা খুব মিথ্যা নয়। কিছু দিন আগে ডালহৌসি স্কোয়ারে আমিও কাকতির মতো কাজ করতুম। আমার দৌড় ছিল অফিসের বড়বাবু পর্যন্ত, তার উপরে ঘেঁষতে চাইতুম না। ঐ যে এক একটা ছোট ঘরে আলাদা আলাদা বসবার ব্যবস্থা, তাতেই একটা জাতিভেদের সৃষ্টি। কাছে গেলেও সহজ ভাবে মেশা যায় না। একজন বসে আর একজন দাঁড়িয়ে কাজের কথা হয়, কিন্তু পার্থক্যের কঠিন দেওয়ালটা ভাঙা যায় না। একবার একজন তরুণ বাঙালী ভদ্রলোক অন্য অফিস থেকে বদলি হয়ে এসেছিলেন। অনেক

সাহেবের মধ্যে তিনিও একজন সাহেব। কার কাছে আমার খবর পেয়েছিলেন জানি না. একদিন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আপনি তো লেখেন, তাই না। আমি সংক্ষেপে বলেছিলুম, হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, বেশ লেখেন।

এই ভঙ্গিটির অর্থ আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল না। মাস্টারমশাই যেমন ছাত্রের রচনা পড়ে বলেন 'বেশ হয়েছে', তেমনি একটা মুরুব্বির মতো মনোভাব। মাস্টারমশাইকে এই রকমের মন্তব্য করার অধিকার দেওয়া আছে, কিন্তু তাঁকে সে অধিকার কেউ দিয়েছে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারতুম। তিনি ফাইলে আমার নোটিঙের মন্তব্য করতে পারেন। ভাল হয়েছে কিংবা যাচ্ছেতাই হয়েছে, মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ বলার অধিকারও তাঁর আছে। সেই অধিকারেই যে তিনি আমার লেখার সমালোচনা করলেন, তা বুঝতে পেরেছিলুম। তবু আমি তাঁকে কোন কঠিন উত্তর দিই নি, বিনীত ভাবেই বেরিয়ে এসেছিলুম।

তাঁর কথায় আমার আর একজন সাহেবের কথা মনে পড়ল। তিনিও কারও কাছে শুনেছিলেন যে আমি লিখি। তিনিও বাঙালী, কিন্তু কী লিখি সে কথা জানবার চেষ্টা করেন নি। তিনি আমার এই লেখাটা ভাল চোখে মোটেই দেখতেন না। ভাবতেন যে কোন কাজকর্ম না করে আমি বোধহয় অফিসে বসেই এই সব লেখা লিখছি। তাই খুব সতর্ক ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইতেন, যেন তাঁর ব্যবহারে আমি কোন প্রশ্রয় না পাই। তাঁর সঙ্গেও আমি কোন অবিনীত ব্যবহার করি নি, কিন্তু তিনি আমার কন্‌ফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট ভাল লেখেন নি, মন্দও লেখেন নি। মন্দ লিখলে তা আমার গোচরে আনা হত, সে সাহস তাঁর ছিল না। মনে হত, তিনি আমাকে একটু ভয়ও পেতেন, বোধহয় ভাবতেন যে আমাকে আঘাত করলে কাগজে আমি কিছু ছাপিয়ে দিতে পারি।

অফিসের এ সব মনোভাব আমি কোন দিন বড় করে দেখি নি।

একটা বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে আমাকে চলতে হবে তা জেনেই রেখেছিলুম। এই যুদ্ধ আজ সকল স্তরের জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। পেটের জন্য যুদ্ধ করতে হয় না এমন ভাগ্যবান যাঁরা আছেন, তাঁরা সমাজের নানা ক্ষেত্রে নানা রকমের সমস্যা নিয়ে যুদ্ধ করছেন। সমস্যা সৃষ্টির জন্যে যুদ্ধ করছেন, এমন লোকেরও অভাব এদেশে নেই। তাঁরা একক ভাবে দলগত ভাবে এমন কি ব্যক্তিগত বা সরকারী প্রতিপত্তির প্রভাবে সমস্যা সমাধানের নামে নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে যুদ্ধক্লান্ত জনসাধারণ এ সমস্তই ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিয়ে চলেছেন।

আমি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। তা লক্ষ্য করে কাকতি বলল: আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি সার্?

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললুম: গৌহাটিতে আর কী দেখবার জায়গা আছে বলুন তো।

কাকতি বলল: কলকাতার হাইকোর্ট ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম দেখবার পর কি এখানকার এসব আপনার ভাল লাগবে! তার চেয়ে আপনাকে সব প্রাচীন জায়গাতেই নিয়ে যাব। ভাল লাগবে আপনার।

তারপরেই বলল: গৌহাটির পূর্ব দিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে একটা নূতন স্টেশন হয়েছে জানেন! গৌহাটিরই প্রাচীন নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। একটা নবগ্রহ মন্দিরের জন্যে এই নাম।

কাকতি নূতন কথা বলছে দেখে বললুম: তাই নাকি!

কাকতি বলল: উজান বাজারের পুবে যে ছোট পাহাড়টি আছে, তার নাম চিত্রাচল পাহাড়। এই পাহাড়ের উপরেই নবগ্রহ মন্দির। নবগ্রহের মূর্তি আছে, যাত্রীরা নবগ্রহের পুজো করতে যায়। কিন্তু আমরা শুনেছি যে পুরাকালে পাহাড়ের উপর জ্যোতিষ চর্চার একটা কেন্দ্র ছিল। জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষী-বিদ্যা অ্যাস্ট্রনমি ও অ্যাস্ট্রলজি দুই-ই এখানে শেখানো হত। সেই থেকেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নাম, সাহেবরা বলেন দি সিটি অব ঈস্টার্ণ অ্যাস্ট্রলজি।

সত্যিই এ কথা আমি জানতুম না, এ আমার কাছে নতুন কথা। বললুম : এ আপনি একেবারে নতুন কথা শোনালেন।

উৎসাহিত হয়ে কাকতি বলল : উজান বাজারে আরও দুটি দর্শনীয় স্থান আছে। জোড়া-পুকুরের ধারে উগ্রতারার মন্দির। পাণ্ডারা এই স্থানকে কামাখ্যা দেবীর নাভিমণ্ডল বলে। দেবী পরমেশ্বরীর নাম এখানে উগ্রতারা।

একটু থেমে বলল : ছত্রাকার মন্দিরও নিকটে, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর। তবে এসব মন্দির তেমন বিখ্যাত নয়, বেশি যাত্রীর যাতায়াত নেই। দূর দূর দেশ থেকে যাঁরা কামাখ্যা দর্শনে আসেন, আর পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকেন কয়েক দিন, তাঁরাই পাণ্ডাদের সঙ্গে এ অঞ্চলের সব মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখেন। শুধু এপারে নয়, ওপারেও তাঁরা যান।

আমি বললুম : ধর্মের টান থাকলে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে বৈকি।

কাকতি বলল : ধর্মের টান না থাকলেও লোকে কামাখ্যার মন্দির দেখে যায়।

তারা মন্দিরই দেখে, মন্দিরের দেবতাকে দেখে না। কাঁধে ক্যামেরা থাকলে মন্দিরের ছবি একটা তুলে নেয়, মন্দিরের কারুকার্যের ছবি। কিংবা সঙ্গী থাকলে তাকে সামনে রেখে একটা মন্দিরের ছবি। সেটা অ্যালবামে লাগানো থাকবে। দূর দেশে বেড়াতে গেলে যেমন সে জায়গার দু-একটা জিনিস কিনে আনা হয় স্যুভেনির বলে, এও কতকটা তেমনি। এই বৈজ্ঞানিক যুগে দেবতায় বিশ্বাস আমরা কুসংস্কার বলে ভাবতে শিখেছি। কিন্তু এই তিক্ত কথা আমি কাকতিকে বললুম না, বলা উচিত নয়। এ যুগে সত্যের স্বরূপই এই রকম, কিন্তু কেউ আমাকে সিনিক ভাবে তা আমি চাই নে। তাই বললুম : দেখবেই তো, আসামে এসে কামাখ্যার মন্দির দেখি নি বলতে লজ্জা করে।

খুশী হয়ে কাকাত বলল : আপনাকে আমি আর একটা মন্দিরে নিয়ে যাব। পাণ্ডুনাথের মন্দির। পাণ্ডু স্টেশনের খুব কাছে, অথচ খুব প্রাচীন মন্দির। এই মন্দির নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন, অনেক কিংবদন্তী আছে এই মন্দিরের সম্বন্ধে।

কাকতি আমাকে কিংবদন্তীর কথাও শোনাল। বিষ্ণু এইখানে মধু কৈটভ বধ করেছিলেন। যে শিলার উপর রেখে এই দুই অসুরকে তিনি বধ করেন, সেই শিলাটি এখনও পাণ্ডুনাথের মন্দিরের নিকটে বিষ্ণুশিলা নামে পূজিত। এই শিলার উপরে বিষ্ণুর উরুর চিহ্ন আছে। অনেকেই এই শিলাকে পাণ্ডুনাথ বলেন।

ব্রহ্মপুত্রের তটে বরাহ পর্বতের নিচে এই মন্দির সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে বনবাস কালে পঞ্চ পাণ্ডব কিছুদিন এখানেও বাস করেছিলেন। তারই জন্য এই স্থানের নাম হয়েছে পাণ্ডুনগর। এখন সংক্ষেপে আমরা পাণ্ডু বলি। এখানে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি আছে। অনেকে বলেন যে অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবেরা এই তীর্থে এসেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে কামাখ্যা দেবীর পূজা করেছিলেন। দেবীর কাছে রাজ্যলাভের বর প্রার্থনা করেছিলেন। সেই ঘটনাকেই স্মরণ রাখবার জন্য এই পাণ্ডুনগরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে তাঁদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কাকতি বলল : এখন একটি আশ্রম হয়েছে এইখানে। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রেল কলোনী। গোটা শহরটাই এখন রেল কলোনীতে পরিণত হয়েছে। তাদের দপ্তর আর কর্মচারীদের থাকবার জন্যে ঘরবাড়ি। কামাখ্যার পাহাড়ে উঠলে এ সমস্তই আমরা দেখতে পাব।

আমাদের হয়তো আরও কিছু কথা হত, কিন্তু তা হল না। হোটেলের বেয়ারা এসে খবর দিল যে এক সাহেব দেখা করতে এসেছেন।

সাহেব!

কাকতি লাফিয়ে উঠে বলল: নিশ্চয়ই বড়ুয়া সাহেব। আমি তাহলে এখন আসি সার্।

বলে অনুমতির জন্য আর অপেক্ষা করল না, বেরিয়েও গেল না। মনে হল, কাছেই কোন খালি ঘরে সে আত্মগোপন করল। বেয়ারাকে আমি বললুম: নিয়ে এস।

কাকতি ঠিকই সন্দেহ করেছিল। মিস্টার বড়ুয়াই এসেছিলেন। এক গাল প্রসন্ন হাসি নিয়ে ঘরে এলেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ইংরেজীতে অভ্যর্থনা করলুম। তিনি বাঙলায় উত্তর দিলেন। কিন্তু আমি বাঙলায় প্রত্যুত্তর দিলুম না। দুজনের মাঝখানে ইংরেজীকে রাখলুম ব্যবধান সৃষ্টির জন্যে। কেন করলুম তা জানি না। আমার মনে হল যে এ ভালই করলুম।

মিস্টার বড়ুয়া বলেছিলেন: আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।

আমি বললুম: বিরক্ত আর কী, আপনি এলেন বলে সময় খানিকক্ষণ কাটবে।

মিস্টার বড়ুয়া এবারে ইংরেজীতে বললেন: অফিসে তো আপনি খুবই ব্যস্ত থাকেন, কাজের কথা ছাড়া আর কোন কথাই হয় না। একবার জিজ্ঞেস করতেও পারলাম না যে আপনার জন্যে ভাল ব্যবস্থা কী করতে পারি। হোটেলে তো বেশি দিন কাটতে পারে না, পরিবার আনার সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছেন কি!

বললুম না যে পরিবার আমার নেই, তার বদলে বললুম: কিছু দিন এই ভাবেই চলুক, তারপরে ভেবে দেখব।

মিস্টার বড়ুয়া বললেন: সেও মন্দ নয়। একা যখন এসেই পড়েছেন তখন এই ভাবেই কিছু দিন চলুক। বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজে ব্যবস্থা করতে গেলে অনর্থক ঝামেলা বাড়বে।

আমি বললুম: একটু চা হোক।

মিস্টার বড়ুয়া আপত্তি করলেন, বললেন: না না, চা নয়, চায়ে আমার অম্বল হয়।

তবে কফি হোক।

বলে বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বললুম।

মিস্টার বড়ুয়া একটু গুছিয়ে বসলেন, বললেন: কাল সকাল-বেলায় অফিসের গাড়িটা আপনার কাছে আসতে বলেছি। ছুটির দিন তো, কাছেপিঠে কোথাও বেড়িয়ে আসবেন। এদিকে অনেক সুন্দর মনোরম জায়গা আছে।

তারপর নিজেই বলতে লাগলেন: আপনার প্রিডিসেসার চান্দুবি লেকে বেড়াতে যেতে খুব ভালবাসতেন। সত্যিই অপূর্ব জায়গা। গৌহাটি থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, মাইল চল্লিশেক দূরে খাসি আর গারো পাহাড়ের ধারে এই লেক। বন আছে তৃণভূমি আছে, মাছ ধরার শখ থাকলে তারও সুবিধা আছে।

আমি বললুম: পাহাড় বন আর লেক এক জায়গায় দেখলে আমার ভারি আনন্দ হয়। নৈনিতাল অঞ্চলে এ রকমের লেক অনেক আছে বলে শুনেছি।

আমার এই মন্তব্যে ভদ্রলোক উৎসাহ পেলেন, বললেন: আমাদের অফিসে যে মেয়েরা কাজ করে, তাদের কারও কারও বাড়ি ঐ অঞ্চলে। আমি একজনকে বলেও দিয়েছি, সে হয়তো কাল আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। আপনি যাবেন জানলে ওকে কালই আপনার সঙ্গে যেতে বলতাম।

ওরা কি অত দূর থেকে যাতায়াত করে?

না, তা সম্ভব নয়। ওরা শনিবার বাড়ি যায়, সোমবার একটু দেরি করে আসে। এটুকু না সইলে ওরা নানা রকম উৎপাত করে। খাসি মেয়ে তো, ভারি ফরোয়ার্ড ওরা। লেখাপড়া শিখেছে, ক্ষেতে কাজও করে, আবার সংসারও সামলায়। ওরাই বাড়ির কর্তা।

ভদ্রলোক আরও অনেক কথা কইলেন, সুবিধা অসুবিধার কথাও জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বিদায় নেবার সময় মনে করিয়ে দিলেন:

তাহলে ওই কথাই রইল। কাল ড্রাইভার আপনাকে চান্দুবি লেকটাই দেখিয়ে আনবে।

এবারে আমি বললুম: তার তাড়া কি আছে মিস্টার বড়ুয়া, একদিন সেখানে গেলেই হল। এখন তো আছি এখানে।

আমার মনে হল যে মিস্টার বড়ুয়া কিছু বিমর্ষ হয়ে ফিরলেন।

কিন্তু কেন বিমর্ষ হবেন! আমি তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলুম বলে! কিন্তু মিস্টার বড়ুয়া তো নিজের জন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে আসেন নি, এসেছিলেন আমারই আনন্দবিধানের জন্য। আমি যদি সাময়িক ভাবে তাতে অসম্মত হয়ে থাকি তবে তিনি কেন বিমর্ষ হবেন!

তারপরেই আমার কাকতির কথা মনে পড়ল। কাকতি আমাকে ইভা নামের একটি খাসি মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তার কথায় আমার একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আমার জায়গায় যিনি আগে ছিলেন হয়তো তাঁর সঙ্গেই এই মেয়েটার কোন অপ্রীতিকর যোগাযোগ ঘটেছিল। তবে কি মিস্টার বড়ুয়া সেই রকমই কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাইছেন।

অসম্ভব নয়। মিস্টার বড়ুয়া অনেক দিন ধরে একই কাজ করছেন। হয়তো এবারে একটা উন্নতির প্রত্যাশী। কিন্তু আমরা বাইরে থেকে চাকরি নিয়ে আসছি। আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনিও এ দেশের মানুষ ছিলেন না। আমার মনে হল যে ফার্মের কর্তৃপক্ষ বোধহয় এই কাজের জন্য এ দেশের লোক চান না। তাই দিল্লী থেকে আমাদের নিয়োগ করছেন।

এ সবই আমার অনুমান। হয়তো এ অনুমানের কিছুই সত্য নয়। হোক মিথ্যা। তবু আমাকে সতর্ক ভাবে চলতে হবে। নতুন চাকরি, নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ। প্রতি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। হৃদয় দিয়ে যেমন মানুষ জয় হয়, তেমনি বুদ্ধি দিয়ে হয় বিপদ জয়। এ কথা ভুললে আমার চলবে না।

কাল সকালে আমি দেবতার দর্শনে বেরব।

ভোরবেলাতেই কাকতি এসে উপস্থিত হল। বলল : আজ কখন বেরবেন, সে কথা কাল জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

বললুম : আপনার কষ্ট না হলে এখুনি বেরতে পারি।

কিন্তু আপনার তো এখনও চা খাওয়া হয় নি !

চা খেয়ে কি মন্দিরে যাওয়া যায় '

আমার কথা শুনে কাকতি বিহ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। এমন কথা সে যেন জীবনে কখনও শোনে নি। তার হাবভাব দেখে আমি হেসে ফেললুম. বললুম : আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, চাকরি করতে এসেছি বলে কি নিজের জাত ধর্ম ভুলে যাব !

এতক্ষণে সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বলল : আমি এখুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসছি, কামাখ্যার মন্দির থেকে ফিরে এসে আপনি চা খাবেন।

বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম : কামাখ্যার মন্দিরে তো আগে যাওয়া যাবে না, আগে আমাদের উমানন্দ দর্শন করতে হবে।

কাপড় গামছা সংগ্রহ করে বললুম : চলুন, একটা রিক্শা নিয়ে আপনার বাড়ি যাই। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে হলে আপনারও তো কাপড় গামছা চাই।

ভদ্রলোক এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যে আমি লজ্জা পেলুম। তাড়াতাড়ি বললুম : আসুন, বেরিয়ে পড়ি।

রিক্শায় চেপে আমরা প্রথমে কাকতির বাড়ি গেলুম। সে আমাকে তার বাড়িতে নামবার জন্যে অনুরোধ করেছিল। আমি বলেছিলুম : আজ নয়, অন্য একদিন আসব।

তারপরে গিয়েছিলুম ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে।

পথে সে আমাকে মিস্টার বড়ুয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল : বড়ুয়া সাহেব কী মতলবে এসেছিল ?

আমি বললুম : কোন মতলবে নয়, আজ কোথাও বেড়াতে যাব কিনা জানতে এসেছিলেন।

কী বললেন আপনি ?

সত্যি কথাই বললুম।

কাকতি বিষম ভয় পেয়ে বলল : আপনি কি আমার কথা বললেন নাকি ?

হেসে বললুম : বললে কি তিনি আপনাকে খেয়ে ফেলবেন ? যদি দেখে ফেলেন এখন ?

কাকতি বলল : বলব, রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তাই সঙ্গে যাচ্ছি।

এই রকম কাপড় গামছা নিয়ে ?

কাকতি বলল : না না, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা বলেন নি।

বললুম : তিনি আমাকে চান্দুবি লেক দেখতে যাবার কথা বলেছিলেন।

ইভার বাড়ি !

ইভার বাড়ি বুঝি ওইখেনে !

কাকতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আমাদের পুরনো সাহেবের সর্বনাশ তো ওইখেনেই হল।

আমি বললুম : সর্বনাশ আর কী হয়েছে !

না সার্, ওকে সর্বনাশই বলে। আপনি কামাখ্যা দর্শনে যাচ্ছেন, আর উনি টুরে যাবার নাম করে ওইখেনেই পড়ে থাকতেন। ইভা মেয়েটাকে এখনও আমরা খারাপ ভাবতে পারি নে।

নাই বা কাউকে খারাপ ভাবলেন। আপনার আমার কাছে সে ভালই থাক।

কথায় কথায় আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছে গেলুম। স্নান করে খেয়াঘাটে এলুম নৌকোর জন্য। ডেপুটি কমিশনারের কোর্টের কাছেই এই খেয়াঘাট, নৌকো ও মোটর লঞ্চ দুই-ই চলাচল করে। ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে এই উমানন্দ দ্বীপ, ইংরেজী নাম পিকক্ আইল্যাণ্ড।

কাকতি আমার ভিজে কাপড় গামছা বইতে চেয়েছিল, আমি বললুম: আমার হাতেই থাক। দুজনে বইলে ভারী কম ঠেকবে।

ব্রহ্মপুত্র পেরবার সময় আমার অনেক পুরনো কথা মনে পড়ল। অনেক যাত্রী এখানে প্রাণ হারিয়েছেন। ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ও আবর্তে নৌকো উল্টে গেছে, গভীর জলে যাত্রীদের সমাধি হয়েছে। এই রকম দুর্ঘটনার একাধিক সংবাদ আমি খবরের কাগজে পড়েছি।

কাকতিও বোধ হয় এই কথাই ভাবছিল, বলল: বর্ষাকালে এই রকম খেয়া পারাপার মোটেই নিরাপদ নয়।

আমি বললুম: এখন নিরাপদ তো!

কাকতি হ্যাঁ বলবার সাহস পেল না, নাও বলল না। বলল: দুর্গানাম করে বেরিয়েছি, ভয়ের কিছু নেই।

ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে উমানন্দ দ্বীপটি ভারি সুন্দর দেখায়। শুধু দ্বীপ তো নয়, একটি অনুচ্চ পাহাড় জলের উপরে জেগে আছে, গাছে গাছে সবুজ দেখাচ্ছে দূর থেকে, আকাশ ও জলের নীলে তার রূপের ঐশ্বর্য হারিয়ে যায় নি।

পথে আমরা স্রোতের বেগ দেখলুম, দূরে দূরে জলের আবর্তও দেখলুম, কিন্তু কোন বিপদের সম্মুখীন হলুম না।

পারে পৌঁছে কাকতি বলল: কামাখ্যা থেকে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় দু মাইল। শোনা যায় যে কোন এক সময় কামাখ্যা পাহাড়ের সঙ্গে এই উমানন্দ পাহাড় যুক্ত ছিল, এটি ছিল নীল পর্বতেরই অংশ।

বললুম: অসম্ভব নয়, নদীর ধারা তো নিয়তই বদলাচ্ছে।

খাড়া সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠতে হয়। আমরা দু ধারের

গাছপালা দেখতে দেখতে উপরে উঠতে লাগলুম। আম কাঁঠাল তেঁতুল গাছ আছে, আছে পলাশ চাঁপাও, শিমুল ও নারিকেল গাছও দেখতে পেয়েছি। আর একটি জীব দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম। হনুমানের মতো দেখতে, কালো রঙ আর লম্বা লেজ। কাকতি বলল: এরা হনুমান নয়, এক জাতের উল্লুক। কলাটা-মুলোটা খেতে পায় বলেই যাত্রী দেখলে কাছে এসে উপস্থিত হয়।

আমাদের বেশি পরিশ্রম করতে হল না। স্বল্পায়াসেই মন্দিরের দরজায় পৌঁছে গেলুম। মন্দিরের একটি শিখর, কামাখ্যার মন্দিরের মতো তার একই ধরন। মনে হবে, একই সময়ে একদল শিল্পী এই মন্দিরগুলো গড়েছে।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে আমরা দেবতার দর্শন পেলুম না। কাকতি বলল: এখানেও ঠিক কামাখ্যা মায়ের মন্দিরের মতো নিচে নামতে হবে।

অন্ধকারে আমরা একটি গুহার ভিতরে নামলুম। দীপের আলোয় দেখলুম যে শিবলিঙ্গ একটি পিতলের পাত্র দিয়ে ঢাকা আছেন। তারকেশ্বরেও ঠিক এই রকমটি দেখেছি। গাঢ় অন্ধকারে সেখানে শিবলিঙ্গ দেখা যায় না, ভিড়ের চাপে অসাবধান হলে এই পাত্রটি পায়ে ঠেকবার আশঙ্কাও আছে।

সোমনাথের মন্দিরের কথাও আমার মনে পড়ল। অহল্যাবাঈয়ের তৈরি পুরনো মন্দিরেও শিবের দর্শনের জন্য নিচে নামতে হয়। কিন্তু অন্ধকার নেই তারকেশ্বরের মন্দিরের মতো। সমুদ্রের ধারে সোমনাথের যে নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে, প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর, তার ভিতরের ব্যবস্থা একেবারে আধুনিক। প্রশস্ত জায়গা, প্রচুর আলোবাতাস। শিবের দর্শন করতে হয় দূর থেকে, যেমন রামেশ্বরে দেখেছি। বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথকে আমরা যেমন দু হাতে জড়িয়ে হাসি কাঁদি মাথা ঠুকি তাঁদের পাথরের দেহে, রামেশ্বরে বা নতুন সোমনাথে তার উপায় নেই। পূজা করতে হলে

মন্দিরের পুরোহিতের হাতে দিতে হবে পূজার ভোগ ফুল বেলপাতা, নির্মাল্য চরণামৃত প্রসাদ পেতে হবে তাঁরই হাত থেকে। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ছোঁয়াছুঁয়ি যাতে না হয় সেজন্য ব্রাহ্মণেরা সেখানে দেবতাকে পাহারা দিচ্ছেন।

উমানন্দে কোন বাধা নেই, কোন বিধিনিষেধ নেই। কামাখ্যা দেবীর ভৈরব উমানন্দকে তাই আমার ভাল লাগল।

মন্দিরের বাহিরে এসে কাকতি বলল: খানিকটা দূরে আর একটি দ্বীপ আছে, তার নাম উর্বশী। সেখানে আছে একটি কুণ্ড, যাত্রীদের অনেকে সেই কুণ্ডে স্নান করতে যায়।

মন্দিরের এক ব্রাহ্মণ এই দ্বীপের তিনটি নাম বললেন—ভস্মাচল ভস্মশৈল বা ভস্মকুট। মহাদেব এখানে কামদেবকে তাঁর রোষাগ্নিতে ভস্ম করেছিলেন বলে পাহাড়ের এই নাম। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে উমানন্দ পাহাড়ের এই সব নামই ব্যবহৃত হয়েছে। উমানন্দ নাম কেন হয়েছে তাও তিনি বললেন। শিব এখানে উমার আনন্দবিধানের জন্য বিরাজ করছেন বলে তাঁর উমানন্দ নাম হয়েছে। কিন্তু দূরের ঐ দ্বীপটির নাম উর্বশী কেন হয়েছে, কেন যাত্রীরা ঐ উর্বশী কুণ্ডে যায়, ব্রাহ্মণ সেকথা বলতে পারলেন না।—ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে উর্বশী নাম যুক্ত হয়েছে বেদে ও পুরাণে। বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম হয়েছিল অগস্ত্যের সঙ্গে মিত্রাবরুণের তেজে। উর্বশী তাঁদের মাতা কিনা স্পষ্ট ভাবে তা বলা নেই। কিন্তু স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী এসেছিলেন মিত্রাবরুণের কাছে।

আমরা বেশি দেরি করলুম না, কামাখ্যা দর্শনের জন্য আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম।

কামাখ্যা তীর্থের সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীর অন্ত নেই। কিছু আমি আগেই শুনেছিলুম, কিছু কাকতির কাছে শুনলুম, আর বাকিটুকু শুনলুম কামাখ্যায় পাণ্ডার কাছে।

কামাখ্যা পীঠস্থান, আর এই পীঠস্থানের কথায় দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের কথা এসে পড়ে। দক্ষ প্রজাপতির রাজধানী ছিল হরিদ্বারে, আর সেইখানেই তিনি শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। একদা শিব তাঁর শ্বশুর দক্ষকে যথোচিত সম্মান করেন নি। বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিরা সব সমবেত হয়েছিলেন। দক্ষকে আসতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু শিব নির্বিকার ভাবে বসেছিলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে। এই রাগ। তারপর নিজের বৃহস্পতি যজ্ঞে তিনি ত্রিভুবনের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন, শুধু করলেন না নিজের কন্যা ও জামাতাকে। নারদ এই সংবাদ সতীকে দিয়ে এলেন।

বাপের বাড়িতে যজ্ঞ দেখতে যাবার জন্য সতীর প্রাণ উতলা হল। তিনি স্বামীর অনুমতি চাইলেন। সাদাসিধে সরল মানুষ শিবেরও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। তিনি বললেন, ত্রিভুবন যেখানে নিমন্ত্রিত সেখানে বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া যায় না। তারপর সতী দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে শিবকে বিভ্রান্ত করে তাঁর মত আদায় করলেন।

বাপের বাড়ি এসে সতীকে প্রাণত্যাগ করতে হল। এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। তাঁর স্বামী বাঘছাল পরা জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, গলায় সাপ জড়িয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান। তাই বলে স্ত্রী হয়ে বাপের মুখে স্বামীর নিন্দা শুনতে হবে! নারদই আবার কৈলাসে গিয়ে সতীর মৃত্যুসংবাদ শিবকে দিয়ে এলেন। ক্রোধে

উন্মত্ত হয়ে উঠলেন শিব। মাথার একটা জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেললেন, সেই জটা থেকে বীরভদ্রের জন্ম হল। বীরভদ্র ছুটল দক্ষালয়ে। সেখানে পৌঁছেই ভৃগুর দাড়ি ওপড়ালো আর দক্ষের মুণ্ড কেটে পুড়িয়ে ফেলল। যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

শিবের ক্রোধ কমলে তিনি দক্ষের প্রাণ দিলেন। তারপর শোকে অধীর হয়ে সতীর দেহ কাঁধে করে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করলেন। দেবতারা প্রমাদ গণলেন। বিষ্ণু এসে তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে লাগলেন। দেহের একান্নটি অংশ দেশের একান্ন জায়গায় পড়ে একান্নটি পীঠস্থান হল। দক্ষিণ জঙ্ঘা পড়েছিল নেপালে, বাম জঙ্ঘা জয়ন্তি পাহাড়ে। ত্রিপুরায় তাঁর দক্ষিণ পদ পড়েছিল, আর বাম পদ পড়েছিল ত্রিস্রোতায়। কামরূপের নীলপর্বতে যোনিপীঠ, দেবী এখানে কামাখ্যা বা নীলপার্বতী, ভৈরব উমানন্দ বা রাবানন্দ।

উমানন্দ দর্শন করে ফিরে আমরা একটা ট্যাক্সি পেয়েছিলুম। কামাখ্যার মন্দির পর্যন্ত আজকাল মোটর যাতায়াত করে, আগের মতো কষ্ট করে পাহাড়ে উঠতে হয় না। পাণ্ডু ও গৌহাটির মাঝপথে একটা জায়গা থেকে এই পথ পাহাড়ে উঠেছে। দূরত্ব বোধহয় মাইল দুয়েক হবে। নীরবে আমরা এই পথ অতিক্রম করছিলুম।

আমি এই পীঠস্থানের কথাই ভাবছিলুম। একদিনে নিশ্চয়ই এই পীঠ এত বড় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয় নি। অনেক পীঠের অবস্থানই তো এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। সেসব স্থান আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কবে কেমন করে এই সব পীঠস্থান আবিষ্কৃত হল, তারও এক একটি কাহিনী আছে। কামরূপ আবিষ্কারের পিছনে আছে কামদেবের নাম।

শোক প্রশমিত হলে শিব হিমালয়ে ফিরে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। বিপত্নীক নিঃসন্তান শিব; তাপসশ্রেষ্ঠ মহাযোগী। জীবনের একটি দুর্বল অধ্যায় তিনি তপস্যায় বিস্মৃত হলেন। ওদিকে

সতী জন্ম নিলেন হিমালয় গৃহে মেনকার কোলে। পর্বতকন্যার নাম হল পার্বতী।

পার্বতী বড় হয়ে শিবের জন্য তপস্যা শুরু করলেন, কিন্তু শিবের ধ্যান আর ভাঙ্গে না। দেবতারাও ব্যস্ত হলেন তাঁর বিবাহের জন্য। কিন্তু কে যাবে মহাযোগীর যোগ ভঙ্গের জন্য! শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতির পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র কামদেব মদনকে পাঠালেন। না পাঠিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। তারকাসুরের অত্যাচারে দেবতারা তখন জর্জরিত এবং ব্রহ্মা বলেছেন যে শিবের পুত্রই তারকাসুর বধে সমর্থ হবে। কাজেই শিবের বিবাহ দেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

ভয়ে ভয়ে মদন এলেন শিবের সামনে। তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করে পার্বতীর প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করতে হবে। মদন তাঁর পুষ্পময় পঞ্চশর নিক্ষেপ করলেন। শিব চোখ মেলে দেখলেন মদনকে, তাঁর রোষানলে মদন ভস্ম হলেন। কিন্তু শিব আবার তপস্যায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার পিছনে ছিল ব্রহ্মার অভিশাপ। ব্রহ্মা যখন তাঁর মানসপুত্রদের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর মন থেকে এক সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। এঁর নাম সন্ধ্যা। ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে আর একটি পুরুষ সৃষ্টি করলেন মকর-বাহন মীনকেতু কম্বুগ্রীব, পুষ্পময় পঞ্চশর ও কুসুমকার্মুকে সজ্জিত। তাঁরই নাম মদন। ব্রহ্মাকে মদন বললেন, আমার প্রতি আদেশ? ব্রহ্মা বললেন, ত্রিভুবনে তুমি সৃষ্টির সহায়তা কর, দেবদানব মানুষ ও পশু তোমার পুষ্পবাণে মত্ত হবে। মদন বললেন, বেশ, প্রথম পরীক্ষা হোক তোমার উপরেই! বলে মদন ব্রহ্মার প্রতি শর নিক্ষেপ করলেন, সম্মুখে সন্ধ্যা। সৃষ্টিকর্তা তাঁর রূপে মোহিত হলেন। শিব বললেন, ধিক্ তোমাকে। ব্রহ্মা শাপ দিলেন মদনকে, শিবের রোষানলে তুমি দগ্ধ হবে। অনুতপ্ত মদন ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। ব্রহ্মা বললেন, বেশ, তোমার পুনর্জন্ম হবে। শিব যখন বিবাহ করবেন, তখন তাঁর দয়াতেই তুমি তোমার দেহ ফিরে পাবে।

ধ্যানমগ্ন শিবের প্রতি পঞ্চশর নিক্ষেপ করে মদন ব্রহ্মার এই অভিশাপেই দগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু দেবতারা প্রমাদ গুণলেন। পার্বতী হলেন মর্মাহত, কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন না। আরও কঠোর তপস্যায় শিবের তপস্যা ভঙ্গ করলেন। শিব জাগলেন, জানলেনও সব। ব্রহ্মা এসে বিবাহের সম্বন্ধ করলেন। হরপার্বতীর বিবাহ হল হিমালয় গৃহে।

এই বিবাহে এসেছিলেন অতনু মদনের পত্নী রতি, শিবের কাছে প্রার্থনা করে স্বামীর পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন।

কিন্তু এইখান থেকে একটি কিংবদন্তীর আরম্ভ। মদন পুনর্জীবন লাভ করলেন, কিন্তু স্বরূপ ফিরে পেলেন না। তারপর স্বামী-স্ত্রীর স্তবস্তুতিতে তুষ্ট হয়ে শিব বললেন, ভারতের ঈশান কোণে সতীদেহের এক অংশ এখনও গোপন আছে, তা আবিষ্কার করে সেখানে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার কর। তবেই তোমার পূর্ব রূপ ফিরে পাবে। এই আদেশ পেয়ে কামদেব রতিকে নিয়ে এলেন নীল পর্বতে। তারপর দেবীর এই মহামুদ্রাপীঠ আবিষ্কার করে নিজের পূর্ব রূপ ফিরে পেলেন। এই ঘটনার জন্যেই তীর্থের নাম হল কামরূপ, আর দেবী কামাখ্যা নামে পরিচিত হলেন।

কামদেব কামাখ্যার প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দিয়েছিলেন আনন্দাখ্য-মন্দির। বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। যে অন্ধকার গুহায় দেবীর পীঠস্থান, কামদেবের নামে তার নাম হয়েছিল মনোভব গুহা।

তখন এই নীলাচল পর্বতে ওঠার কোন পথ ছিল না। প্রথম পথ নির্মাণ করেছিলেন নরকাসুর। মন্দিরটিও তিনি নির্মাণ করেছেন বলে অনেকের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী এখানে শুনলুম। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর নাকি আসাম বুরঞ্জিতে এই কথা লিখেছেন।

দেবী ভগবতী একদিন নরককে দেখা দিয়েছিলেন। নরক তাঁর

অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হয়ে দেবীকে পত্নীরূপে পাবার বাসনা প্রকাশ করেন। দেবী বললেন, বেশ, এক রাত্রির মধ্যে এই পাহাড়ের চারদিকে চারটি পাথরের সোপান পথ আর একটি বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ করে দিলে তিনি ধরা দেবেন, কিন্তু তা না পারলে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। গর্বোদ্ধত অসুর বললেন, তথাস্তু।

তারপর সেই পথ নির্মাণ শুরু হল। এক রাত্রির মধ্যেই নরক চারটি পথ নির্মাণ শেষ করে বিশ্রাম গৃহ তৈরির আয়োজন করলেন। নরকের কর্মকুশলতায় দেবী বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। তারপর আশ্রয় নিলেন ছলনার। এক মায়া মোরগ সৃষ্টি করে রাত্রি-শেষের সঙ্কেতধ্বনি জানিয়ে দিলেন। অসময়ে এই মোরগের ডাক শুনে নরক আশ্চর্য হয়েছিলেন, আর দেবী বলেছিলেন, বন্ধ কর কাজ, তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে নরকাসুর সেই মোরগের পিছনে ধাওয়া করে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে তাকে বধ করেন। এখনও সেই জায়গাটি কুকুরা বাটাচকী নামে খ্যাত।

মোটর চলাচলের জন্য তৈরি নতুন পথে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠছিলুম। নরকাসুরের তৈরি চারটি পথ আমাদের দেখা হল না। যে পথে আমরা উঠছি, এটিও নূতন তৈরি হয়েছে। কাকতির কাছে শুনলুম যে পাণ্ডুঘাট থেকে যে পথ উপরে উঠেছে, সেই পথের উপরে আছে সিংহদ্বার। সেখানে গণেশের মূর্তির নিকট একটি শিলা নরকাসুরের স্মৃতি বহন করছে। আর তিনটি পথের উপর আছে স্বর্গদ্বার ব্যাঘ্রদ্বার ও হনুমন্তদ্বার। পাণ্ডু-গৌহাটি পথের পাশে নীলাচল পর্বতের দক্ষিণে যে পাহাড় দেখেছি, তার নাম নরকাসুরের পর্বত। লোকে বলে যে এই পাহাড়েই ছিল নরকাসুরের রাজধানী।

কাকতি বলল: কামাখ্যা পাহাড়ে ওঠার এখন মাত্র দুটি পথ আছে। উত্তর ও পশ্চিম দিকের পথ দুটি সংকীর্ণ ও দুর্গম বলে যাত্রীরা যাতায়াত করেন না। এখন সে পথের চিহ্ন আর নেই। পুরাকালে এই পর্বত আরোহণের একটা বিধি ছিল।

পূর্বেতু ধনকামস্তু রাজ্যকামস্তু পশ্চিমে।
উত্তরে মুক্তিকামস্তু দক্ষিণে মরণংধ্রুবম্ ॥

পূর্বদিকে যে পথ সে পথে আরোহণ করলে ধনলাভ হয়, রাজ্যলাভ হয় পশ্চিমের পথ দিয়ে আরোহণে। মুক্তিলাভের আশা থাকলে উত্তরের পথ ধরতে হবে, আর দক্ষিণের পথ ধরলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

এখন যে দুটি পথ সুগম আছে তা দক্ষিণ ও পূর্বের। পূর্বের পথটিই যাত্রীদের কাছে প্রিয়। পাণ্ডু ও গৌহাটি স্টেশনের মাঝখানে কামাখ্যা নামে একটি স্টেশন ছিল। যাত্রীরা তখন এই স্টেশনে নেমে পূর্বদিকের পথ ধরে পাহাড়ের উপরে উঠতেন। পথের দু ধারে গুলঞ্চফুলের গাছ, তারই ছায়ায় ছায়ায় পথের শোভা দেখতে দেখতেই যাত্রীরা উঠতেন। এখন সে স্টেশন আর নেই। এখন পাণ্ডু বা গৌহাটি স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রম আর স্বীকার করতে হয় না।

এই পাহাড় বেশি উঁচু নয়। কামাখ্যার মন্দির যেখানে, সেই স্থানের উচ্চতা মাত্র পাঁচশো পঁচিশ ফুট। এই পাহাড়েরই শৃঙ্গের উপরে ভুবনেশ্বরীর মন্দির, তার উচ্চতা ছশো নব্বই ফুট। খানিকটা তফাতে পাণ্ডাদের বাড়ি, সেও ছশো ফুটের কম উঁচু। দেখতে দেখতেই আমরা মন্দিরের নিকটে পৌঁছে গেলুম। একটুখানি প্রশস্ত জায়গায় আমাদের গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

১০

ছোট ছোট দোকানে নানা রকমের জিনিস সজ্জিত আছে দেখলুম। পূজার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে পাওয়া যায়। নিকটে ব্রাহ্মণপল্লী আছে বলে অন্যান্য সব রকম জিনিসই কিছু কিছু আছে। পাণ্ডাদের গৃহে যাত্রীদের বসবাসের ব্যবস্থা আছে। বাজার হাটের জন্য তাঁদেরও এই পাহাড় থেকে নামার প্রয়োজন নেই। কাকতি বলল: আসুন, এইখানে আমরা ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করি।

বললুম: তার আগে একজন ব্রাহ্মণকে দরকার। তীর্থে একজন গুরু না হলে তীর্থের ফললাভ হয় না।

কাকতি আবার আমার মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাল। বললুম: আমি তো মন্দির দেখতে আসি নি, আমি দেবতার দর্শনের জন্য এসেছি। শাস্ত্রের নিয়ম না মানলে আমার চলবে কেন'

নিকটেই কয়েকজন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করছিলেন। আমার কথা শুনে এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন: আপনার পাণ্ডা কে?

উত্তরে আমি বললুম: আমি এই প্রথম আসছি।

আপনার পূর্বপুরুষেরা কেউ এসেছিলেন?

জানি নে।

তবে আসুন।

বলে সেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আর এগোলেন না।

মন্দিরের উত্তর দিকে এক পুষ্করিণীর ধারে এসে আমরা পৌঁছলুম। পাণ্ডা বললেন: এর নাম সৌভাগ্যকুণ্ড। ইন্দ্রাদি দেবতারা এই কুণ্ড নির্মাণ করেছেন। এখানে স্নান তর্পণের বিধি আছে।

কাকতি বলল: আমরা ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করে এসেছি।

পাণ্ডা বললেন : তবে এই কুণ্ডের জল একটু মাথায় ছিটিয়ে নিন।

আমরা জলের ধারে নেমে তাই করলুম। পাণ্ডা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন। বললেন : এই কুণ্ড প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়।

সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন কুণ্ডের তীরে। আমরা তাঁর দর্শন করে মন্দিরে প্রবেশ করলুম।

প্রথমেই দেখলুম দ্বাদশ স্তম্ভের মাঝখানে হরগৌরীর ভোগমূর্তি। এখানে বলে বলন্তা মূর্তি। তার মানে উৎসবের জন্য নির্মিত দেবতার একটি সবল মূর্তি. পাথরের সিংহাসনে অষ্টধাতুর হরগৌরীকে আমরা দেখলুম। বৃষবাহন কামেশ্বর শিবের পঞ্চবক্ত্র ও দশভুজ, সিংহ-শব-পদ্মাসনা দেবী মহামায়ার ষড়ানন ও দ্বাদশবাহু। ব্রাহ্মণ বললেন : পদ্ম সিংহ ও শব ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। শক্তিশালিনী মহামায়াকে তাঁরাই ধারণ করে আছেন। দেবীকে এই মূর্তিতে পূজা করলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়। উৎসবের দিনে এই মূর্তি নিয়ে মন্দিরের বাহিরে শোভাযাত্রা হয়।

দক্ষিণ-ভারতের কথা আমার মনে পড়ল। সে দেশের সব মন্দিরেই এমনি এক একটি ভোগমূর্তি দেখেছি। রামেশ্বরমে বোধহয় এই ভোগমূর্তির প্রয়োজন হয় প্রতি দিন। আমরা একদিন সেখানে ছিলুম, আর শয়নারতি দেখেছিলুম রামেশ্বরের। ধূপে ধুনোয় বাদ্যে ও উদাত্ত স্বরে আরতি শেষ হবার পরে ব্রাহ্মণেরা বাবার ভোগমূর্তি পার্বতীর কাছে নিয়ে চললেন। বাজনার বিরাম নেই, ত্রুটি নেই আয়োজনের, আর কৌতূহলেরও সীমা নেই সমবেত যাত্রীর। প্রাঙ্গণের এক ধারে দোলায়মান মঞ্চের উপর পার্বতীর ভোগমূর্তি বিরাজিতা। ব্রাহ্মণেরা তাঁরই পাশে রামেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করলেন। এইটুকুর যেন নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। সারাদিন দেবতা ভক্তের পূজো নিয়েছেন। পার্বতীর দিকে তাকাবার অবসর ছিল না তাঁর। এইবারে

কর্মক্লান্ত দেহে বিশ্রাম নিতে এলেন পার্বতীর কাছে। দেবতারও এই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে? কী প্রশান্ত পরিতৃপ্তি! আমারও ক্লান্ত দেহ মন জুড়িয়ে গিয়েছিল।

আমি বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। আমাদের ব্রাহ্মণ আমাকে জাগিয়ে দিলেন, বললেন: আসুন, মায়ের দর্শন হবে।

বলে একটি স্বল্পালোকিত গর্ভগৃহে আমাদের নিয়ে গেলেন। অন্ধকারে চারিদিক ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে আমরা একটি একটি করে দশটি ধাপ নিচে নামলুম। ঘন অন্ধকারে আবৃত একটি গুহা, এরই নাম বুঝি মনোভব গুহা। একটি প্রদীপ জ্বলছে, আর পূজারী ব্রাহ্মণেরা ভক্ত যাত্রীর অপেক্ষা করছেন।

কোন দেবতা নেই, কোন বিগ্রহ নেই। প্রদীপের আলোয় আমি একটি শিলাপীঠ দেখতে পেলুম। তার আধখানা সোনার টোপর আর কাপড় দিয়ে ঢাকা, তার উপরে ফুলের মালা। সামনের একটি ধার উন্মুক্ত, তার ভিতরে জলের ধারা। যাত্রীরা হাত বাড়িয়ে জলস্পর্শ করছেন।

একজন ব্রাহ্মণ বললেন: দেবীকে প্রণাম করুন—

কামাখ্যে বরদে দেবী নীলপর্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তুতে॥

তারপরে বললেন: স্পর্শ করুন এইবার—

মনোভব গুহামধ্যে রক্তপাষাণ রূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

তারপরে চরণামৃত দিয়ে বললেন: পান করুন—

শুকাদীনাঞ্চ যজ্ জ্ঞানং যমাদিপরিশোধিতম্।
তদেব দ্রবরূপেণ কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে॥

কামাখ্যা মায়ের পূজা আমাদের হয়ে গেল। ভিড়ের চাপে আমরা বেরিয়ে এলুম। আমাদের পাণ্ডা বললেন: এই যে আপনি

দেবীকে স্পর্শ করে মুদ্রার জলপান করলেন, এতে আপনি দেবঋণ পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ থেকে মুক্ত হলেন। যোগিনীতন্ত্রে আছে যে দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধের বাসনা হলে কামাখ্যা পীঠে তীর্থ করবেন। কালিকাপুরাণের মতে এই দেবীর পুজা করে এক কোটি গোদানের পুণ্যফল লাভ করা যায়।

কাকতি বলল : দেবীর পীঠে যে জল স্পর্শ করলেন, তা পাতাল থেকে উঠছে।

ত্রিচিনপল্লীর নিকটে জম্বুকেশ্বর শিবের কথা আমার মনে পড়ল। সে মন্দিরের ভিতরেও সারাক্ষণ জল আসছে। শিবের অপ্‌লিঙ্গ নাম সার্থক হয়েছে সেখানে। কিন্তু সে জল পাতাল থেকে আসে না। শুনেছিলুম, কাবেরীর স্রোতের সঙ্গে যুক্ত একটি কূপ আছে। সেই কূপের জল প্রস্রবণের মতো সারাক্ষণ নির্গত হচ্ছে।

ব্রাহ্মণ আমাকে বললেন : আসুন এই দিকে।

বলে লক্ষ্মী সরস্বতী দেখাতে নিয়ে গেলেন। লক্ষ্মী হলেন কমলা আর সরস্বতী মাতঙ্গী। কামাখ্যা নিজে এখানে ষোড়শী। দশমহাবিদ্যার বাকি সাতজনেরও পীঠ এখানে আছে। এই মন্দিরগুলি দূরে দূরে।

দশমহাবিদ্যা হলেন—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

দশমহাবিদ্যার মধ্যে কামাখ্যার পরেই এখানে ভুবনেশ্বরীর প্রসিদ্ধি। এই মন্দিরটি আমরা সকলের শেষে দেখেছিলুম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রায় দেড়শো ফুট উপরে উঠে এই মন্দির একেবারে পাহাড়ের চূড়ায়। পুরাণে এই শৃঙ্গের নাম ব্রহ্ম পর্বত। এখানকার লোকে বলে ভুবেশ্বরী পাহাড়। দেবীদর্শনের পরে আমরা মন্দিরের পিছনে

একটু বসলুম। পাণ্ডা আমাদের এখানে বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশ্রাম করতে বসে বুঝলুম এই পরামর্শের মূল্য। শীতল বাতাসে শরীর আমাদের জুড়িয়ে গেল। তারপরে আমরা চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

অনেক দূরে ছোট ছোট পাহাড় আর প্রান্তর দেখা যাচ্ছে, শস্য-শ্যামল কৃষিক্ষেত্র। মাঝখানে ভারতের বিপুলতম নদী ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হচ্ছে সগৌরবে, তারই বুকে অরণ্যবেষ্টিত উমানন্দ শৈল। উত্তর দিকে হাত বাড়িয়ে ব্রাহ্মণ আমাদের হিমালয় দেখতে বললেন। এখান থেকেই হিমালয়ের কয়েকটি তুষার শৃঙ্গ দেখা যায়। এই পর্বতবাসী পাণ্ডা ও জনসাধারণের গৃহগুলিও আমরা দেখতে পেলুম। অন্য ধারে গৌহাটির দৃশ্য, পথঘাট যানবাহন ও মানুষও দেখা যায়। এক জায়গা থেকে আমরা পাণ্ডুর নূতন রেল শহরটিও দেখতে পেয়েছিলুম।

কাকতি বলল : ধর্মে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদেরও এই ভুবনেশ্বরী পাহাড়ে আসা উচিত। এই দৃশ্য না দেখলে আসামে আসা অর্থহীন হয়ে যাবে।

দশমহাবিদ্যার মন্দির ছাড়াও এখানে আরও অনেক মন্দির আছে। পঞ্চাননের পঞ্চমুখের পাঁচটি শিব মন্দির ও কম্বলাখ্য নামে বিষ্ণুর মন্দির। বনের ভিতর বনবাসিনী জয়দুর্গা ও ললিতকান্তার শিলাপীঠ, আর কামেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের মাঝখানে কেদারক্ষেত্র। ব্রাহ্মণের কাছে আমরা শক্তির উপাসনা ও কুমারী পূজার কথাও শুনলুম। দেবী এখানে কুমারী রূপে বিরাজিতা বলে যাত্রীরা কুমারী পূজা না করে ফেরেন না। যোগিনীতন্ত্রের মতে একা হি পূজিতা বালা সর্বং হি পূজিতং ভবেৎ। একটি কুমারীর পূজাতেই সকলের পূজা হয়।

১১

ভুবনেশ্বরীর মন্দির থেকে নেমে এসে আমি ব্রাহ্মণ পাণ্ডাকে বিদায় দিলুম। যা দিলুম তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন, আরও বেশি কেন দিলুম না তা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। কামাখ্যার পাণ্ডাদের সৌজন্যের কথা আমি এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলুম। সে এখানে এসে এক পাণ্ডার বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। পাণ্ডামহাশয় সপরিবারে তার সেবাযত্ন করে আনন্দবিধান করেছিলেন। তারপর বিদায়ের সময় সেই বন্ধু যখন খরচ-খরচা ও প্রণামী বাবদ কিছু বেশী টাকা দিচ্ছিল তখন তাকে এক অভাবনীয় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পাণ্ডা ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই নাকি সামনে ছিলেন। সেই টাকা হাতে নেবার সময় দুজনের চোখই ছলছল করে উঠেছিল। বলেছিলেন, আপনি আমাদের লজ্জা দিলেন, আপনার কাছে কি অতিথি সেবার মূল্য নিতে হবে! সেবা করবার সুযোগ দিয়ে আপনিই তো আমাদের কৃতার্থ করেছেন। সেই বন্ধুটি আমাকে এই ঘটনা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, এ কোনও ছলনা নয়, কোনও সৌজন্যের কথাও নয়, এ তাঁদের অন্তরের কথা। তাঁরা ধনী হলে হাত পেতে সে টাকা নিতেন না।

কাকতি আমাদের ট্যাক্সির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম: আমাদের একটা কাজ এখনও বাকি আছে।

কাকতি তখনই থমকে দাঁড়াল।

আমি বললুম: দেবদর্শন আমাদের হয়েছে, কিন্তু মন্দির দেখা আমাদের এখনও বাকি। মন্দিরের স্থাপত্য ও শিল্পকলা একটু দেখব না?

কাকতি বলল: সত্যিই তো, মন্দিরের গায়ে অনেক সুন্দর মূর্তি আছে, সেগুলো দেখাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বলে কামাখ্যার মন্দিরের দিকে সে এগিয়ে গেল। আমিও তাকে অনুসরণ করলুম।

এখানকার মতো মন্দির আমি ভারতের আর কোনখানে দেখি নি। মূল মন্দিরের গম্বুজটি যেন মাটি থেকেই উঠেছে, আর গম্বুজের গায়ে সমান্তরাল বেড় দেওয়া। ঠিক মুসলমানী ঢঙের গম্বুজের মতো নয়, শীর্ষদেশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। দূর থেকে মনে হবে যে একটা বিরাট লাট্টু উপুড় করা আছে। এই মন্দিরের সংলগ্ন আর একটি অট্টালিকার উপরে ছোট বড় চার-পাঁচটি গম্বুজ প্রায় একই ধরনের। তারই পাশে আরও ঘর আছে। উপরে চালার মতো ছাদ দেখে তাকে মন্দির বলে মনে হয় না। এর মধ্যে কোনটির নাম পঞ্চরত্ন মন্দির, কোন অংশ নাটমন্দির নামে পরিচিত।

বলন্তা মন্দিরের চারিদিকে মন্দিরের গায়ে অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। নীলকণ্ঠ মহাদেব নন্দীভৃঙ্গী অন্নপূর্ণা বটুক ভৈরব নারায়ণ গোপাল মঙ্গলচণ্ডী আর কল্কি অবতার। রামচন্দ্র দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকেও দেখলুম, আর দেখলুম মনসা জরৎকারু ও কপিল মুনি। দুটি ঐতিহাসিক মূর্তি আমি চিনতে পারলুম না, আর পড়তে পারলুম না দুটি শিলালিপি।

কাকতিও কিছু জানত না বলে কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবার জন্য চারিধারে তাকাল।

যে ব্রাহ্মণটি আমাদের সব দেখিয়েছিলেন, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। আমাদের আবার মন্দিরের দিকে আসতে দেখেই বোধহয় পিছনে আসছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে কাকতি তাদের নিজেদের ভাষায় কোনও প্রশ্ন করল। ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন বাঙলায়। বললেন: এই মূর্তিটি কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের আর এটি তাঁর ভাই বীর চিলারায়ের।

এ দুটিই প্রাচীন মূর্তি, কিন্তু এঁদের মূর্তি এই মন্দিরের গায়ে কেন

এল তা জানবার জন্য আমার কৌতূহল হল। বললুম: কোচবিহারের রাজাদের মূর্তি এখানে কেন?

ব্রাহ্মণ বললেন: তাঁদের শিলালিপিও আছে। তার থেকে জানা যায় যে কোচবিহারের রাজারাই এই মন্দির নির্মাণ করেন।

সত্যি নাকি!

ব্রাহ্মণ বললেন: এখানে কামাখ্যা-তীর্থ নামে একখানি বই পাওয়া যায়। তাতে এই সব কথা সবিস্তারে লেখা আছে।

ব্রাহ্মণের কথামতো আমি একখানি বই কিনে নিলুম, আর পড়ে দেখলুম এই কোচবিহার রাজাদের কাহিনী। অনেকদিন আগে আমি কোচবিহারের একখানা ইতিহাস পড়েছিলুম। তাতেও কামরূপ ও কামাখ্যার উল্লেখ আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই অঞ্চলে যখন অরাজকতা চলছে তখন বিশ্বসিংহ নামে এক ব্যক্তি কোচবিহারে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। হাজো নামে একজন কোচ চারিদিকের লোকেদের বশ করে বেশ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দুটি সুন্দরী কন্যা ছিল—তাদের নাম হীরা ও জীরা। প্রবাদ আছে যে এই দুই ভগিনীর বিশু ও শিশু নামে দুটি পুত্র জন্মে, স্বয়ং মহাদেব তাদের পিতা। পরবর্তী কালে এঁরা শিববংশীয় বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ নামে পরিচিত হন এবং মুসলমান-বিধ্বস্ত কামতাপুর রাজ্য পুনরুদ্ধার করে কোচবিহারে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। আধুনিক বুরঞ্জি মতে এই বিশ্বসিংহ কামরূপ রাজ্যও অধিকার করেন।

মহারাজ নরনারায়ণ বিশ্বসিংহের পুত্র। তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন রাম সরস্বতী। ইনি অসমিয়া ভাষায় একখানি গ্রন্থে লিখেছেন যে হাজোর দুই কন্যা হীরা ও জীরার বিবাহ হয়েছিল হরিদাস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে। বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ এই হরিদাসের সন্তান। বড় হয়ে এঁরাই কোচবিহার থেকে কামরূপ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

আহোমদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত এবং কামরূপেই হত সেই সব যুদ্ধ। একবার এক নৈশ অভিযানের সময় দুই ভাই পথ হারিয়ে ফেলেন। নিজেদের সেনাদলকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা নীলাচল পর্বতে এসে উপস্থিত হন, তারপর নরকাসুরের তৈরি পথে পাহাড়ের উপরে এসে পৌঁছান। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তখন তাঁরা অবসন্ন। অথচ রাত্রির অন্ধকারে এই অরণ্যময় পরিবেশে কোন জনমানব দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা যখন নিচে নামবেন ভাবছিলেন, তখন মনে হল যে কেউ তাঁদের পথ দেখাতে এসেছে। তাকে অনুসরণ করে দুই ভাই এক স্তূপের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। দিব্য আলোকে তাঁরা এক বৃদ্ধাকে একটি বটগাছের নিচে পূজায় মগ্ন দেখলেন। তৃষ্ণায় তখন তাঁদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাই বৃদ্ধাকে ডেকে তাঁরা জল চাইলেন। সামনেই যে একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে তা তাঁরা দেখতে পান নি। বৃদ্ধা সেই ঝর্ণাটি তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করে মহারাজা বিশ্বসিংহ ও তাঁর ভাই শিবসিংহ খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।

তারপরে বৃদ্ধা তাঁদের সামনের স্তূপটি দেখালেন। ঘন বনে আবৃত সেই উঁচু স্থানটি দেখিয়ে বৃদ্ধা বললেন, এই আমাদের আরাধ্য দেবীর পীঠস্থান। ভক্তিভরে এই দেবীর কাছে কিছু চাইলে তা বিফল হবে না। তাঁরা সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করলেন। বললেন, যদি বিচ্ছিন্ন সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে পারি, তবে তোমার সোনার মন্দির তুলে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে দেব।

তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। অবিলম্বে সেনাদল এসে রাজার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। দেবীর মাহাত্ম্য রাজা বিশ্বাস করেছিলেন। তারপর বৃদ্ধার কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়েছিলেন।

বিশ্বসিংহের মন্দির নির্মাণের সম্বন্ধেও একটি কিংবদন্তী আছে। রাজা ভেবেছিলেন যে দেবীর মাহাত্ম্য আর একটু যাচাই করে নেওয়া

দরকার। এই ভেবে তিনি ঝর্ণার জলে নিজের হীরের আংটি নিক্ষেপ করলেন, সেটি বেঁধে দিয়েছিলেন আধ হাত লম্বা তিনখণ্ড 'ইকরা' নলের সঙ্গে। মনে মনে এই প্রার্থনা করেছিলেন যে কাশীতে গঙ্গাস্নানের সময় যদি এই নলে-বাঁধা আংটিটি ফিরে পান, তাহলে তাঁর প্রত্যয় আরও দৃঢ় হবে।

এ অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করতে সকলের কষ্ট হবে, এ যুগে আমরা অলৌকিক ঘটনা একেবারেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু দেবীর ভক্তরা আজও বিশ্বাস করেন। বিশ্বসিংহ যখন কাশীর গঙ্গায় নেমে স্নান-তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর গায়ে কিছু বিঁধছিল। জল থেকে তুলে তিনি দেখলেন যে তিনটি 'ইকরা' নলের সঙ্গে একটি হীরের আংটি। এ তো তাঁর নিজেরই আংটি! তারপরেই তাঁর সেই পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল। এ ঘটনা তিনি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন।

দেশে ফিরে তিনি রাজসভায় পণ্ডিতদের আহ্বান করলেন, আর এই অলৌকিক ঘটনাটি শোনালেন তাঁদের। পণ্ডিতরা শাস্ত্র পুরাণ নিয়ে বিচার করতে বসলেন। নানারকম বিচার ও গণনা করে রায় দিলেন যে সে পাহাড় কোন সামান্য পাহাড় নয়, তারই নাম নীলাচল পর্বত, আর যে স্তূপ রাজা দেখেছেন, তা হল একান্নপীঠের অন্যতম কামাখ্যার শক্তিপীঠ। কামদেবের কথায় বিশ্বকর্মা যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, ধর্মবিপ্লবে তাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আর বশিষ্ঠ যে শাপ দিয়েছিলেন নরকাসুরকে তারই প্রভাবে দেবীর মাহাত্ম্য লুপ্ত হয়ে আছে।

অনেকে মনে করেন যে শঙ্করাচার্য এই পীঠস্থানের কথা জানতেন এবং এসেছিলেন এই অঞ্চলে। স্থানীয় পণ্ডিত অভিনব গুপ্তের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রবিচার হয়েছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। শঙ্করাচার্য এই তীর্থটি উদ্ধার করে এর মাহাত্ম্য প্রচার করে গিয়েছিলেন বলেও মনে করা হয়। কিন্তু কোন মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়

না। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম মন্দির মহারাজা বিশ্বসিংহই নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সে সোনার মন্দির নয়, সে ইট-পাথরের মন্দির। এই মন্দির নির্মাণের ব্যাপারেও একটি অলৌকিক কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে।

প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রাজা এই নীলাচল পর্বতের উপরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। বহু লোকজন এনে বনজঙ্গল কেটে সেই স্তূপটি উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন। খানিকটা ঘুরে দেখা গেল যে নিচে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, আর মূল পীঠস্থানটি তাতেই ঢাকা পড়েছে। এই আবিষ্কারে রাজার আনন্দের আর সীমা রইল না, বললেন, এই জায়গাতেই নতুন মন্দির গড়তে হবে। পুরনো ভিতের উপরেই নূতন শিখর হোক।

কিন্তু ইঁট আর গাঁথা যায় না। সারাদিন ধরে যতটুকু গাঁথা হয়, রাতের অন্ধকারেই তা ধসে পড়ে। এ ভারি জ্বালা। কয়েক দিন এই রকম ঘটবার পর একদিন রাতে রাজা স্বপ্ন দেখলেন। লাল কাপড় পরা এক কুমারী কন্যা রাজার শিয়রে বসে বললেন, রাজা, তোমার প্রতিজ্ঞার কথা কি একেবারেই মনে নেই! তুমি তো সোনার মন্দির গড়ে দেবে বলেছিলে! প্রতিজ্ঞার কথা রাজার মনে পড়ল, ভয় পেয়ে তিনি বললেন, তাহলে উপায় কী হবে! এত সোনা আমি কোথায় পাব! বলে ক্ষমা চাইলেন তাঁর অক্ষমতার জন্য। রাজার ভক্তিতে কন্যা খুশী হলেন, বললেন, বেশ, এক কাজ কর তাহলে। প্রত্যেকটি ইঁটে এক রতি করে সোনা দাও, তাহলে তোমার সামর্থ্যেও কুলোবে, প্রতিজ্ঞাও রাখা হবে। এই বলে সেই কুমারী কন্যা অন্তর্ধান হলেন।

সকালবেলায় রাজা তাঁর স্বপ্নের কাহিনী বললেন সকলকে। তারপরে দেবীর নির্দেশ মতোই প্রতি ইঁটে এক রতি সোনা দিয়ে মন্দির গাঁথা হল। সে মন্দির আর ভেঙ্গে পড়ল না। বাসন্তুরীয়া ব্রাহ্মণ এনে রাজা নিত্য পূজারও ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু এ তো বিশ্বসিংহের গল্প হল। আর তাঁর ভাই শিবসিংহের কথা? তাঁদের কোন প্রতিমূর্তি তো মন্দিরের গায়ে দেখি নি, দেখেছি নরনারায়ণ আর তাঁর ভাই চিলারায়ের মূর্তি। তাঁরাও এই মন্দিরের জন্য নিশ্চয়ই কিছু করেছেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করবার পর মহারাজা বিশ্বসিংহের মৃত্যু হয় ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মল্লদেব নরনারায়ণ নাম নিয়ে রাজা হন। বিশ্বসিংহের আঠারোটি সন্তান ছিল। তার মধ্যে দুজনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে—নরনারায়ণ ও চিলারায়। চিলারায়ের আসলে নাম ছিল শুক্লধ্বজ. ইনি রাজার সেনাপতি ছিলেন।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক ছিলেন শঙ্করদেব, এই বাঙালী বৈষ্ণব কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে আজও বিষ্ণুর অবতার বলে পূজো পাচ্ছেন। রাজা নরনারায়ণ কিংবা তাঁর ভাই সেনাপতি শুক্লধ্বজ শঙ্করদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেছিলেন—রামরায়ের কন্যা কমলপ্রিয়া আপীকে। গোয়ালপাড়া জেলার যে স্থানে এই বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, আজও সেই স্থান রামরায়ের কুঠী নামে পরিচিত।

আর একজন কুখ্যাত লোক রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। ইতিহাসে তাঁর আর একটি জুড়ি নেই। ধর্মান্তরিত হিন্দু কালাপাহাড় তাঁর হিন্দু বিদ্বেষের জন্যই ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন। উত্তর-ভারতের অনেক মন্দির ও বিগ্রহ তিনি ধ্বংস করেছেন। আর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ প্রতিষ্ঠাও করেছেন অনেক। সেই কালাপাহাড় কামাখ্যার মন্দির ধ্বংস করেছিলেন ১৫৬৪ বা ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। বিশ্বসিংহের তৈরি মন্দিরটি ভেঙ্গে গদার আঘাতে দেবমূর্তিগুলি বিকৃত করে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। নরনারায়ণ নাকি কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধি করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তারপর বার বৎসর ধরে এই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। এখন

আমরা দেবীর যে ভোগমূর্তি দেখি, মহরাজা নরনারায়ণ সেই সময়ে তাও নির্মাণ করেন।

এ সবই ইতিহাসের কথা। যা ইতিহাসের কথা নয়, তাও জানতে পেলুম। মহারাজ নরনারায়ণ ও চিলারায়কে দেবী শাপ দিয়েছিলেন। সেই শাপের কথা তাঁদের বংশধরেরা নাকি আজও মনে রেখেছেন। আমরাও সে কথা লোকের মুখে মুখে শুনতে পাচ্ছি। জনশ্রুতি বলে এই ঘটনা নানা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

রাজা এবং রাজপরিবারের সবাই ছিলেন দেবীর ভক্ত, কিন্তু রুষ্ট হয়ে দেবী সবাইকে শাপ দিলেন। অথচ দেবীর অনুগ্রহেই এই রাজপরিবারের সমৃদ্ধি দিনে দিনে বাড়ছিল। এই শাপের ব্যাপারে আরও একজন জড়িত আছে, মন্দিরের পূজারী তিনি, নাম তাঁর কেন্দু-কলাই। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই ব্রাহ্মণ যখন ঘণ্টা বাজিয়ে তন্ময় হয়ে দেবীর আরতি করতেন, তখন দেবী তাঁর ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে পা ফেলে নৃত্য করতেন। এই সংবাদ যখন মহারাজার কানে পৌঁছল, তখন তিনি কেন্দুকলাইয়ের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন, দেবীর এই চৈতন্যমূর্তি না দেখলে জীবনই বৃথা, একটা উপায় আপনাকে করতেই হবে। পূজারী বললেন, মন্দিরের ভিতরে তো থাকা চলবে না। উপায় আছে একটা। নাটমন্দিরে যে রন্ধ্র আছে সেই 'কুন্দ্রাক্ষর জলারে' ভিতরটা দেখা যায়। সন্ধ্যাবেলায় আরতির ঘণ্টা শুনে আপনারা সেই রন্ধ্রপথে দেবীকে দেখবেন।

ভক্ত রাজা তাই করলেন। দেবীকে দেখলেন 'কুন্দ্রাক্ষ জলা' দিয়ে। কিন্তু দেবী এই ব্যাপার বুঝতে পেরে রুষ্ট হলেন। শিরশ্ছেদ করলেন কেন্দুকলাইয়ের, আর শাপ দিলেন মহারাজা নরনারায়ণকে। ভবিষ্যতে তিনি বা তাঁর বংশের আর কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না। তাঁর দর্শন দূরে থাক, তাঁর মন্দিরের দিকে কেউ তাকালেই তিনি তাঁর শিরশ্ছেদ করবেন।

সবাই বলে যে এর পরে কোচবিহার রাজবংশের আর কেউ

আসেন নি কামাখ্যা দর্শনে। কোচবিহার শিববংশের উত্তরাধিকারী এখন বিজনী দরঙ্গ প্রভৃতি জায়গাতেও আছেন। তাঁরাও কোন প্রয়োজনে এদিকে এলে নাকি কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে চলেন, মন্দিরের দিকে তাকাবার ভয় আজও তাঁদের যায় নি।

কেন্দুকলাইয়ের মাথা কাটার গল্প কাকতি জানত। কামাখ্যা পাহাড় থেকে নিচে নামবার পথে বলেছিল : এই ঘটনা এখন একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। কাউকে ভয় দেখাতে হলে আমরা বলি, কেন্দুকলাইর মুরছিঙ্গার দরে মুরছিঙ্গিম। তার মানে, কেন্দু-কলাইয়ের মাথা যেমন ছিন্ন হয়েছিল, তেমনি তোমার মাথাও ছিন্ন করব।

কাকতিকে তার বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে আমি হোটেলে ফিরে এলুম।

১২

সোমবার বিকেলের দিকে যে খাসি মেয়েটি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারই নাম ইভা। শনিবারও এই মেয়েটি আমার কাছে আসবার চেষ্টা করেছিল কয়েকবার, কিন্তু আমি তার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি নি। আধবেলা কাজ বলে আমি আরও বেশি ব্যস্ত ছিলুম। পরদিন ছুটি না থাকলে হয়তো তার দিকে তাকাতুম একবার। শুধু কাজের চাপেই আমি এই মেয়েটিকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলুম।

আজ আর তাকে ফিরিয়ে দিলুম না, দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াতেই বললুম: এস। সে এসে যখন আমার টেবিলের পাশে দাঁড়াল, আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কিছু বলবে? মেয়েটি মাথা নাড়ল। সরল সুন্দর মুখ অনেক সঙ্কোচে ভরা। আপেলের মতো টুকটুকে গালে লজ্জা লেগে আছে কি না বুঝতে পারলুম না। বললুম: যা বলবে, অসঙ্কোচে বল।

মেয়েটি বলল: আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

অপরিসীম বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

সে বলল: আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

অন্যায়! আমি তো কোন অন্যায়ের কথা জানি নে। আমার সঙ্গে কি আগে তোমার পরিচয় হয়েছে?

হয় নি, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমি এই অফিসেই কাজ করি, আমার নাম ইভা।

এবারে আমি বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা। হেসে বললুম: বস।

কিন্তু ইভা বসল না।

আমি বললুম: এত সঙ্কোচ কেন! আমি তোমাকে খুব ভাল চিনি।

বড় বিব্রত দেখাল ইভাকে, বড় ভয়ার্ত। কোনও কথা না বলে ঝুপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল।

বললুম : মিস্টার বড়ুয়া তোমার ওপর কোনও ভার দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরের খবরটুকু তোমাকে আর দিতে পারেন নি।

ইভা বলল : কাল চান্দুবি লেকে আপনার খুব অসুবিধা হয়েছিল তো!

একটুও না।

ইভা তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের একটা আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলল : কাল আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি নি। সত্যি বলছি—

বাধা দিয়ে আমি বললুম : না না, তাতে আমার কোন ক্ষতি হয় নি। আমার জন্যে কোন দিনই তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

ইভা যেন মর্মাহত হল, বলল : আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন।

বললুম : রাগ আমার নেই, অনুরাগ আছে অন্য জিনিসে। ছুটির দিনে লেখাপড়া করতেই আমি ভালবাসি। শুনে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার, কাল আমি তোমাদের ওখানে যাই নি।

যান নি আপনি!

ইভা তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বোধহয় ভাবল, খুব বোকামি হয়ে গেছে। মোটরের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেই ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যেত। আর এরকম করে আদালতে আসতে হত না বিচারের জন্য। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলুম।

ইভা বলল : মিস্টার বড়ুয়া কি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই প্রোগ্রাম করেছিলেন ?

বললুম : আমাকে কিছু না বলেই ব্যবস্থা করেছিলেন, ভেবেছিলেন আমি খুশী হব।

আরও কিছু শোনবার জন্য ইভা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

ছিল। তাই দেখে বললুম: শনিবার রাতে আমাকে তিনি বলতে এসেছিলেন, তখুনি আমি আপত্তি করেছিলুম।

ইভা কী বুঝল সেই জানে, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি তার মুখ দেখলুম চিন্তান্বিত, কিছু বিষণ্ণও বটে। আমার কথাতেই কোন আঘাত পেল কি না জানি নে। তাই তাকে ডেকে বললুম: ভাবছ কেন, একদিন গেলেই হল। আগে থেকে তোমার সঙ্গে ব্যবস্থা করে যাব।

ইভা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, কিন্তু কথা কইল না কোনও। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় চাওলাকে আমি চিঠি লিখলুম: দোস্ত্, তোমাদের চিত্রাঙ্গদার দেখা এখনও পাই নি, পেয়েছি উলূপীর দেখা। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করবার সময় সে আমাকে তাদের নাগলোকে টেনে নিয়ে যায় নি। খাসি পাহাড়ের কোলে চান্দুবি লেকের ধারে দেখা করবার কথা ছিল। অর্জুনের ভয়ে পালিয়ে গেছে। সে তো নাগকন্যা নয়, সে খাসি মেয়ে। লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে, বিদেশীকে তবু ভয় পায়।

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছিলুম: বিশেষজ্ঞদের কাছে একটা খবর নিও, মহাভারতের নাগলোক আর বর্তমান ভারতের নাগাল্যাণ্ড এক কিনা জানা দরকার। মনিপুরে চিত্রাঙ্গদার খোঁজে যেতে হলে নাগাদের রাজ্যের ওপর দিয়ে এখনও যেতে হয়। নামেও যেমন মিল আছে, তেমনি কাজেও মিল। ওরা লুটপাট করা বন্ধ করে নি। ও দেশের উলূপী অর্জুনকে ছেড়ে দেবে না।

চিঠিটা শেষ করে মনে হয়েছিল যে নিজেকে অর্জুন বলে খানিকটা আত্মপ্রসাদ পেয়েছি। লেখবার সময় এ ভাব আমার মোটেই ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলুম: আমাকে ভুল বুঝো না দোস্ত্, নিজেকে অর্জুন ভেবে আমি গৌরব বোধ করি না।

মহাভারতের ঐ চরিত্রটা আমার কাছে দুর্বল মনে হয়। কৃষ্ণ জোর করে ঐ লোকটাকে বড় করবার চেষ্টা করেছে। তার চেয়ে কর্ণকে আমার ভাল লাগে। দোষ ছিল তারও, কিন্তু শ্রদ্ধা করবার মতো অনেক গুণও ছিল। সবচেয়ে বড় গুণ এই যে মেয়েদের সম্বন্ধে তার দুর্বলতা অর্জুনের মতো নয়।

শেষ কথাকটি একবার পড়ে দেখলুম। ইংরেজীতে লেখা চিঠি ঠিক মনের মতো হয় না। পরের ভাষায় কাজের কথা হয়, হৃদয়ের ভাব বিনিময় যেন হয় না। আজ ইভার কাছেও নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে পেরেছি কিনা জানি নে। তার সঙ্গেও আমার ইংরেজীতে কথা হয়েছে। ওরা বাঙলা বোঝে কিছু কিছু, কিন্তু ভাল বলতে পারে না। একটু চেষ্টা করলেই পারবে।

গৌহাটি পৌঁছে মামাকেও একখানা চিঠি লিখেছিলুম শ্রীনগরের ঠিকানায়। কলকাতা থেকেও লিখেছিলুম একখানা। চিঠিতে যোগাযোগ রাখবার জন্য তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন। কথা দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলুম। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে আজও আমি কোন চিঠি পাই নি। গৌহাটি অফিসের ঠিকানা আমি কলকাতা থেকেই জানিয়েছিলুম। ইচ্ছে করলেই একটা উত্তর দিতে পারতেন।

স্বাতি আমাকে কোন চিঠি লিখতে বলে নি। কোন দিনই সে বলে না। প্রয়োজন না হলে নিজেও লেখে না চিঠি। সে কবে লিখবে তা জানি না, আদৌ লিখবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

শ্রীনগরে সে আমাকে পাঠানকোটগামী বাসে তুলে দিতে এসেছিল। বিদায় দিয়েছিল শুধু হাত নেড়ে। কোন কথা নয়, কোন অনুরোধ নয়, কোন বেদনাও দেখি নি তার দৃষ্টিতে। এমন ঘটনা যেন রোজই ঘটছে, এই রকমের একটা নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে সে ফিরে গিয়েছিল।

স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই যে আমি এই ঘটনাকে তার মতো সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারি নি। একা চলতে চলতে আমার অনেক কথা মনে পড়েছিল। সমস্ত অতীতটা আমি চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছিলুম। দু বছর আগে যেদিন তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সেইদিন থেকে সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়েছিল।

মামার সঙ্গে যে আমার কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই, সে কথা আমি জানতুম না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শেষ করে তাঁর কলকাতার বাড়িতে গিয়েছিলুম। মামা আমাকে চিনতে পারেন নি, তার জন্য তাঁকে দোষ দিই নি। গরিবকে চিনতে পারায় অনেক বিপদ আছে। সেই দায় থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে আমি চলে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম যে এ ভালই হল, নাটক শুরু না হতেই যবনিকা পড়ে গেল।

কিন্তু আমার বিধাতার যে অন্য ইচ্ছা ছিল, সে কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তাই সেদিন হাওড়া স্টেশনে যখন মামা আমাকে চিনতে পারলেন, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। মামীকে দেখলুম, দেখলুম স্বাতিকেও। তারপর তাদের সঙ্গে আমার জীবন যেন জড়িয়ে গেল। সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ঘুরে এলুম, দিল্লীতে আবার দেখা হল, এক বছর পরে রাজস্থান সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রও তাঁদের সঙ্গে ঘুরে দেখলুম।

এবারে পুজার আগে একা বেরিয়েছিলুম। কিন্তু অভাবনীয় ভাবে সবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পাঞ্জাব ও হিমাচল দেখে কাশ্মীরেও গিয়েছিলুম তাঁদের সঙ্গে। তারপর বিদায় নিতে হল। সেই বিদায়ের কথা আজও মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি।

আরও দুবার স্বাতি আমাকে বিদায় দিয়েছে। সেই বিদায়ের কথাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। দিল্লীতে মামা মামীর সঙ্গে স্বাতি আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল। সে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। মামা মামীকে প্রণাম করে আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: তুমি কিছু বলবে না?

স্বাতি হেসেছিল।

আমি বলেছিলুম : হাসি নয় স্বাতি, তোমার কি কিছুই বলবার নেই ? কিছু জানবার, কিছু শোনবার—

এর উত্তরেও স্বাতি হেসেছিল। তারপর অস্পষ্টভাবে বলেছিল : গোপালদা, তোমার মন কি কোন কথা দেয় নি আমার কাছে, যে আজও আমাদের মুখের কথার প্রয়োজন আছে !

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। সে কি আমার মনটাও দেখতে পেয়েছে, না নিজের মনের ছায়া দেখেছে আমার মনের আয়নায় ! আমার মন কি সত্যিই কোন কথা দিয়েছিল !

দ্বিতীয়বার তারা আমাকে বিদায় দিয়েছিল বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে। দেশে ফেরার কোন তাড়া আমার ছিল না। কিন্তু স্বাতিই সবাইকে জানিয়েছিল যে আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। কেন এ কথা বলেছিল, তার কারণ আমি আজও বুঝতে পারি নি। তাই আমি তখনই সে কথা মেনে নিয়েছিলুম।

ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্তে আমি মামা মামীকে প্রণাম করলুম। স্বাতি আমার পাশে পাশে এগিয়ে এসে গাড়িতে তুলে দিল, তারপর আমাকে প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। সঙ্কোচে আমি সরে দাঁড়িয়েছিলুম। মুখ তুলে সে একটু হেসেছিল। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে অমন সুন্দর হাসি আমি অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বেদনায় ভরে গিয়েছিল। বড় অসহায় আর দরিদ্র মনে হয়েছিল নিজেকে।

ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়েছিল ঢং ঢং করে, গাড়ির বাঁশি বেজেছিল। সেই সঙ্গে স্বাতির কথাও আমি শুনতে পেয়েছিলুম ; নিজের ঐশ্বর্যের পরিমাণ তুমি জান না, তাই এমন ভয় পাও। তুমি তো আমায় কিনে নিয়েছ !

সেদিন বিস্ময়ে আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতীত আর

বর্তমানে একটা কঠিন জট পাকিয়ে ভবিষ্যৎকে চেপে ধরতে চেয়েছিল। স্বাতির কথা আমি নিশ্চয়ই ভুল শুনি নি।

কিন্তু এবারে!

এবারে স্বাতি আমার বাসের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। একবার শুধু হাত নাড়ল। কোন কথা কইল না, কোন অনুরোধ করল না, কোন বেদনাও দেখলুম না তার দৃষ্টিতে। ঠিক এমনটি আমি আশা করি নি, কিন্তু কী আশা করেছিলুম তাও জানি নে।

কাশ্মীরে বেড়াবার সময় আমি একটা জিনিস সন্দেহ করেছিলুম। দিল্লীর চাওলাদের সঙ্গে স্বাতি চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিল। সে বোধ হয় জানত যে চাওলার কাছ থেকে একটা খবর পাওয়া যাবে এবং যে কোন দিন আমার দিল্লীতে ফেরার ডাক আসবে। এ কথাটা সে আমার কাছে কেন প্রকাশ করে নি, আমি জানি নে। যেদিন সত্যিই চাওলার কাছ থেকে চিঠি এল, সেদিনও সে আমাকে কিছু বলে নি। শুধু আনন্দে উচ্ছল হয়ে আমাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করেছিল পরম যত্নে। অবিলম্বে দিল্লী ফেরার জন্য চাওলা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিল। কোন দায়িত্বপূর্ণ চাকরি নিয়ে আসামে যেতে রাজী আছি কিনা, এ কথা নিয়ে এক কোম্পানীর মালিক আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। চাওলা আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিল যে রাজী হলে দুজন মানুষের হেসেখেলে চলে যাবে। আর সে নিজে তাকে অদূর ভবিষ্যতে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। স্বাতি বলেছিল: আপত্তি করো না গোপালদা, এক কথায় রাজী হয়ে যেও।

এখন আমার মনে হচ্ছে যে দিল্লীতে তারা একটা ষড়যন্ত্র করেছিল। আর আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল কথাটা। এমন কি মামা মামীও কিছু সন্দেহ করবার অবকাশ পান নি। তাইতেই স্বাতি অমন নির্বিকারভাবে শ্রীনগর থেকে আমাকে বিদায় দিয়েছিল।

কাল একা একা কামাখ্যার মন্দির দেখে ফিরে এসে স্বাতিকেও একখানা চিঠি লেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। সে থাকলে আরও কিছু সময় আমাদের মন্দিরে কাটাতে হত। মন্দিরের কারুকার্য দেখত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, আমাকেও দেখাত। তারপরে কয়েকখানা ছবি তুলত। আর অনেক অনাবশ্যক কথা হত তার সঙ্গে।

লাইব্রেরি থেকে আসামের ইতিহাস এনেছিলুম একখানা। চাওলার চিঠিখানা বন্ধ করে আমি সেই ইতিহাসের বইখানা টেনে নিলুম।

১৩

দিন কয়েক পরে আমি শিলঙ যাত্রা করলুম। শিলঙের অফিসটা ছোট নয়, তাই সেখানে আমাকে কয়েক দিন থাকতে হবে। মিস্টার বড়ুয়া খবর পাঠিয়ে একটা হোটেলে আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। বলেছিলেন : এই অফিস থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যান, তাতে আপনার সুবিধা হবে।

আমি এই প্রস্তাবে রাজী হই নি, বলেছিলুম : সেটাও তো আমাদেরই অফিস, আমার কোন অসুবিধা হবে না।

মিস্টার বড়ুয়া আর কোন কথা বলেন নি, কিন্তু তিনি যে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা বুঝতে পেরেছিলুম।

গৌহাটিতে আমি যে হোটেলে আছি, একজন অসমিয়া ভদ্রলোক তার ম্যানেজার। গোড়া থেকেই তিনি আমার আদরযত্ন করছিলেন। তারপর মিস্টার বড়ুয়া আসবার পর থেকে আরও বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। বেয়ারা আমার প্রয়োজনের কথা বারে বারে জানতে চেয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় কোন বিশেষ ধরনের পানীয়ের প্রয়োজন আছে কিনা তাও অনেকবার জানতে এসেছে।

মিস্টার বড়ুয়া একদিন আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নানা রকম পানীয়ের আয়োজন ছিল। আমি হেসে বলেছিলুম : রঙীন জলে আমার বড় ভয় মিস্টার বড়ুয়া, আমাকে একটু সাদা জল দেবেন।

মিস্টার বড়ুয়া তখুনি বলেছিলেন : তাহলে একটু জিন অ্যাণ্ড লাইম হোক।

আমি বলেছিলুম : ব্রহ্মপুত্রের জলই আমি ভালবাসি।

এই নিমন্ত্রণে আরও দু তিন জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শিলঙ অফিসের ম্যানেজার মিস্টার মর্গান। তিনি

একজন খাসি ভদ্রলোক, বয়সে প্রৌঢ় হলেও হাসিখুশি প্রসন্ন মেজাজের লোক। হেসে বলেছিলেন: শিলঙের সাদা জল কিন্তু খুব মারাত্মক, ও কোন দিন ছোঁবেন না। তার চেয়ে লাল জল ঢের ভাল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম: সে কী রকম?

মিস্টার মর্গান বলেছিলেন: সাদা জলে পেট্রল স্পিরিট যা পায় তাই মিশিয়ে দেয়। ওর লাইসেন্স নেই। লাল জলটা নির্ভয়ে খেতে পারেন।

যথাসময়ে মিসেস বড়ুয়ার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। মিস্টার বড়ুয়া পরিচয় করে না দিলে আমি তাঁকে চিনতে পারতুম না। আমি তাঁকে আমাদের অফিসেরই একজন বলে সন্দেহ করতুম, কেন না তাঁর পিছনেই ছিল ইভা। মিসেস বড়ুয়াকে ইভারই বড় বোন বলে মনে হয়েছিল। তিনিও একজন খাসি মহিলা, তবে ইভার মত তন্বী ও তরুণী নন। বয়সের সঙ্গে তার দেহটাও ভারি হয়েছে। মুখের রঙ কিন্তু ইভারই মত।

মিসেস বড়ুয়া কথাবার্তা ইংরেজীতেই বলেন, বললেন: আজকের সন্ধ্যাবেলাটি ভাল লাগছে। ছেলেমেয়েরা তো শিলঙের স্কুলে পড়ছে, তাই একা একা বড় ফাঁকা লাগে।

আমি কী বলব ভেবে না পেয়ে বললুম: সত্যি কথা।

ইভার সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্কের কথা জানতে পারলুম না, কিন্তু তার ব্যবহারে প্রবল সঙ্কোচ দেখলুম। মুখে হাসি নেই, তার বদলে কুণ্ঠা আছে চোখের দৃষ্টিতে। দ্বিধায় জড়িত পদে মিসেস বড়ুয়াকে সাহায্য করছিল।

এক সময়ে মিস্টার বড়ুয়া আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন: ইভার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে তো?

আমি বলেছিলুম: হ্যাঁ।

ইভাকে শুনিয়েই মিস্টার বড়ুয়া বলেছিলেন : বড় ভাল মেয়ে, এমন মেয়ে আমাদের অফিসে আর একটিও নেই !!

শিলঙ যাত্রার আগের রাতে কাকতি আমার হোটেলে এসে বলেছিল : ইভাও কাল শিলঙে যাচ্ছে, তবে আপনি কাউকে সঙ্গে নেবেন না বলে সে বাসে যাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম : কেন?

কাকতি বলল : অফিসের কাজের নামে যাচ্ছে, আসলে অন্য কাজ করবে।

কাকতির দিকে আমি মুখ তুলে তাকিয়েছিলুম।

খানিকটা ইতস্তত করে কাকতি বলেছিল : মিস্টার বড়ুয়া তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু পাঠাচ্ছেন। তারা শিলঙের স্কুলে পড়ে। আর—

আর কী?

সে কথা থাক সার্, সে কথা আপনাকে বলা যায় না।

কাকতির চোখে আমি ভয়ের চিহ্ন দেখেছিলুম, তাই বলেছিলুম : ভয় কী!

কাকতি তার ভয়ের কথা আর গোপন করল না, বলল : সত্যিই আমার ভয় করছে। আপিসের আরও অনেকে ভয় পেয়েছে।

কেন?

মিস্টার বড়ুয়ার মতলব বোধহয় ভাল নয়। এমনি করেই তিনি আমাদের পুরনো সাহেবের সর্বনাশ করেছিলেন।

আমি তার ভয়ের কথা শুনে হেসে ফেললুম।

কাকতি বলল : হাসবেন না সার্, এ আমার নিজের কথা নয়। আপিসের অনেকেই এ নিয়ে আলোচনা করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ইভা থাকে কোন্‌খানে?

কাকতি আতঙ্কিত হল, বলল : আপনি যাবেন সেখানে!

বললুম : কাল তাকে আমিই সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছি। আমাদের ড্রাইভার তার বাড়ি চেনে তো ?

কাকতি বলল : আপনি ঠাট্টা করছেন।

না না, ঠাট্টা কেন করব ! কাল ড্রাইভারকে বলব তাকে তুলে নিয়ে আসতে, তারপর একসঙ্গেই যাব। মিস্টার বড়ুয়া বলেছেন, মেয়েটি বড় ভাল।

কাকতি আমার দিকে বিহ্বল চোখে চাইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল : আমার কথায় আপনি কী ভাবলেন জানি না, তবে এসব কথা আর কাউকে বলবেন না।

আমি তার মুখে একটা অত্যন্ত কাতর আবেদন দেখেছিলুম।

তারপর কাকতি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম এই কথা। বিদেশে চাকরি করতে এসে এ আমি কী খেলায় নামলুম ! অকারণে এই পরিহাসের কী প্রয়োজন ছিল ! আমার তো সত্যিই কোন উদ্দেশ্য ছিল না !

রাতে আরও গভীর ভাবে ভাবলুম এই কথা। তখন মনে হল যে এ ভালই করেছি। প্রলোভনের সামগ্রী নিয়ে খেলা করতে নেই সত্যি, কিন্তু দূর থেকে তো তাকে জয় করা যায় না। প্রলোভনকে জয় করতে হলে তার কাছে যেতেই হবে, আর একবার জয় করলেই চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত। আমি নিশ্চিন্ত নির্ভয় হতে চাই। ইভাকে তাই কাছে ডেকে নিলুম।

সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ইভা তখনও বেরবার জন্য তৈরি হয় নি, সে ভেবেছিল খেয়েদেয়ে বের হবে। ড্রাইভারকে আমি বলে দিয়েছিলুম যে তাকে শুধু তৈরি হবার সময় দেবে, সে চা খাবে আমার সঙ্গে এই হোটেলে, তারপরে আমার সঙ্গেই বেরবে। নিজের জন্যে তাকে আর ভাবতে হবে না।

ড্রাইভার আমার কথায় কী বুঝেছিল জানি না, ইভাকে ধরে

আনতে একটুও দেরি করে নি। কিন্তু ইভা সহজ ভাবে আসে নি, তার আচরণে আমি পুরনো সঙ্কোচ দেখলুম।

একসঙ্গে চা খেয়ে যখন গাড়িতে উঠলুম, তখনও তার সঙ্কোচ কাটে নি। আমার পাশে কতকটা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। আমি বললুম: অমন করে তোমায় ডেকে নিলুম বলে খুব আশ্চর্য হয়েছ, তাই না?

ইভা বলল: আমিও শিলঙে যাচ্ছি, এ কথা আপনি জেনে ফেলেছেন দেখে আরও বেশি আশ্চর্য হয়েছি।

আমি হেসে বললুম: ভালমন্দ সব কথা জেনে ফেলাই তো আমার কাজ কিন্তু তুমি শিলঙে কত দিন থাকবে, সে কথা আমার জানা হয় নি।

ইভা খুবই অস্বস্তি বোধ করল। আমি তা দেখতে পেয়ে আর কোন প্রশ্ন করলুম না।

গৌহাটি থেকে শিলঙের দূরত্ব তেষট্টি মাইল। পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথ সরল রেখার মতো বিস্তৃত। এ পথ ঠিক অন্য পাহাড়ের মতো নয়। পাহাড়কে বেষ্টন করে পাক খেয়ে খেয়ে উপরে ওঠে নি। এ পথ কাংড়া উপত্যকার মতো সোজা চলেছে, দু পাশে প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র, ধবলাধারের মতো পাহাড় পথের ধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নেই। এ পথ পাহাড়ের উপরেও একবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, উঠেছে অল্প অল্প করে। উঁচু পাহাড় আঁকাবাঁকা পথ আর গভীর খাদ এসেছে পরে, ঝাউয়ের অরণ্য ভেদ করেও এই পথ অগ্রসর হয়েছে। সমুদ্র-সমতল থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে পৌঁছেছে শিলঙ শহরে।

সাহেবরা এই শিলঙকে বলত স্কটল্যাণ্ড অব দি ঈস্ট। এই পার্বত্য-প্রদেশের নাকি স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে মিল আছে, সেইজন্যেই সাহেবরা এই নাম রেখেছে। এই নাম সার্থক হয়েছে কিনা আমরা জানি না, কিন্তু তাদের দেওয়া নাম আমরা আজও মনে রেখেছি।

বশিষ্ঠ আশ্রমের পথ আমরা পেরিয়ে এসেছিলুম। পনেরো-ষোল মাইল পথ অতিক্রম করবার পরে একটি আধুনিক লোকালয়ের কাছে পৌঁছলুম। ছোট একটি পাহাড়ী নদীর ধারে একটি নূতন তৈরি শহর। আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে ইভা বলল: এটি উমৃক্রু হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট। গৌহাটিতে আমরা যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই পাই, তা এখান থেকেই যায়।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি যতটুকু দেখতে পেলুম, তাতে মনে হল যে এই পাহাড়ী নদীতে একটা বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। পরে জেনেছিলুম যে এখানে আট হাজার চারশো কিলোওয়াট-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গৌহাটি ও শহরতলীতে সরবরাহ করা হয়। এই জায়গাটির নাম হল বার্ণিহাট। খানিকটা ঘুরে কমলালেবুর বাগানের ভিতর দিয়ে পাওয়ার হাউস যেতে হয়। এ রাজ্যে নদী ও জলপ্রপাতের অভাব নেই, কিন্তু এই রকম ভাবে বেঁধে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। ১৯৫৭ সালে এই প্রজেক্ট চালু হয়েছে। অন্যান্য শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা খুবই সাধারণ। মাত্র বারো-চোদ্দটি শহরে বৈদ্যুতিক আলো আছে বলে শুনেছি।

পথে আমরা আরও কিছু সরকারী ব্যবস্থা দেখতে পেলুম। সিন্‌কোনা ও নানা জাতের গাছপালা চাষের পরীক্ষা চলছে।

একটি গ্রাম দেখিয়ে ইভা বলল: এটি একটি খাসি গ্রাম। এ অঞ্চলে এই রকমের গ্রাম অনেক আছে।

আমি বললুম: এক দিন আমরা একটি গ্রাম দেখব।

ইভা চমকে উঠল, বলল: না না, গ্রামে কিছু দেখবার নেই। যা দেখবার তা শিলঙেই দেখতে পাবেন।

আমি হেসে বললুম: তুমি যা দেখাবে তাই দেখব, তার বেশী কিছু দেখতে চাইব না।

মোটরে শিলঙ পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। এক সময়

পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ঘর-বাড়ি আর পথের উপরে রঙবেরঙের মেয়ে পুরুষ দেখেই বুঝতে পারলুম যে আমরা শিলঙ শহরে ঢুকে পড়েছি। প্রথমে আমি আমার হোটেলে যাব, তারপর অফিসে। ড্রাইভারকে সেই নির্দেশই দেওয়া ছিল। ইভাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : তুমি কোথায় উঠবে ?

ইভা বলল : এখানে আমার থাকবার জায়গা আছে।

সে জায়গা কোথায় তা আমি জানতে চাইলুম না, বললুম : সেখানে যাবার আগে আমার সঙ্গেই দুটি খেয়ে নিও।

ইভা লজ্জিত ভাবে বলেছিল যে তার দরকার নেই। কিন্তু আমি তাকে ছেড়ে দিই নি। কতকটা জোর করেই তাকে আমার হোটেলে নামিয়েছিলুম।

১৪

অফিসের কাজ শেষ করে হোটেলে ফিরতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি হয় নি, বরং লাভ হল। একজন বাঙালী ভদ্রলোক ঠিক সেই সময়েই হোটেলে ফিরেছিলেন। চা খেতে খেতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল এবং অল্প সময়েই এই পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। কলকাতার একটি খবরের কাগজে ভদ্রলোক কাজ করেন। চীনা আক্রমণের পরে অনেকদিন নেফায় কাটিয়েছেন। তারপর নাগাল্যাণ্ডে ঘুরেছেন অনেক দিন, এবারে ফেরার পথে এই অঞ্চলটা দেখে ফিরে যাচ্ছেন। নেফার আদিবাসীদের তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন, নাগাদের দেখেছেন দূর থেকে, আসামের অন্যান্য আদিবাসীদের সম্বন্ধেও কৌতূহল জন্মেছে বলে তিনি কিছু জানবার চেষ্টা করছেন। আদিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর কিছু লেখাও ছাপা হয়েছে, সম্ভব হলে আরও কিছু লিখবেন।

আমার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক খুশী হলেন, বললেন : কতদিন থাকবেন শিলঙে ?

বললুম : দিন সাতেক তো বটেই, দরকার হলে আরও কয়েক দিন থেকে যাব।

ভদ্রলোক বললেন : বেশ ভাল হল তাহলে। আমাকেও বোধহয় দিন সাতেক থাকতে হবে।

তারপরেই একটা অনুরোধ করলেন : শিলঙ সম্বন্ধে যদি কিছু লেখেন, তবে আমার নামটি দয়া করে লিখবেন না।

আমি হেসে বললুম : কেন বলুন তো ?

ভদ্রলোক বললেন : যদি লিখতেই হয় তো নিজের পছন্দমতো একটা নাম দিয়ে দেবেন। কত নামই তো আছে।

তাতে আমার বিপদও আছে। লোকে বলবে যে পছন্দমতো

একটা চরিত্র সৃষ্টি করে কতগুলো আবোল-তাবোল কথা বলেছে। আমি কেন সে দায়িত্ব নেব !

তাহলে আমি কোন কথাই আপনাকে বলব না।

আমি বললুম : আমার তাহলে চলবে না, আসামের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমার কিছু জানতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল। ভদ্রলোক বললেন : আমার নাম লিখুন কমলাকান্ত, আর এটা যে ছদ্মনাম তা লিখে দিন। তাতে আমারও চলবে, আর আপনারও জাত বাঁচবে।

বেয়ারাকে ডেকে আমি কফির অর্ডার দিলুম। বললুম : চায়ে শীত যাচ্ছে না, একটু কফি খাওয়া যাক কী বলেন ?

কমলাকান্তবাবুকে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখাই আমার উদ্দেশ্য, এবং তিনিও তা বুঝলেন। বললেন : শীত পড়তে যে শুরু করেছে তা খাসিদের আড্ডায় গেলে বোঝা যায়। লাল সাদা দু রকমের মদই চলেছে।

আমি বললুম : অন্য সময় বুঝি চলে না ?

কমলাকান্তবাবু হেসে বললেন : কাল সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে একটা আড্ডায় নিয়ে যাব। কী রকম চলেছে তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে না দিলে কেউ আর বেরুতে চাইছে না।

ভয় পেয়ে আমি বললুম : দেখে আমার কাজ নেই, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন : আচ্ছা, তাহলে এখানে বসেই তাদের কথা শুনুন।

বলে আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বললেন।

আমি জানতুম না যে ভারতবর্ষে এই রকমের উপজাতির সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। প্রধানত তিনটি অঞ্চলে তারা বসবাস করছে। মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলে, বিন্ধ্য ও সাতপুরা থেকে আরাবল্লী ও

ছোটনাগপুরের অরণ্যে আছে মুড়িয়া বইগা ভীল গোঁদ ওরাঁও সাঁওতাল হো শবর প্রভৃতি উপজাতি, দক্ষিণ অঞ্চলে নীলগিরি ও নানা পার্বত্য অঞ্চলে আছে টোডা কুরুম্বা কানিক্কার প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতি, আর উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে লেপচা রাভা কাছাড়ী গারো খাসিয়া মেচ মিকির নাগা কুকি আবর ও নেফার উপজাতিরা সগৌরবে বসবাস করছে। তাদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা আছে, জীবনযাত্রার প্রণালীতে আছে নিজস্বতা, নিজ নিজ সংস্কার ও সংস্কৃতিও আছে। পূজাপার্বণ নৃত্য-গীত-উৎসব সবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাদের নিজেদের ভাষাও আছে এবং এই ভাষার সংখ্যা প্রায় চৌত্রিশটি। আসামের উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত প্রায় নটি ভাষা এসেছে মোন্-খ্মের নামে একটি মূল ভাষা থেকে। এই রকম ভাবে মুণ্ডারী মূল ভাষার সাতটি উপভাষা মধ্য-ভারতের উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত, আর দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত পনরটি উপভাষার জন্ম হয়েছে দ্রাবিড় মূল ভাষা থেকে। এখন এই আদিবাসীদের মধ্যে প্রাদেশিক ভাষাও ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে। হিন্দী ওড়িয়া বা আসামী এরা বোঝে ও বলে। কথাবার্তায় আদিবাসী বলে সন্দেহ হয় না, এমন লোক আজকাল হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি নাম শুনেও অনেককে চেনবার উপায় নেই। উত্তরবঙ্গ ও আসামের সমতলভূমির কোচ মেচ প্রভৃতি উপজাতিরা তাদের নামের পিছনে দাস সরকার রায় চৌধুরী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছে ও নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে—কাশ্যপগোত্র বলে। চেহারায় বিশেষ বৈষম্য না থাকায় অল্প দিনেই তারা হিন্দু বর্ণাশ্রমীদের সঙ্গে এক হয়ে যাবে।

আদিবাসীদের সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ কথা আমাদের জানা থাকা দরকার। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীকেই আমরা আদিবাসী বলি, বিদেশী কথায় বলি অটকথোনিস। একদিন আমরাও এই আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলুম। শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নতি করে আজ আমরা সভ্য হয়েছি। যারা সেই আদিম অবস্থার মধ্যেই পড়ে আছে, তাদেরই

আমরা আদিবাসী বলে চিহ্নিত করে কৌতূহলের চোখে দেখছি। এদেরই আমরা উপজাতি বা খণ্ডজাতিও বলি। যাঁরা এই আদিবাসী সমাজ নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করছেন, সেই সমাজবিজ্ঞানী বা নৃবিজ্ঞানীরা এদের মধ্যে কতগুলি সাধারণ গুণ লক্ষ্য করেছেন। দলগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য এরা বদ্ধপরিকর। নিজেদের সমাজব্যবস্থা ভাষা ও সংস্কৃতিকে এরা এমনই শ্রদ্ধা করে যে সেখানে কোন হস্তক্ষেপ এরা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এরা শত্রুতাচরণ করে, সদলবলে অভিযান বা বলশালী শত্রুকে আক্রমণ করতেও এরা দ্বিধা করে না।

শিক্ষিত মানুষের জীবনে যেমন ষড়রিপুর প্রকোপ, আদিবাসীদের জীবনে তেমনি চারটি সহজাত প্রবৃত্তি প্রধান হয়ে উঠেছে। ভয় ক্ষুধা কাম ও ক্রোধ। কিন্তু নিজেরাই তারা নিজেদের মনুসংহিতা গড়ে সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। ভয়কে জয় করবার জন্য আছে জড়োপাসনা, তার থেকেই ধর্মবিশ্বাসের জন্ম। পূজায় পার্বণে উৎসর্গে উৎসবে তারা শিক্ষিত মানুষের চেয়েও অন্তরঙ্গ ভাবে একটা ধর্মমত অনুসরণ করে। ক্ষুধা কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুজাত বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা আছে। নিজেদের মধ্যেই কোন বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা মাতব্বরদের নিয়ে গঠিত এক সংস্থার উপরে সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব। পুরুষ ও নারীর মিলনের সহজাত ইচ্ছাকে সভ্য সমাজের মতোই বিবাহ-বন্ধনে সীমিত করেছে। এই বিবাহ কখনও নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার নাম এন্‌ডোগ্যামি বা অন্তর্বিবাহ। ভিন্নগোষ্ঠীতেও বিবাহ প্রচলিত হলে বলি এক্সোগ্যামি বা বহির্বিবাহ। সাঁওতালরা সাধারণত নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করে, আবার তাদের মধ্যেই টুডু হাঁসদা হেমব্রমরা নিজেদের গোত্রে বিবাহ করে না। কোন উপজাতির পুরুষেরা একবিবাহ বা মনোগ্যামিতে অভ্যস্ত, আবার কোন উপজাতির পুরুষেরা পলিগ্যামি বা বহুবিবাহ পছন্দ করে। হিমালয়ের খস ও দক্ষিণ ভারতের

টোডাদের মধ্যে মেয়েদের বহুপতিক বিবাহ বা পলিঅ্যানৃড্রি দেখা যায়। কোন একজন মেয়ে এক পরিবারের অনেকগুলি ভাইকে কিংবা এক বা ভিন্ন গ্রামের অনেকগুলি পুরুষকে প্রচলিত প্রথা হিসাবেই বিবাহ করে। অনেকে মনে করেন যে আদিম যুগে গোষ্ঠীবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। এ রকম অসংলগ্ন বিবাহ সেই প্রাচীন রীতিরই নিদর্শন।

যথাসময়ে আমাদের কফি এসেছিল। সেই কফি খেতে খেতেই কমলাকান্তবাবু আমাকে আদিবাসীদের কথা বলছিলেন। এ সমস্তই আমাদের জানা কথা, তাই খুব উৎসাহ পাচ্ছিলুম না। ভদ্রলোক বোধহয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু সন্দেহ করেছিলেন, তাই বললেন: আদিবাসীদের বিবাহ প্রথা নিয়েই একখানা বই লেখা চলতে পারে। মোটামুটি ভাবে কয়েক রকম বিয়ের কথা আপনাকে বলছি।

বলে ভদ্রলোক এক চুমুক কফি খেলেন।

আমি অমনোযোগ দেখাবার সাহস পেলুম না, তার কারণ ভদ্রলোকের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক কিছু জেনে নেওয়া যাবে। তাই আমি নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

কমলাকান্তবাবু বললেন: রাক্ষস বিবাহের কথা বোধহয় শুনেছেন, ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ভূমিজ বা হো-রা বলপূর্বক যে বিবাহ করে, তারই নাম রাক্ষস বিবাহ। মুণ্ডাদের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহেরও প্রচলন আছে। মুণ্ডা ওরাঁও বা লোধারা সামাজিক কোন আপত্তি দেখলে বর ও কন্যা দুজনে দেশান্তরী হয়ে বিবাহ করে, তারই নাম গান্ধর্ব বিবাহ। কোন হো বা বিরহড় কন্যা যদি কখনও কোন পুরুষকে বিয়ে করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে তাও মেনে নেওয়া হয়। তবে সেই কন্যাকে আগে শাশুড়ীর কাছে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হবে। এই হো বা সাঁওতালদের মধ্যে আর এক রকমের সহজ বিবাহ প্রথা খুবই প্রচলিত আছে। কোন মেলায় গিয়ে বর

তার কনের কপালে সিঁদুর ছুঁয়ে দিল, তাহলেই হল বিবাহ। আসামের কুকিদের মধ্যে আর এক রকমের বিবাহ দেখলুম।

বলে ভদ্রলোক থামলেন। আর এক চুমুক কফি খেয়ে বললেন: এক ছোকরা একটি কুকি পরিবারে কয়েক বছর ধরে মজুরের মতো খাটছে। শুনলুম যে এই পরিশ্রমের মূল্য বাবদ সেই পরিবারের একটি কন্যাকে সে বিবাহ করতে পারবে। এই রকম বিনামূল্যে শ্রমদান না করলে মেয়ের বাপ নাকি কন্যা দান করে না।

এর পরে কমলাকান্তবাবু কতকগুলি সামাজিক প্রথার কথা বললেন। এই সব প্রথা অনুযায়ী ছেলে মেয়েদের বিবাহ আগে থেকেই স্থির হয়ে থাকে এবং তাদের আপত্তিও অগ্রাহ্য করা হয়। গোঁদ টোডা ও ডেঙ্গাদের মতো আসামের গারোরাও মামাতো ও পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে। অনেক সমাজে ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূকে বা শালিদের বিবাহ করার প্রথাও প্রচলিত আছে। যা শুনলে শিহরে উঠতে হয়, তা হলে বিমাতা বা শাশুড়ীকে বিবাহ।

আমি এ কথা শুনে চমকে উঠেছিলুম। তাই দেখে কমলাকান্তবাবু খুশী হলেন, বললেন: চমকাবার মতো কথাই বটে। লাখের নামে একটা জাতি আছে বোধহয় বোম্বাই রাজ্যে, পিতার মৃত্যুর পর তারা বিধবা বিমাতাকে বিয়ে করতে পারে।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন: গারো যুবকের শাশুড়ী বিবাহের সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহের কথা আমি একাধিক বইএ পড়েছি, এ অঞ্চলের লোকের কাছেও সমর্থন পেয়েছি। তার একটা কারণ অনুমান করা যায়। গারো ও খাসিয়াদের মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ। পুরুষরা বিবাহ করে কন্যার বাড়িতেই থাকে, তাদের সন্তানের পরিচয় মাতামহীর নামে। ছেলেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, হয় মেয়েরা। কাজেই জামাইরা শ্বশুরবাড়িতে থেকে থেকে শাশুড়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবারও সুযোগ পায়।

আমি বললুম : এসব প্রথা বোধহয় এখন আর প্রচলিত নেই।

ভদ্রলোক এ কথা মেনে নিলেন, বললেন : তা হতে পারে। গারো বা খাসিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ এখনও আমি পাই নি। আর কতকটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি শিলঙে এসেছি, দরকার হলে গৌহাটিতেও কয়েক দিন থেকে যাব।

বললুম : শিলঙ তো খাসিদেরই রাজত্ব। সহজেই ওদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবেন।

ভদ্রলোক বললেন : সাহেবদের লেখা বই পড়ে ওদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমার আছে।

আমি বললুম : তাই কিছু বলুন না।

সে তো অনেক দিনের পুরনো কথা, এখন হয়তো অনেক কথাই মিলবে না।

কিছু মিলবে তো।

তা মিলবে।

বলে কমলাকান্তবাবু আমাকে প্রথমে গারোদের কথা ও তারপরে খাসি ও মিজোদের কথা বললেন। এ সবই তাঁর পুরনো বইএ পড়া কথা। তাই ভুল-ভ্রান্তির দায়িত্ব তিনি নিলেন না।

গারো পাহাড় আসামের একটি পার্বত্য জেলা। এই রকমের জেলা আসামে আরও তিনটি আছে। সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পাহাড় ও মিজো বা লুসাই পাহাড়। এই জেলাগুলি আসামের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। উত্তর কাছাড় ও মিজো পাহাড়ের মধ্যে কাছাড় জেলা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এই জেলার শিলচর ও করিমগঞ্জ শহরের নাম আমাদের কাছে পরিচিত। উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় আরও তুটি জেলা আছে। সেগুলি হল গোয়ালপাড়া কামরূপ দরং নওগাঁ শিবসাগর ও লখীমপুর। দক্ষিণ-পূর্বে নাগা পাহাড় এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নেফাও তাই।

দেশ স্বাধীন হবার পর পার্বত্য জেলাগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাদের অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে। কিন্তু তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়, সংবিধানের ষষ্ঠ শেড্যুল অনুসারে তারা আরও ক্ষমতা চাইছে। নাগা পার্বত্য জেলা তো আলাদা হয়ে গেল। ভারতের আরও অনেক পার্বত্য অঞ্চলে এই রকমের আদিবাসীর বাস, কিন্তু তাদের স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা অন্য কোন রাজ্যে দেওয়া হয় নি।

গারো একটি পাহাড় নয়, হিমালয়ের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ও পাকিস্তান সীমান্তের মধ্যে একটি পর্বতশ্রেণী পশ্চিমের খাসি ও জয়ন্তিয়া পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। এই পার্বত্য অঞ্চল সেইখানেই শেষ হয়ে যায় নি, দক্ষিণে লুসাই বা মিজো পাহাড় নামে ব্রহ্মদেশের আরাকান য়োমার সঙ্গে যুক্ত। আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বারাইল ও পাতকোই পর্বত শ্রেণী নামে হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে নামকিট পর্বতের সঙ্গে সংযুক্ত। আসামের সমস্ত আদিবাসীরা এই বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা জুড়ে বাস করছে। এক এক পাহাড়ে তাদের এক এক নাম। গারো জাতির প্রধান বাসস্থান হল গারো পাহাড়, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে খাসিদের বাস, আর লুসাই পাহাড়ে থাকে লুসাইরা, নিজেদের ওরা আজকাল মিজো বলে, আর নিজেদের দেশকে বলে মিজোরাম। এরা সবাই আছে আসামের দক্ষিণ এলাকা জুড়ে। শিলঙ তো খাসিদেরই রাজধানী। যেমন তুরা গারোদের। শিলঙকে প্রমীলার রাজ্য বললে অনেকেই মেনে নেবেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া এসেছিল প্রমীলার রাজ্যে, এই নারী রাজ্যের রানী প্রমীলা সেই ঘোড়া আটকেছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল মহিলাদের। প্রমীলার সাহস ও বীরত্ব দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়েছিলেন, পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। সে যুদ্ধে নয়, নারীর কাছে পুরুষের সনাতন পরাজয় অর্জুন হাসিমুখে বরণ করেছিলেন, বিবাহ করেছিলেন প্রমীলাকে। এই প্রমীলার রাজ্য কোথায়, আমার তা জানা নেই। এ নিয়ে

কেউ গবেষণা করেছেন কিনা, তাও আমি জানি না। মহাভারতের বর্ণনায় আছে নারীপ্রধান পুরী, ভারতবর্ষে আমি নারীপ্রধান পুরী একটিই দেখেছি। শিলঙের পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে সর্বত্র দেখছি খাসি নারীর অভিযান। পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই এখানে প্রধান, এ তাদেরই রাজ্য। শিলঙকে তাই প্রমীলার রাজ্য বলতে আমার ইচ্ছা করে। অর্জুন কি এই শিলঙের উপর দিয়েই মনিপুরে যান নি?

খাসিদের কথা নয়, কমলাকান্তবাবু আমাকে গারোদের কথা প্রথমে বলেছিলেন। গারোরা শিলঙে থাকে না, তারা থাকে গারো পাহাড়ে। তাদের প্রধান শহর তুরায় যেতে হয় গোয়ালপাড়া থেকে। মোটর চলাচালের ভাল রাস্তা আছে, গারো পাহাড়ের উপরে এই শহর। পাহাড়টিরও নাম তুরা। আর একটি সমান্তরাল পাহাড়ের নাম অরবেলা। উপত্যকায় কতগুলি নদীও প্রবাহিত হচ্ছে। অরণ্যময় সেই পর্বত ও উপত্যকার দৃশ্য অতি মনোরম।

গারো পাহাড়ে শুধু গারো নয়, আরও অনেক জাতি বাস করে। কোচ মেচ রাজবংশী দালু হালুঙ্গ রাভা। গারোরা দেখতে কতকটা কোচদের মতোই, নাতিদীর্ঘ দৃঢ়কায়, কালচে তামার মতো গায়ের রঙ।

কমলাকান্তবাবু বললেন: গারো মেয়ে পুরুষ আপনি দেখেছেন কিনা জানি না। দেখে থাকলে হয়তো তাদের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করেছেন। চোয়াল একটু উঁচু, পুরু ঠোঁট, আর মঙ্গোলীয়দের মতো থেবড়া নাক নয়। এদের হাবভাব বাঙালী কোচদের মতোই। ভাষাও বাংলা। এক সময় সমস্ত গারো পাহাড়টা যে কোচদের অধীন ছিল, এই গারো জাতিই তার প্রমাণ। গারো পুরুষেরা তাদের নিজেদের হাতে বোনা দেড়গজী ধুতি পরে, তার নাম গাণ্ডুবারা, আর মেয়েরা পরে রিথিং, ধুতির চেয়ে তা কিছু বড়, কিন্তু সমগ্র দেহ তাতে ঢাকে না। গ্রামের মেয়েরা নাকি নিরাবরণ বুকেই ঘুরে

বেড়ায়। গাছের ছাল পিটিয়ে তারা এক রকমের গায়ের কাপড় তৈরি করে, তার নাম ফ্রাক্রাম। এ তাদের শীতের পোশাক।

কমলাকান্তবাবু বললেন: আমি যে মেয়ে পুরুষদের দেখেছিলাম, তাতে তাদের অলঙ্কারপ্রিয় বলে মনে হয়েছিল। কানে পিতলের মাকড়ি আর গলায় পুঁতির মালা পরেছে, তাও একটা দুটো নয়, তিন চারটে করে। মেয়েদের মাকড়ি আর দুলগুলো এমন বড় যে কান কেটে ঝুলে পড়ে। কড়ি গেঁথেও এরা নানা রকম গহনা তৈরি করে। তার মধ্যে রূপক আর শেঙ্কি হল প্রধান। পিতলের কড়াকে বলে তাড়, আর মুকুটকে বলে বড়াশিল। পিতলের এই মুকুট পরে পুরুষেরা।

তাদের অস্ত্রশস্ত্রেরও নাম আছে। বর্শাকে বলে সেলু, তরোয়ালকে মেল্লাম, আর বাঁশের বর্শার নাম হুলগোঁজা। বাঁশ দিয়ে এরা ছোট ছোট এক রকম বর্শা তৈরি করে, তার নাম পাঞ্জি। পথের উপরে পাঞ্জি পুঁতে তারা শত্রুদের পথ রোধ করে, কিন্তু আবরদের মতো এই পাঞ্জিতে বিষ মাখিয়ে রাখে না।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। এত সব অস্ত্রশস্ত্র থাকতেও এরা শিকার করতে জানে না। ফাঁদ পেতেও পশুপাখি ধরতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধে এরা পটু, কলহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়েই আছে।

গারো বিদ্রোহের কথা আমার মনে পড়ল। সে বোধ হয় ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মেজর গডউইন অস্টেন আমিনদের নিয়ে এসেছিলেন গারো পাহাড় জরিপ করতে। বিবাদ হয়েছিল দুজন কুলির সঙ্গে। গারোদের ভাষা তারা জানত না। গারোদের একটা গ্রামে গিয়েছিল কুলি সংগ্রহ করতে। তখন সেই গ্রামের লোক-ফান্টিতে উৎসব হচ্ছিল। লোকফান্টি হল অবিবাহিত যুবকদের থাকবার জায়গা। কুলিরা কী করছিল তারাই জানে, কোন অপরাধ নিশ্চয়ই করেছিল। গ্রামের সর্দারকে ওরা লখ্মা বলে, সেই লখ্মা

বলল, ওদের ধরে কেটে ফেল। ভয় পেয়ে একটা লোক পালিয়ে যায়, আর একটা লোক প্রাণ হারায়। গারোদের এই অপরাধ, খবর পেয়ে বৃটিশ সৈন্য এল মার মার করে। কিন্তু গারোরা পালাল না, তারাও রুখে দাঁড়াল, ইংরেজেরা চারিদিক থেকে পুলিস আর সৈন্য এনেছিল। দুবার যুদ্ধ হয়েছিল গারোদের সঙ্গে। তারপরে তারা হার স্বীকার করেছিল। ইংরেজরা গ্রামে গ্রামে লস্কর নিযুক্ত করেছিল, লস্কররাই গ্রাম শাসন করবে।

কমলাকান্তবাবু বললেন: ঝুম চাষ কাকে বলে তা বোধ হয় জানেন।

বললুম: জানি নে।

পার্বত্য যাযাবরদের চাষবাসের প্রণালীকে ঝুম চাষ বলে। একই জমিতে এরা প্রতিবছর চাষবাস করে না, প্রতিবছর তারা স্থানান্তরে যায়। একবার এক জমি চাষ করলে বছর দশেক পরে আবার সেই জমিতে ফিরে আসে। তাদের লাঙল কোদাল নেই, আছে শুধু দা কুড়ুল আর কাস্তে, এরা বলে আতে রোয়া আর কচি। গুলমথর নামে একটা শাবলের মতো অস্ত্র দিয়ে মাটি খুঁড়ে তারা বীজ বপন করে। শীতকালে একটা জমি নির্বাচন করে জঙ্গল কেটে ফেলে রেখে আসে, চৈত্র মাসে আগুন দিয়ে সেই জঙ্গল পোড়ায়, সেই ছাইএর উপরেই চাষ করে বৃষ্টির জল পড়লে। ধান তুলো লঙ্কা আর রবিশস্য। ফসল পাহারা দেবার জন্যে সেই জমির উপরেই ঘর বেঁধে কিছু দিন বাস করে। ফসল কাটা হয়ে গেলেই তাদের উৎসব। গ্রামেও তাদের একটুকরো করে জমি আছে, সেই জমি তারা সাত আট বছর পর পর চাষ করে।

কমলাকান্তবাবু আমাকে গারোদের খাদ্যাখাদ্যের কথাও বললেন। সাহেবদের লেখা বইএ পড়েছেন, কাজেই বিশ্বাস করতে পারেন নি অনেক কথা। গারোরা শুধু গোমাংস নয়, বাঘ ও সাপের মাংসও খেতে ভালবাসে। কুকুরপিঠে তাদের নাকি একটি প্রিয় খাদ্য। কুকুরপিঠে তৈরি করার কায়দাও আমাকে শোনালেন। একটা

কুকুরকে আকণ্ঠ চাল খাইয়ে তাকে মেরে পোড়ানো হয়, যেমন আমরা মুরগী কেটে তার পেটে চাল পুরে রোস্ট করি। সেই ঝলসানো কুকুরটাই কুকুরপিঠে। গারোরা তাই কেটে কেটে খায়।

এ কথা শুনে আমি বলেছিলুমঃ অবিশ্বাস্য কথা।

ভদ্রলোক আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন: আমিও তাই মনে করি। তবে সাহেবদের লেখা বই পড়ে দেখবেন, এ রকম অবিশ্বাস্য কথা অনেক আছে। 'ভারতের অসভ্য জাতি' নামে হজসন সাহেব একখানা বই লিখেছিলেন, তাতেও এই গারোদের কথা আছে।

তারপরে তিনি যা বললেন তা অবিশ্বাস্য নয়। গারোরা চাল থেকে চু নামে এক রকম মদ তৈরি করে, বেশি না খেলে তাতে নেশা হয় না। আর বাঁশ থেকে কসরেঙ্গ নামে এক রকম নল তৈরি করে ধূমপানের জন্য। সাহেবদের পাইপের মতো শুকনো দোক্তাপাতায় আগুন দিয়ে তারা ধূমপান করে। দিনে তারা তিনবার খায়, সকালে মীফ্রিং দুপুরে মীসাল আর সন্ধ্যাবেলায় মিয়াথম। খাবার আগে মদ তারা খাবেই, আর খাবার পরে তামাকু। আর জানেন তো, নুন কেনবার পয়সা তাদের নেই। কলাগাছ পুড়িয়ে এক রকম ক্ষার পায়, তাই খায় নুনের বদলে। এক ভাত ছাড়া আর সব কিছুই খায় পুড়িয়ে।

আমি বললুম: এখন নিশ্চয়ই তাদের জীবনধারা বদলেছে।

ভদ্রলোক বললেন: তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই একটা গারোদের গ্রামে দুদিন থেকে যাব ভাবছি। যারা শহরে এসেছে তাদের দেখলে তো কিছু বোঝা যায় না, যারা আর গ্রামেই পড়ে আছে তাদের জীবনযাত্রাই ভাল করে দেখা দরকার।

গারোদের বিয়ের ব্যাপারটা খুবই সহজ। পুরোহিত না থাকলেও চলে। বর কন্যার বাড়ি এলে তাদের দুজনের সামনে একটা মোরগ আর একটা মুরগী কাটা হয়। তারপর তাদের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে বিচার হয়। এই বিচার শেষ হলে একজন স্ত্রীলোক মরা মুরগী নিয়ে

বাড়ির বাহিরে যায়। পুরোহিত বা কোন আত্মীয় তাকে মারতে মারতে যায় পেছনে। তাহলেই বিয়ে সম্পূর্ণ, তখন ভোজ উৎসব।

এর চেয়ে কঠিন হল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। কেউ মারা গেলে শবকে সাজিয়ে গুজিয়ে দু-তিনদিন ফেলে রেখে দিতে হবে। সবাই তখন কান্নাকাটি করবে আর রাত জেগে শব পাহারা দেবে। শবদাহ হবে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে, আর সেই দাহের জায়গাটি বাঁশ দিয়ে ঘেরা হবে। ভস্মের উপরে খাবারদাবার দেওয়া হবে, কুকুর কাটা হবে একটা। মৃতের আত্মা তো চিকমাঙ্গ পাহাড়ে যাবে, সে অনেক দূর। তাই খেয়েদেয়ে আত্মা যাত্রা করবে, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মরা কুকুরটা। তারপরে হবে শ্রাদ্ধ শান্তি ভোজ উৎসব। এক সপ্তাহ পরে ভস্ম এলে ঘরের দুয়োরে পুঁতে ধ্বজা উড়িয়ে দেওয়া হবে।

তারপরে আর এক অবিশ্বাস্য কথা। গ্রামের সর্দার মরলে একটা ক্রীতদাস বলি দিতে হবে। এই নিয়ে দুটো দল হত, আর দাঙ্গা হাঙ্গামা খণ্ড যুদ্ধে পরিণত হত। আত্মার তৃপ্তির জন্যেই এইসব নিয়ম।

গারোদের পুজারীর নাম কমাল আর দেবতার নাম মালজাঙ্গ। তিনি সূর্য। পিশাচ ও ডাকিনীতে এদের বিশ্বাস, অসুখ হয় অপদেবতার ক্রোধে। তার জন্যে উপহার ও বলির ব্যবস্থা আছে।

আমি বললুম: গারোদের বিবাহিত জীবনের কথা কিছু বললেন না।

কমলাকান্তবাবু বললেন: বলি নি বুঝি?

তারপরেই বললেন: খুব বেশি আমার জানা নেই। তবে কতগুলো নিয়মকানুন জানি। স্ববংশে এদের বিয়ে হয় না বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে হয়। পুরুষেরা সাধারণত দুটোর বেশি বিয়ে করে না, আর প্রথমা স্ত্রী জিকৃফোংমার অনুমতি নিয়েই দ্বিতীয়া স্ত্রী জিক্‌গিত্তি গ্রহণ করে। ব্যভিচার দোষে আগে প্রাণদণ্ড হত,

এখন স্ত্রী স্বামীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাই আদায় করে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। বাড়ি তো স্ত্রীরই, বিয়ে করে গারো পুরুষকে থাকতে হয় শ্বশুরবাড়িতে। তবে মেয়ে যদি আদরের হয় তবে জামাইএর একটু বিপদ আছে। শ্বশুর মরলে শাশুড়ীকে তার বিয়ে করতেই হবে।

কমলাকান্তবাবুর কথার ধরনে আমি হেসে ফেলেছিলুম। কফি আমাদের অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এইবারে উঠব ভাবলুম। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে উঠতে দিলেন না, বললেন: বসুন না আর একটু। অফিস তো নেই, ঘরের লোকও নেই, একা ঘরে বসে করবেন কী?

সেকথা সত্যি, কিন্তু এসব কথা শোনবার জন্যে ধৈর্যও চাই। অনেক শুনেছি, এবারে একটু অন্য কথাই ভাল লাগত। কিন্তু তার উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আমাকে খাসি আর মিজোদের কথাও শোনাবেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: খান একটা।

এমনি করে আরও অনেকবার তিনি সিগারেট এগিয়ে দিয়েছিলেন, আর প্রতিবারের মতো এবারেও বললুম: ধন্যবাদ!

ও, আপনি তো আবার ভাল ছেলে।

বলে ভদ্রলোক নিজেই আর একটা সিগারেট ধরালেন। হোটেলের বেয়ারা যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। তাকে ডেকে গরম চায়ের ফরমায়েশ করলেন। আমাদের এই হোটেলেও কয়েকটি খাসি ছোকরা কাজ করছে। ফর্সা গোলগাল মুখ, ছোট চোখ আর থ্যাবড়া নাক, মুখে পান আর হাসি লেগেই আছে। কমলাকান্তবাবু বললেন: এই ছোকরাদের দেখছেন তো, এরাই হল খাসি বা খাসিয়া জাত, পথে-ঘাটে মেয়েও নিশ্চয়ই দেখেছেন!

বললুম: দেখেছি।

ভদ্রলোক বললেন: এদের সম্বন্ধেই এখন খোঁজ খবর নিচ্ছি,

কিন্তু বিশেষ কিছুই জানতে পারি নি। সাহেবদের বইয়ে পড়েছিলাম যে এদের বিবাহ প্রথাই পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা। বিয়ে ঠিক হলে বর আসবে কনের বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই আসবে। আনন্দ আহ্লাদ হবে, ভোজ হবে, তারপর ঘুম। সকালবেলায় বউ নিয়ে বাড়ি ফিরবে দুদিনের জন্য। তারপরে সারা জীবন কাটাবে শ্বশুর-বাড়িতে। মেয়েরাই কর্ত্রী তো, কাজেই তাদের মনোরঞ্জন করে পুরুষদের থাকতে হবে।

এর পরে কমলাকান্তবাবু লুসাইদের কথা বললেন। লুসাইরা হল লুসাই পাহাড়ের পার্বত্য জাতি। কুকিরাও বাস করে এই লুসাই পাহাড়ে। একদা তারা ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ জাত ছিল. ব্রহ্মদেশের সামান্ত বরাবর তাদের একচ্ছত্র অধিকার। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছে, কাবু করেছে তাদের। চা বাগান লুট করে সাহেব মেমদের বেঁধে নিয়ে গেছে, ইংরেজদের সৈন্য পাঠাতে হয়েছে যুদ্ধ করে তাদের উদ্ধার করবার জন্যে। একজন দুজন নয়, একবার তারা একশো জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এ সব গল্প ইতিহাসেই লেখা আছে। এই কুকি আর লুসাইদের কথা কমলাকান্তবাবু আমাকে সংক্ষেপে বললেন।

উত্তরে মনিপুর ও নাগা পাহাড় থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুকি ও লুসাইদের বাস। এদের অনেক জাত, এক একজন সর্দারের নামে এক একটি জাত। মনিপুর রাজ্যে কোয়েরিং ও কুপুই জাতি, কাছাড়ের দক্ষিণে হোলঙ্গ সাইলু আর অঙ্গলোবা। যে কুকিরা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে শান্তশিষ্ট হয়ে গেছে, তারা পুরাতন কুকি নামে পরিচিত।

প্রত্যেক গ্রামে একজন করে সর্দার আছে, তার নাম লাল। লালরা পুরুষানুক্রমে এই সর্দার পদের অধিকারী। যার যত বিক্রম, তার দল তত ভারি হয়। সীমান্তে লুটপাট করে মানুষের মাথা কেটেও আনত। সেই মাথা ওদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় লাগে। দস্যুবৃত্তি

ও নরহত্যা ওরা অবলীলাক্রমে করে। এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না, চাষ করে ঝুম প্রথায়। কিন্তু পশুপালন করে, শিকার করতেও জানে। কাপড় তৈরি করে, অলঙ্কারও ব্যবহার করে। এক সময় তারা বিবস্ত্র থাকত, এখন কাপড় পরে, কুমারী মেয়েরাও বুকে কাপড় বাঁধতে শিখেছে। তবে বিবাহিতারা অনেক সময় বাঁধে না।

কুকিদের মধ্যে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। বার তের বছর বয়স হলে ছেলেমেয়েরা আর ঘরে থাকে না। গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্যে আলাদা ঘর আছে, সেই ঘরে তারা পাহারার মধ্যে থাকে। বড় হয়ে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বাড়িতে থাকবার উপায় নেই।

কুকি সর্দারদের উপরেও একজন আছেন, তার নাম প্রথম। কুকিদের রাজা তিনি, সব লাল সর্দার তাঁকে মানে।

ইতিহাসের কথা আমার মনে পড়ল। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে কুকি আর লুসাইদের অত্যাচারে এ অঞ্চলের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কোন অন্ধকার রাতে এই বুনো লোকগুলো রৈ রৈ করে এসে একটা গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুটপাট করল, ধরে নিয়ে গেল কয়েকটা লোক। তারা বন্দী থাকবে। টাকাপয়সার প্রয়োজন তাদের নেই, তাদের দরকার কয়েকটা নরমুণ্ড। কাজের সময় হঠাৎ কোথায় মাথা পাওয়া যাবে! তারপর প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারও আছে। কেউ শত্রুতাচরণ করলে তার মুণ্ডটি চাই। যে ভাবেই হোক, মাথাটা কেটে আনতে হবে। না পারলে কাপুরুষ বলে ধিক্কার পেতে হবে, আর পারলে সেই ছিন্ন মুণ্ডটি সামনে রেখে নৃত্য গীত হবে। সে এক বীভৎস উৎসব।

গারোরা যখন বিদ্রোহ করেছিল, তার আগে থেকেই ইংরেজ এদের সায়েস্তা করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, কিন্তু পারছিল না। এদের জয় করা সোজা নয়। তীরের সন্ধান অব্যর্থ, বনের আড়ালে

লুকিয়ে থেকে আক্রমণ চালায়, বন্দুক ছুঁড়তেও জানে। লুটপাট করে এরা বন্দুক গোলাগুলিও নিয়ে গেছে। তারপর সেই চা বাগানের ঘটনা ঘটল। আলেকজান্দ্রাপুরের চা বাগান। আক্রমণ করেছিল একদল হৌলঙ্গ। ইংরেজ অধ্যক্ষ মিস্টার উইকেষ্টার মারা পড়লেন, হৌলঙ্গরা ধরে নিয়ে গেল তাঁর কন্যাকে। এর দশ বছর আগে ত্রিপুরার গ্রামে এরা একসঙ্গে একশো ছিয়াশি জন বাঙালীকে মেরে আরও একশো জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কাছাড় শিলেট ও মনিপুরে এরকম উৎপাত লেগেই ছিল। ইংরেজরা সৈন্য পাঠাত, আর সেসব সৈন্য কিছু করতে না পেরে ফিরে আসত। কিন্তু এবারে ইংরেজ মরেছে দেখে ইংরেজরা শক্ত হল। একটা থানায় আর এক দলের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল দুদিন, কিন্তু সেখানেও লুসাইরা যুদ্ধ জয় করে কামান বন্দুকও কেড়ে নিয়ে গেল, বন্দী করে নিয়ে গেল ইংরেজদেরও।

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড মেয়ো। তিনি প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারকে ভার দিলেন এই দুর্ধর্ষ লোকগুলোকে সায়েস্তা করবার। কাছাড় থেকে দুজন জেনারেল সৈন্যসামন্ত নিয়ে অগ্রসর হলেন, চট্টগ্রাম থেকেও সৈন্য এল। সমস্ত লুসাই পাহাড় তারা তছনছ করে ফেলল। অত সৈন্যসামন্ত আর গোলাগুলির সামনে বন্য আদিবাসীরা আর কদিন দাঁড়াবে! একে একে সর্দাররা মাথা নিচু করল। তারপর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে যে দরবার বসল, সেই দরবারে এসেছিল সর্দারেরা। কিন্তু সবাই আসে নি। দুজন হৌলঙ্গ সর্দার অনুপস্থিত থেকে তার দলের লোকদের বলেছিল, দেখে নেব ইংরেজকে।

এই বিদ্রোহ আজও বেঁচে আছে। বন্য আদিবাসীকে যারা বশ করতে যায়, তাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বলে, দেখে নেব। সে ইংরেজই হোক, আর ভারতবাসীই হোক।

১৫

চায়ের সঙ্গে বেয়ারা একটি খবরও আনল। বাহিরে তুটি মেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞাসা করেছে, দেখা হবে, না আজ ফিরে যাবে।

কে, কী জন্য এসেছে, এ সব কথা আমি জানতে চাইলুম না, বললুম: এখুনি তাদের নিয়ে এস, আর সেই সঙ্গে আর এক পট চা।

বেয়ারা প্রসন্ন মুখে ঘাড় নেড়ে চলে গেল। আর কমলাকান্তবাবু আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। ভাবখানা এই রকম যে মেয়েরা আমার কাছে কেন এসেছে। কিন্তু আমি কিছু বললুম না দেখে নিজেই প্রশ্ন করলেন: অফিসের কাজ নিয়ে এসেছে নাকি?

বললুম: বুঝতে পারছি না।

কিন্তু তার পরেই সব বুঝতে পারলুম। নতুন একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ইভা এগিয়ে এল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: এস এস।

কমলাকান্তবাবুও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ইভার পরিচয় করে দিলুম, আর ইভা দিল নতুন মেয়েটির পরিচয়। বলল: জান্তিনা আমাদের শিলঙ অফিসে কাজ করে।

সত্যি নাকি!

বলে আমি তাদের জন্য তুখানা চেয়ার টেনে দিলুম। তাদের বসতে বলে নিজেরাও বসলুম।

কমলাকান্তবাবু চা ঢেলে মেয়েদের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপরে নতুন চা এলে নিলুম নিজেরা। ইভা বলল: এরা আজ আপনার সামনে কেউই আসে নি। আপনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন শুনলুম।

আমি একটু লজ্জিত ভাবে বললুম: আজ প্রথম দিন বলেই পরিচয় করতে পারি নি। কাল প্রথমেই সবার সঙ্গে দেখা করব।

ইভা বলল: না না, সে কথা নয়, ওরাই আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

কমলাকান্তবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন তাঁর মনে জমে উঠেছে। কিন্তু তার একটিও প্রকাশ করতে না পেরে কষ্ট বোধ করছেন। আমি হেসে বললুম: ইভা আমাদের গৌহাটি অফিসে কাজ করে। আজ আমার সঙ্গেই শিলঙে এসেছে।

ভদ্রলোক কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন, বললেন: কোথায় উঠেছেন?

ইভা বলল: এর বাড়িতে।

বলে জান্তিনাকে দেখাল।

আমি সহাস্যে বললুম: পুরনো বন্ধু বুঝি?

ইভাও হাসল। খুব সরল মিষ্টি হাসি। এর আগে তার মুখে আমি এ রকম সুন্দর হাসি দেখি নি। দেখেছি একটা আড়ষ্ট হাসি।

নতুন মেয়েটি এবারে প্রথম কথা কইল। বলল: কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়েছি।

কমলাকান্তবাবু বললেন: আমারও তাই মনে হয়েছে।

চা খেতে খেতেই আমাদের কথা হচ্ছিল। ইভারা কেন এসেছে, সৌজন্যবোধে সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। কিন্তু ইভা নিজেই এক সময় সে কথা বলল: মিস্টার বড়ুয়া আমাকে বারবার আপনার কথা বলেছেন।

কী কথা?

আপনাকে দেখাশোনার কথা, সুবিধা অসুবিধার কথা। নতুন মানুষ আপনি, তাই।

কমলাকান্তবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে

বললুম: মিস্টার বড়ুয়া আমাদের গৌহাটি অফিসের ম্যানেজার। খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন: তাই তো দেখছি। তা না হলে এত চিন্তা করবেন কেন!

কাকতির কথায় আমি মিস্টার বড়ুয়াকে আজকাল সন্দেহের চোখে দেখছি। তাই এ প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে ইভাকে বললুম: এখানে বেশ ভাল ব্যবস্থা, আমার কোন অসুবিধা হবে না। তোমার কাজ শেষ হলেই তুমি গৌহাটি ফিরে যেতে পার।

ইভা তার বন্ধুকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কমলাকান্তবাবু বাধা দিলেন, বললেন: উঠছেন কেন, বসুন না আর একটু।

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বসে পড়ল।

ভদ্রলোক এবারে আমাকে বললেন: হোটেল আর অফিসের বাইরে আর একটা জীবন আছে। সেই জীবনের খবর কিছু রাখেন?

বললুম: না।

সেইটেই আসল জীবন, সেই জীবনের জন্যেই হোটেল আর অফিস।

তাও অস্বীকার করি না।

ভদ্রলোক বললেন: তবেই দেখুন, এঁকে গৌহাটি ফিরে যেতে বলে কত বড় অন্যায় করলেন! আপনি শিলঙ শহরটা দেখলেন না, এখানকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও কিছু জানলেন না। এঁরা আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারতেন, অথচ আপনি ঠিক পুরাকালের অফিস মাস্টারের মতো গম্ভীর মুখে সে সুযোগ হারাবার ব্যবস্থা করলেন।

তার পরেই ইভার দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনাদের যদি কষ্ট না হয় তো চলুন না একটু বেরিয়ে পড়ি, আপনাদের বাড়িটাই দেখে আসা যাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: আপনি এখন বেরোতে চাইছেন নাকি?

ভদ্রলোক তাঁর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন: কেন, দোষ কী! এখনও তো আটটা বাজতে দেরি আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসব।

শিলঙে এখন শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যাবেলায় গরম জামার দরকার। অবশ্য গায়ে আমার হালকা উলের জামা ছিল। ভদ্রলোকের গায়েও ছিল গরম জামা। বললেন: নিন, উঠে পড়ুন।

বলে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েরাও উঠল। আমি তবু ইতস্তত করছিলুম।

ভদ্রলোক এবারে আমাকে একটা ধমক দিলেন। বললেন: উঠুন না, ঠাণ্ডা লাগে তো একটু রঙীন জল খেয়ে আসা যাবে।

বলে আবার তাঁর সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আবার আমি বললুম: ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক নিজে একটা সিগারেট নিয়ে বললেন: এত ভাল ছেলে হওয়া ভালো নয়।

আমার সঙ্গে কমলাকান্তবাবু বাঙলাতেই কথা বলছিলেন। ইভা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। তাই হাসছিল। সেই সরল মিষ্টি হাসি সহজ প্রসন্ন। আমি আর দ্বিধা না করে উঠে দাঁড়ালুম।

পথে নেমে কমলাকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: একটা ট্যাক্সি ধরব?

উত্তর দিল ইভা, বলল: আপনাদের কি হাঁটতে কষ্ট হয়? আমরা হেঁটেই এসেছি।

আমি বললুম: নতুন জায়গায় হাঁটতেই তো ভাল লাগবে।

সত্যিই তাই, পথের দোকানপাট ঘরবাড়ি আর লোকজন দেখতে দেখতে হাঁটতে আমাদের ভাল লাগছে। এক সময় কমলাকান্তবাবু আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন: আমার পরিচয়টা এদের বলুন না।

তাঁর পরিচয় আমি আগেই দিয়েছি, কাজেই নতুন কী পরিচয় দেব বুঝতে না পেরে বললুম : কোন্ কথা বলতে বলছেন ?

ভদ্রলোক বিরক্ত ভাবে বললেন : কী মুশকিল !

ততক্ষণে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তাড়াতাড় বললুম : আমার বন্ধুর আসল পরিচয়টাই তোমাদের দেওয়া হয় নি।

বলে ইভার দিকে তাকালুম। ইভারা তাকাল আমার দিকে। বললুম : কমলাকান্তবাবু জাতে জর্নালিষ্ট হতে পারেন, কিন্তু মনে ফিলানথ্রপার, নৃতত্ত্বে অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। আদিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানবার আগ্রহ নিয়েই এদেশে এত দিন পড়ে আছেন।

কমলাকান্তবাবু গদগদ ভাবে বললেন : না না, আপনি খুব বাড়িয়ে বলছেন। আমার সামান্য একটু কৌতূহল, এই পর্যন্তই।

কিন্তু ইভার বন্ধুটি আশ্চর্য হয়ে বলল : তাই নাকি !

মেয়েটির এই কৌতূহল দেখে ভদ্রলোক খুশী হলেন, বললেন : একটু আগে আমরা এই সব আলোচনাই করছিলুম। কাগজের কাজে আমি নেফায় ছিলুম, ঘুরেছি অনেক জায়গায়, অনেক মানুষ দেখেছি। নেফার মানুষদের সম্বন্ধে আমার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। কিন্তু—

বলে ভদ্রলোক থামলেন। তাঁর সিগারেটে শেষ টানটি দিয়ে রাস্তার ধারে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপরে বললেন : কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি। গোপালবাবুকে যা বললাম সে সবই আমার পড়া কথা। আর পড়া কথা মানেই ভুল কথা।

ইভা আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : উনি আমাকে গারোদের কথা শুনিয়েছেন, শুনিয়েছেন লুসাই আর কুকিদের কথা।

ইভা হেসে বলল : লুসাই নাম আর নেই, ও অঞ্চলের নাম হয়েছে মিজোরাম, আর ওরা নিজেদের মিজো বলে। ওদের ভারি মিষ্টি স্বভাব।

কমলাকান্তবাবুর কথায় আমি ওদের একটা বর্বর নৃশংস জাত বলে মনে করেছিলুম। তিনিও এ কথা বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ইভা বলল: এই যে আজ আমরা কোমরে এই মোটা কাপড় জড়িয়েছি, এগুলো মিজো মেয়েদেরই তৈরি। এ সব কাপড় ওরা চমৎকার বোনে। আপনি গিয়েছেন আইজলে?

বলে ইভা কমলাকান্তবাবুর দিকে তাকাল।

কমলাকান্তবাবু বিব্রত বোধ করলেন, বললেন: নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

ইভা বলল: ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের টাইমটেবলে বোধহয় দেখেছেন। ইম্ফল থেকে এয়ারে মাত্র কুড়ি মিনিট লাগে। মিজোরামের প্রধান শহর আইজল। শিলচর থেকে মোটরে একশো তেরো মাইল দক্ষিণে। পথের শোভা দেখবার জন্যেই একবার যাওয়া উচিত।

জাস্তিনা বলল: আর মিজোদের দেখেও আশ্চর্য হতে হয়। এত অল্প সময়ে ওরা এমন উন্নতি করেছে যে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আইজল শহরের কথা আমরা এদের কাছেই শুনলুম। ছোট্ট পাহাড়ী শহর, কিন্তু ছবির মতো সুন্দর। হাজার তিনেক লোক শহরে বাস করে। মুক্ত আকাশের নিচে তাদের বাজার বসে। শিলঙের মতো মেয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাই বেশি। মেয়েরা শুধু কোমরে কাপড় জড়ায় না, শাড়িও পরে। আর জামা পরে পুরো হাতার। শহরে একটা হাসপাতাল আছে, মেরি কালচার আর বেসিক ট্রেনিং-এর সেণ্টার আছে। নেই শুধু জল। জলের খুব অভাব বলে সারা বছর বৃষ্টির জল ধরে রাখবার ব্যবস্থা আছে। এই সঞ্চিত জল ইচ্ছা মতো খরচ করার উপায় নেই। তার জন্যে রেশন ব্যবস্থা চালু আছে।

সমুদ্রের ধারে আমি জলের কষ্ট দেখেছি। জল আছে প্রচুর,

কিন্তু পানীয় জল নেই। দক্ষিণ-ভারতের ধনুস্কোডিতে রেলের ট্যাঙ্ক ওয়াগনে রোজ খাবার জল আসে। দ্বারকায় কূপ আছে, কিন্তু সে জল পানের জন্যে ব্যবহার হয় না। পানের জন্য বৃষ্টির জলই সঞ্চয় করে রাখা হয়। আফগানিস্থানেও শুনেছি জলের এই রকম কষ্ট। রেল গাড়িতে করে জল আসে অনেক জায়গায়।

কমলাকান্তবাবু জান্তিনাকে জিজ্ঞাসা করলেন: মিজোদের সম্বন্ধে আপনি কি বলছিলেন?

জান্তিনা বলল: মিজো মেয়েরা ভারি ভাল। ওদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আর যদি পারেন তো তাদের নাচ একবার দেখে আসবেন। বাঁশ চৌকো করে সাজিয়ে তারই উপর এমন অদ্ভুত দক্ষতায় মেয়েরা নাচে যে আপনাকে আশ্চর্য হতেই হবে। এই নাচকে ওরা চিরো নাচ বলে।

ইভা বলল: শিলচর থেকে যদি মোটরে যান তো ভুবন নগরে একদিন থেকে যাবেন।

আমি বললুম: সেখানেও কিছু দেখবার আছে নাকি?

ইভা বলল: ও অঞ্চলে ভুবনেশ্বরের মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। শিলচর থেকে একত্রিশ মাইল দূরে, ভুবন হিলে এই মন্দির। ভুবন নগর পর্যন্ত বাস আছে, তারপর আট মাইল হাঁটতে হয়। শিবরাত্রি দোল-পূর্ণিমা আর বারুনী স্নানের সময় বহু যাত্রী সেখানে যায়। অপরূপ পরিবেশে এই মন্দিরটি আপনাদের সত্যিই ভাল লাগবে।

কমলাকান্তবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: যাবেন নাকি?

আমি হেসে বললুম: আপনি স্বাধীন মানুষ, আপনিই ঘুরে আসুন।

স্বাধীন আর কোথায়!

বলে ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কথায় কথায় আমরা শহরের এক প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলুম। রাস্তার উপরে ছোট ঘরবাড়িগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট। পথঘাট কিছু

অন্ধকারও বটে। জাস্তিনা ইভাকে একটু পাশে টেনে নিয়ে গেল। তার মধ্যে খানিকটা অস্থিরতা আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। দুজনে নিজেদের ভাষায় কি বললে বুঝতে পারলুম না। ইভা আমাদের কাছে ফিরে এল। আর জাস্তিনা এগিয়ে গেল হনহন করে।

আমাদের চোখে কিছু কৌতূহল দেখে ইভা বলল : জাস্তিনা ওর মাকে খবর দিতে গেল।

বলে একটু দাঁড়াল। তারপরে বলল : দেখছেন তো এই জায়গাটা, একটু গরিব-গরিব ভাব। আমরা এদিকটাতেই থাকি।

আমি বললুম : তাই নাকি!

আর কমলাকান্তবাবু বললেন : কিন্তু পরিবেশটা ভাল।

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে ইভা জাস্তিনাকে একটু সময় দিতে চাইছে। তার বাড়ি নিশ্চয়ই কাছে, মাকে খবর দেবার নামে একটু গাছগাছও হয়তো করে নেবে। পথে এখন মেয়ে নেই। দু একজন পুরুষকেই চলাচল করতে দেখছি। এরই মধ্যে জাস্তিনা যে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে তা খেয়াল করি নি। ইভা যখন আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন আর তাকে দেখতে পেলুম না।

আমরা যখন জাস্তিনার বাড়ির দরজায় পেঁীছলুম, তখন একটা লোককে ওরা ঠেলেঠুলে বার করে দিচ্ছিল। মা আর মেয়ে দুজনে ধাক্কা দিয়ে একটা জোয়ান লোককে দরজা দিয়ে পথে বার করে দিল। চেঁড়ে গলায় লোকটা ওদের শাসাচ্ছিল। আর মা মেয়ে দুজনেই কিছু বোঝাচ্ছিল তাকে। ইভা আমাদের নিয়ে দাঁড়াল একটুখানি, তারপর এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল : একটা মাতাল ঢুকেছিল বুঝি?

জাস্তিনার মা বললেন : আর বল কেন, আমরা কি পারি ওকে বার করতে।

লোকটা কিন্তু বাড়ির বাহিরে এসে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল একবার, তারপরে বলল : গুড নাইট সার্।

বলে ডান হাতে একটা সেলাম করে শিস দিতে দিতে এগিয়ে গেল।

ইভা আমাদের পরিচয় করে দিল। জাস্তিনার মা আমাদের সসম্ভ্রমে ভিতরে নিয়ে এলেন। একখানা বড় ঘর, ডান ধারে কাঠের পার্টিসনের আড়ালে হয়তো শোবার ব্যবস্থা আছে। আমরা বাঁ ধারে চলে এলুম। সেখানে একখানা গোল টেবিলের চারিধারে কয়েকখানা কাঠের চেয়ার। দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি দুখানা বেঞ্চও আছে। টেবিলের ওপরে যে অ্যাশট্রে আছে, তার থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। জাস্তিনার মা আমাদের বসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। জাস্তিনা আরও মিষ্টি সুরে বলল : বসুন।

কমলাকান্তবাবু বসবার জন্মেই এসেছিলেন, একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। আমরাও বসলুম। কিন্তু জাস্তিনার মা বসলেন না। টেবিলের উপরে একটা কাচের গেলাস ছিল, সেটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন। আমি দেখলুম যে, পিছনের বারান্দা থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তিনি নিচে নেমে গেলেন। আমি কাঠের উপরে তাঁর ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম।

ইভা কমলাকান্তবাবুকে বলল : এখানে এই রকমের উপদ্রব লেগেই আছে। একটু-আধটু পরিচয় থাকলেই ঢুকে বলবে একটু মদ খাওয়াও। আরে, একি মদের দোকান যে চাইলেই পাওয়া যায়!

জাস্তিনা বলল : মার কাছে শুনেছি, আগে ওরা টেবিলের ওপর ঝনাৎ করে একটা সিপিয়ার ফেলে দিয়ে হুকুম করত।

সিপিয়া কি?

ইভা বলল : আধুলি।

বেশিক্ষণ আমরা কথা বলি নি। তার আগেই জাস্তিনার মা ফিরে এলেন। তার হাতে একখানা ছোট ট্রে, তার ওপরে দুটি সুন্দর

কাচের গ্লাস, রঙীন পানীয় টলটল করছে। কমলাকান্তবাবুর চোখ-জোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন : না না, এসব আবার কেন!

বলেই একটা গেলাস নিজের হাতে তুলে নিলেন। আমি হাত জোড় করে বললুম : অনেক ধন্যবাদ। ঠাণ্ডা জিনিস আমি খাই নে।

আমার উত্তর শুনে ইভা খুশী হল, বলল : আমি আপনার জন্যে কফি তৈরি করে আনছি।

বলে উঠে গেল।

এদের এই ঘরে বসে আমাদের অনেক গল্প হল। দেশের অর্থনৈতিক কথা, খাসিদের অবস্থার কথা, দুঃখ দুর্দশা দারিদ্র্যের কথাও। এরই মধ্যে কমলাকান্তবাবু দুটো গ্লাস শেষ করলেন, আমিও এক পেয়ালা কফি খেলুম। জাস্তিনার মা কমলাকান্তবাবুর জন্যে আরও এক গ্লাস আনলেন। সে গ্লাসটি শেষ করে কমলাকান্তবাবু উঠলেন, বললেন : আবার আসব, আপনাদের কথা আমার খুব ভাল লাগল।

জাস্তিনার মা ইংরেজী ভাল বোঝেন না। জাস্তিনা তাঁকে সব বুঝিয়ে দিল।

ইভা আর জাস্তিনা আমাদের অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গেল, আর কমলাকান্তবাবু এদিকের পথঘাট ভাল করে চিনে নিলেন।

১৬

পরদিন বিকালবেলায় আমি যখন অফিস থেকে ফিরছি, কমলাকান্তবাবু তখন সেজেগুজে বাহির হচ্ছিলেন। আমাকে তিনি ঠিক আশা করেন নি, তাই প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন: বেরবেন নাকি?

আমি বললুম: কোথায়?

এই একটু বেড়াতে। সারাদিন বসে আছি, তাই ভাবছিলাম—

আমি বললুম: আপনি একাই যান।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন: সেই ভাল। আপনি খেটেখুটে ফিরলেন, এখন একটু বিশ্রাম করুন।

বলে তৎপর ভাবে বেরিয়ে গেলেন।

এ সময়টা সত্যিই আমার কোন কাজ নেই। আর আবহাওয়া এখন এমন ভাল যে শরীরে ক্লান্তি একটুও ছিল না। আমিও স্বচ্ছন্দে তাঁর সঙ্গে বেরতে পারতুম। কিন্তু তাঁর হাবভাব দেখেই আমি পিছিয়ে এলুম। আজ যে তাঁর সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল না, আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় বদলে আমি বই নিয়ে বসলুম।

আজও কোনখান থেকে আমার কোন চিঠিপত্র আসে নি। আমি মামা মামীর খবরের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম। কেন হয়েছিলুম জানি না, এ রকম আমার আগে কখনও হয় নি। একা বিদেশে আছি বলেই বোধহয় তাঁদের কথা এমন করে মনে পড়ছে। এখনও তাঁরা কাশ্মীরে আছেন, না দিল্লীতে ফিরে এসেছেন জানি না। বোধহয় ফিরে এসেছেন, কাশ্মীরে এখন নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।

স্বাতির এই একটা দোষ। চিঠিপত্র লিখতে তার ভারি আলস্য। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে সময় কাটাবে, আবার দরকার হলে সারাদিন

ছুটোছুটি করে মরবে। কিন্তু স্থির হয়ে বসে একখানা চিঠি লিখবে না। লেখাপড়া শেষ করল কী করে, সেই কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হই। এখনও শুনি বই পড়েই বেশি সময় কাটায়। তবে দু কলম লিখতে যে কী হয় তা আমি বুঝি না।

লজ্জা! লজ্জা কিসের! আমি তো তাকে লজ্জা পাবার মতো কিছু ইনিয়ে বিনিয়ে লিখতে বলি না। কেমন আছে, সময় কাটছে কী করে, আর নতুন খবর যদি কিছু থাকে, এই কথা। এতে লজ্জার কী আছে! এবারে চাকরি করবে বলছিল, সেই চাকরির কী হল, তাও তো জানাতে পারে। তা জানাবে না, আমার সম্বন্ধেও কিছু জানতে চাইবে না। আমার সম্বন্ধে কোন আগ্রহই যেন নেই, এমনি ভাব।

গৌহাটি থেকে আসামের ইতিহাসের একখানা মোটা বই সঙ্গে এনেছিলুম। সেইখানাই খুলে বসেছিলুম, কিন্তু মন সেদিকে গেল না। নেড়েচেড়ে দেখেছি যে আসামের ইতিহাস মানেই কোচ আর আহোমদের ইতিহাস। কামাখ্যার মন্দির দেখবার সময় কোচ রাজাদের সম্বন্ধে কিছু জেনেছি, আর আহোম রাজাদের কিছু কীর্তি আছে শিবসাগরে। তারপরেই তো ব্রহ্ম যুদ্ধ আর বৃটিশ অধিকারের কথা। দুটি নাম শুধু মনে পড়ছে। কুমার ভাস্কর বর্মা আর লচিত বরফুকন। ভাস্কর বর্মা ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক, হিউএন চাঙের লেখায় তাঁর সামান্য পরিচয় পেয়েছি। আর লচিত বরফুকন যুদ্ধ করেছিলেন মোগলদের সঙ্গে। যুদ্ধের সময় তিনি নিজের মামাকে অমনোযোগী দেখে তাঁর গলা কেটে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন, স্বদেশের চেয়ে মামা আমার বড় নয়। তাঁর এই কথা আজও সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

এই দুজন ছাড়া আর কোন বড় নাম আমি এখনও পাই নি। এই দুজনের সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার চেষ্টা করব ভেবেছিলাম।

কিন্তু এখন সে চেষ্টা করতে ইচ্ছা হল না। বই বন্ধ করে আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম।

অনেক দিন পরে আজ আমি নিজের কথা ভাবছি। আমার এই চাকরি যত খারাপ লাগবে ভেবেছিলুম, তত খারাপ লাগছে না। মাথার উপরে এখানে উপরওয়ালা নেই বলে আত্মসম্মান বজায় রেখে কাজ করা সম্ভব। আর মিথ্যে কথা নিজেকে বলতে হয় না, বলে অন্য লোকে, তারা সবাই আমাকে সম্মান করে।

মিস্টার বড়ুয়াকে আমি চিনতে পেরেছি মনে হয়। ভদ্রলোক নিজেকে চালাক ভাবেন জানি, আর এই রকম ভাবেন বলেই আমার কাছে ধরা পড়ে গেছেন। ইভাকে যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ কথা তিনি বোঝেন নি যে ইভা মেয়েটার প্রকৃতি খারাপ নয়। আমি নিজে এগিয়ে না গেলে সে কখনও এগিয়ে আসবে না। সে শুধু আদেশ পালন করছে।

আমার মনে হল যে ঐ মেয়েটাও বোধহয় আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছে। মোটরে পাশাপাশি বসে শিলঙে আসবার সময়েও যে জড়তা দেখেছি, কাল সন্ধ্যাবেলায় সে জড়তা আর দেখি নি। অনেকটা সহজ ভাবেই সে এসেছিল। আর একটু মেলামেশা করলেই আরও সহজ হয়ে যাবে। এমনিই হয়। মেয়েরা চট করে কোনও পুরুষকে প্রেমিক ভাবতে পারে না, তা ভাবতে হলেই আসে জড়তা। কিন্তু বন্ধু ভাবলেই সম্বন্ধ সহজ হয়ে যায়, ভাই ভাবলে আর কোন বাধাই থাকে না। কাল সন্ধ্যায় ইভার ব্যবহারে আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছি।

মনে হচ্ছিল, ইভা বোধহয় আজও আসবে জাস্তিনাকে নিয়ে। এলে ভালই হয়। ওদের সঙ্গে গল্প করে খানিকটা সময় কাটবে। আমি একবার দরজার দিকে তাকালুম। দরজার পাশে দেওয়ালে একখানা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। তারিখটা মিলিয়ে দেখলাম যে লাল

তারিখটা আসতে আর তুদিন বাকি আছে। পরশু শনিবার আধবেলা কাজ। তারপর এই শিলঙ শহরটা দেখবার জন্যে দেড় দিন ছুটি পাব।

নতুন শহর দেখবার লোভ আজও আমার যায় নি। ঘরে বসে থাকতে হলে মন আজও ছটফট করে। উদার উন্মুক্ত আকাশ এখনও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু আকাশের আলো অনেক আগেই নিবে গেছে। কাল সকালের আগে আর আলো ফুটবে না। কিন্তু তখন আর আমার সময় থাকবে না। তখন আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে অফিসে ছুটতে হবে।

সহসা আমার পর্দার নিচে একজোড়া পা দেখতে পেলুম। পুরুষের পা, বোধহয় বেয়ারা এসেছে। খোলা দরজায় টোকা দেবার আগেই আমি তাকে ভিতরে আসতে বললুম। বেয়ারাই এসেছিল, বলল, কালকের সেই মেয়েটি এসেছে।

ইভা তার পিছনেই ছিল, আমার অনুমতি পেয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

খুশী হয়ে আমি বললুম : এস ইভা, আজ আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম।

ইভা বুঝি লজ্জা পেল। বলল : কই, আজ আপনি বন্ধুর সঙ্গে বেরলেন না?

বললুম : কমলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে বুঝি?

ইভা বলল : তিনি তো আমাদের ওখানেই গেছেন।

আমি পরম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

ইভা বলল : আমি তাঁর কাছে জানলাম যে আপনি ক্লান্ত দেহে হোটেলে বসে আছেন। অফিসে আজ আপনার খুব পরিশ্রম গেছে।

আমি হেসে বললুম : এ কোন পরিশ্রমই নয়। আর এমন সুন্দর আবহাওয়ায় আমাদের ক্লান্তি আসে না।

তবে!

বললুম : থাক সে কথা। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো চল, আমরাও একটু বেড়িয়ে আসি।

আমি আমার খদ্দরের পাঞ্জাবির উপরে গরম তুসখানা জড়িয়ে নিলুম। এই উষ্ণ স্পর্শে আমার মামার কথা মনে পড়ে গেল। এই তো কয়েক মাস আগে তিনি সিমলায় আমাকে এখানা কিনে দিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে যখন আমি হিমাচল ভ্রমণে বার হয়েছিলুম, তখন আমার গরম কাপড় সঙ্গে ছিল না। আমি তাঁর কাছে কিছু নিতে চাই নি বলে তিনি আমার উপরে অভিমান করেছিলেন। এই তুসখানা গায়ে দিয়ে তাঁর স্নেহের মর্যাদা আমাকে দিতে হয়েছিল।

আমি বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। ইভা আমাকে জাগিয়ে দিল, বলল : আপনার বোধহয় ঠাণ্ডা লাগবে। রাতে আজকাল হিম পড়ছে।

সত্যি নাকি!

ইভা বলল : একটা গরম জামা গায়ে দিয়ে নিন।

চাওলার দেওয়া জওহর জ্যাকেটটার কথা আমার মনে পড়ল। সেটি আমার সঙ্গে আছে। ইভার কথায় আমি সেইটে বার করে পরে নিলুম। এও একটি স্নেহের উপহার। দিল্লী স্টেশনে চাওলা আমাদের সিমলার গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিল। একটি ছোট প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, রাখ, তোমার কাজে লাগবে।

স্বাতি আমার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে খুলে দেখেছিল। গরম পট্টুর জ্যাকেট, কিন্তু রঙ রেশমি কাপড়ের। সহসা স্বাতিকে খুব লজ্জিত দেখিয়েছিল। কিন্তু বলল না যে এ জিনিসের প্রয়োজনের কথাটা তার মনেই আগে আসা উচিত ছিল।

পথে নেমে ইভা বলল : মাঝে মাঝে আপনাকে বড় অন্যমনস্ক দেখায়। বাড়ির কথা মনে পড়ে বুঝি?

বললুম : বাড়ি আমার নেই।

ইভার মনে বোধহয় অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে এসেছিল। তাই

কোন প্রশ্নই করতে পারল না। নিঃশব্দে শুধু আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম: সত্যিই আমার ঘরবাড়ি নেই, আত্মীয় কুটুম্বও নেই একজন।

বলে আমি ইভার মুখের দিকে তাকালুম। সেও তাকাল আমার মুখের দিকে। হাসি নয়, বিষাদ নয়, একটা থমথমে গভীরতা দেখলুম তার মুখে। সেও বুঝি আমার মতো অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর আমি বললুম: তোমাকেও এখন বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

ইভা চমকে উঠল, তারপর বলল: আপনি খুব একা।

এই একা থাকার বেদনা সবাই বোঝে না। যারা বোঝে, তাদের হৃদয়েও এই বেদনা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইভাও কি আমারই মতো একা! বললুম: একা মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে।

তা আছে। আমিও একা, কিন্তু আপনার মতো এমন নিঃসঙ্গ নই। ভেবেছিলুম এই প্রসঙ্গে আমি তার জীবনের কথা কিছু জানতে চাইব। কিন্তু ইভা আমাকে সে সুযোগ দিল না। বলল: প্রথম থেকেই আপনাকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে।

বললুম: সত্যি নাকি!

ইভা মাথা নাড়ল। তারপর বলল: কিছু প্রশ্ন করবার সাহস আমি পাই নি।

কেন?

ইভা বিষণ্ণ হাসি হাসল, বলল: সে অধিকার তো আমাদের নেই।

সত্য কথা। আমিও তো ইভাকে তার জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। বাধা সভ্যতার, বাধা সৌজন্যের, দুর্বলতারও বাধা আছে। পরিচয় অন্তরঙ্গ করতে আমরা ভয় পাই। যাকে ভাল লাগে, তাকেই ঠেলে রাখতে হয় দূরে।

আলোকিত প্রশস্ত পথের উপর দিয়ে আমরা চলেছিলুম পাশাপাশি। আসামে এসে যে একজন মেয়ের সঙ্গে এমন করে পথ চলব, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। ইভা বোধহয় খানিকটা সহজ হতে চাইছিল, তাই বলল: পরশু আমাদের আধবেলা কাজ। বিকেলে আমরা শহর দেখার সুযোগ পাব। এই শহরটি আপনার ভাল লাগবে, এ রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর শহর।

বললুম: মাঠঘাট গ্রামও আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে সাধারণ মানুষ। তবে শিলঙ আমার আর একটি কারণে বেশি ভাল লাগবে। রবীন্দ্রনাথ শিলঙের কথা লিখেছেন 'শেষের কবিতা'য়। চোখ বুজলে তার স্ফটিকজলের ঝর্ণা আমার চোখের সামনে ভাসে।

ইভা অভিভূত ভাবে বলল: টেগোর শিলঙের কথা লিখেছেন!

বললুম: ভ্রমণ-কাহিনী নয়, উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর নায়ক নায়িকার দেখা হয়েছিল এইখানে।

ইভা বলল: গল্পটা আপনার কাছে একদিন শুনব।

বলব।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে আমরা হাঁটলুম কিছুক্ষণ, তারপর বললুম: চল, তোমাকে এবারে পৌঁছে দিয়ে আসি।

লজ্জিত ভাবে ইভা বলল: না না, তার কোন দরকার নেই। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি একাই ফিরে যাব।

হেসে বললুম: সেটা ভদ্রতা নয়। তোমার প্রাপ্য সম্মান আমাকে দিতেই হবে।

বিহ্বল চোখে ইভা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি হেসে বললুম: চল।

ইভা আর আপত্তি করল না।

জাস্তিনার বাড়ির কাছাকাছি এসে আমি থমকে দাঁড়ালুম। দূর থেকে তার বাড়ি দেখতে পেয়েছিলুম, দেখতে পাচ্ছিলুম আরও কিছু।

কিন্তু ইভাকে সে কথা জানতে দেবার ইচ্ছা ছিল না। তাই বললুম : তোমাদের বাড়ি তো পেঁ ৗছে গেছি, এবারে এখান থেকেই ফিরি।

ইভা আমাকে দু হাত জুড়ে নমস্কার করল। আমিও তাকে নমস্কার করলুম, বললুম : আবার দেখা হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে।

বলে ইভা পথের উপরেই দাঁড়িয়ে রইল। আর আমি পিছন ফিরে হনহন করে হাঁটতে লাগলুম। কালকের সেই মাতাল মানুষটা, আজ যাঁকে ঠেলেঠুলে বার করে দিল, তিনি যেন কিছুতেই আমাকে ধরতে না পারেন। আমিই যেন লজ্জা পেয়েছি, আমাকেই এখন মুখ লুকোতে হবে।

১৭

ইভাকে পৌঁছে ফিরে আসবার পথে আমার মনে এক রকমের অনুশোচনা দেখা দিল। মনে হল, এই মেয়েটার সঙ্গে আমি যেন অকারণে জড়িয়ে পড়ছি। এখানে আমি চাকরি করতে এসেছি, অর্থ উপার্জনই আমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর যদি কিছু করার অবসর থাকে তো সে পড়াশুনো। এই নতুন রাজ্যের খবর কিছু জেনে যেতে পারলেই যথেষ্ট। তার জন্যে ইভার দরকার নেই, দরকার নেই জাস্তিনার। এদের প্রশ্রয় দিলে আমাকে হয়তো মিস্টার বড়ুয়ার ফাঁদে পা দিতে হবে। কিন্তু—

হ্যাঁ, একটা কিন্তু আছে। ইভাকে আমি ফাঁদ ভাবতে পারছিনে। আমার আগে যিনি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারও কাছে বিশেষ কিছু শুনি নি তাঁর কথা। শুধু এইটুকু জেনেছি যে ইভার সঙ্গে তাঁর একটা যোগাযোগ ঘটেছিল, এবং তার পরিণতি ভাল হয় নি। এই পরিণতির জন্য কি ভদ্রলোক নিজেই দায়ী নন! ইভাকে তার জন্য কেন দায়ী করা হবে!

কিন্তু আমার যে সতর্ক থাকবার প্রয়োজন হয়েছে, আমি তা বুঝতে পারছিলুম। কাল এ কথা আমার মনে হয় নি, মনে হচ্ছে আজ, আজ ইভা তার সংবেদনশীল মনের পরিচয় দিয়ে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। তাকে কি আমি গৌহাটি ফিরে যেতে বলব! না, আমার কাছে আসতে বারণ করে দেব!

পথ চলতে চলতেই মনে হল যে এ দুটোর কোনটাই ভাল হবে না। নিজের সংযম না থাকলেই লোকে অন্যকে সংযত হতে বলে। আমারই সংযত হওয়া উচিত। আমার আচরণেই যেন ইভা বুঝতে পারে যে আমি তার সঙ্গলাভে উৎসুক নই।

হোটেলে পৌঁছে আমি ইতিহাসের বই খুলে বসলুম। সবচেয়ে নিরাপদ জিনিস হল বই। নেশা আছে, কিন্তু নেশায় ডুবে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না। বইএর চেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী দুনিয়ায় আর নেই। জ্ঞান দেবে, আনন্দ দেবে, কিন্তু দুঃখ কোন দিন দেবে না। এই বই নিয়েই আমার জীবন এত দিন আনন্দে কেটেছে।

আসামের পৌরাণিক কথা আমার মোটামুটি জানা আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক কথা কিছুই জানি না। এই বইখানা ই. এ. গেইট সাহেবের লেখা 'দি হিস্ট্রি অব আসাম'। ডক্টর চিরিকিকুমার বড়ুয়া লিখেছেন 'আর্লি জিওগ্রাফি অব আসাম'। গৌহাটিতে থাকতে সে বইখানির পাতা উলটে আমি দেখে এসেছি। এলোমেলো ভাবে আরও কিছু বই দেখেছিলুম। মনে পড়ছে যে কামরূপ সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া গেছে হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে। তাতে আমরা কামরূপকে সমুদ্রগুপ্তের করদ মিত্র রাজ্য রূপে দেখি। আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে পুষ্য বর্মা এই রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন, তিনি নরকের বংশধর বলে পরিচিত। এই বংশের আরও বারোজন রাজা পরবর্তী তিনশো বছর কামরূপে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা ভাস্কর বর্মাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে আজও স্বীকৃত।

বুরঞ্জি সাহিত্যে এ সব কথা আছে কিনা জানি না। শঙ্করদেবের পরবর্তী যুগে আসাম বুরঞ্জি কামরূপ বুরঞ্জি অসম বুরঞ্জি প্রভৃতি নামে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বুরঞ্জিকাররা অনেক যত্নে ও নিষ্ঠায় দেশের ইতিহাস রচনা করেছেন। বয়সে প্রাচীন না হলেও প্রাচীনকালের অনেক কথা আছে। কাজেই ইতিহাস বলে স্বীকার করবার আগে যাচাই করে দেখবারও অবকাশ আছে।

ডক্টর গ্রিয়ার্সন বলেছেন যে অসমিয়ারা তাদের জাতীয় সাহিত্য নিয়ে যথার্থই গর্ব বোধ করতে পারে। যে বিষয়ে ভারতবর্ষ বিস্ময়কর ভাবে পিছনে আছে, আসাম সেই বিষয়েই এগিয়েছে অনেকখানি। বুরঞ্জির ঐতিহাসিক অবদান অগাধ ও অসংখ্য।

আমি শুনেছিলুম যে সূর্যকুমার ভূঞা আসামের বুরঞ্জি সাহিত্য সংগ্রহ করে এক মূল্যবান কাজ করেছেন। আসাম বুরঞ্জিতে ১২২৮ থেকে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অহমরাজাদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অসম বুরঞ্জিতে অহমরাজাদের সমগ্র ইতিহাস পাওয়া যায়। কামরূপ বুরঞ্জি বা পাদশাহ বুরঞ্জিতে আমরা মুঘল যুদ্ধের কাহিনী ও মুসলমান আক্রমণের কথা পাই। এ ছাড়াও আছে আরও অসংখ্য বুরঞ্জি, যার কিছু প্রকাশিত হয়েছে, কিছু বোধহয় অপ্রকাশিত আছে।

এই রকমের এক প্রাচীন বুরঞ্জিতে পাওয়া যায় যে মহাভারতোক্ত ভগদত্তের পরে ধর্মপাল রত্নপাল কামপাল পৃথিপাল ও যুবাহু নামে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করেন, তারপর সেই বংশ লোপ হলে কামরূপ অরাজক হয় ও ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

দেবেশ্বর নামে যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন এদেশের লাকা-অব্দের আরম্ভের সময়ে। ইনি ধীবর বা কৈবর্ত জাতের শূদ্র রাজা ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। আর ইনিই বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রাজ্যের নাম কী ছিল, আর কোথায় ছিল তাঁর রাজধানী, তা জানা যায় না, কিন্তু কামাখ্যা মন্দিরের উদ্ধারে ও পূজার প্রচলনে তাঁর প্রয়াসের কথা লোকে আজও ভোলে নি।

এই রাজবংশ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, কোন বুরঞ্জিতে সে কথা আছে কিনা জানি না। তবে এর পরে যে ব্রহ্মপুত্রবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় তা জানা আছে। অথচ রাজাদের নাম-ধাম পাওয়া যায় না। এর কিছুদিন পরে আমরা ভাস্কর বর্মার নাম পাই। হিউএন চাঙ এঁকে ব্রাহ্মণ রাজা বলেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক অনুমানে ইনি ক্ষত্রিয় রাজা বলেই চিহ্নিত। ইনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হর্ষবর্ধনের সময় রাজত্ব করেছিলেন। গৌড়ের রাজা তখন শশাঙ্ক। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি গৌড় অধিকার করতে চেয়েছিলেন, এবং হর্ষবর্ধনের সহায়তায় কিছু দিন পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব

করবার সুযোগও পেয়েছিলেন। ভাস্কর বর্মা তাঁর রাজ্যে এক সুসংবদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর পরে কে বা কারা রাজা হয়েছিলেন, ইতিহাসে তার হদিস নেই।

দশকুমার চরিতে কামরূপে এক কলিঙ্গ বর্মার নাম পাওয়া যায়, তাঁকে ভাস্কর বর্মার বংশধর বলে মনে করা হয়। এই বংশের প্রাধান্য হ্রাস পাবার পর সামন্ত রাজারা চারিদিকে প্রবল হয়ে ওঠেন।

আসামের দরঙ্গ জেলায় প্রতাপগড় নামে একটি জায়গা আছে। প্রবাদ আছে যে নাগাক্ষ নামে এক রাজার রাজধানী ছিল এইখানে। নাগাক্ষ নাগশঙ্কর নামেও পরিচিত ছিলেন। এখন সেখানে নাগশঙ্কর নামে যে শিবের মন্দির আছে, তা এই রাজাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে তিনি করতোয়া নদীর পুত্র, ও পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। নাগাক্ষ বংশ এই দরঙ্গ জেলায় চারশো বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

এই রাজ্যেরই এক রানীর পুত্র আড়িমাও, ব্রহ্মপুত্র তার পিতা। আড় মাছের মতো আকৃতি বলে বালকের নাম হয়েছিল আড়িমাও। নাগাক্ষ বংশ ধ্বংস হবার আগেই তিনি প্রতাপগড়ের কিছু অংশ কাছাড় জয়ন্তী ও গৌহাটি থেকে নওগাঁ পর্যন্ত অধিকার করে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এঁর পুত্র জোঙ্গালবলহু নওগাঁর শহরী পরগনায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কাছাড়ের রাজার সঙ্গে জোঙ্গালবলহুর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। একবার কাছাড়রাজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জোঙ্গাল-বলহুর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু এই রাজকন্যা চক্রান্ত করে তাঁর স্বামীকে সমুচিত শিক্ষা দেন। পিতার মঙ্গলের জন্য ষড়যন্ত্র করে তিনি যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন; কপিলী নামে এক নদীর তীরে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হয়ে রাজা জোঙ্গালবলহু নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রাণ তাঁর

রক্ষা পায় নি। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। জোঙ্গালবলহুর সমগ্র রাজ্য কাছাড়ীরা দখল করে নিয়েছিল।

এই বংশেরই কোন সন্তান কামরূপের ডিমরুয়ায় এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের কেউ নাকি আড় মাছ খান না, আড়িমাও তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন কিনা।

এই সময়ে ছুটিয়া নামে একটি শক্তিশালী অসভ্য জাতির কথা শোনা যায়। কেউ বলেন যে এদের রাজা ছিলেন মহাদেবের ভাণ্ডারী কুবেরের পুত্র। আবার এক আধুনিক বুরঞ্জিকার বলেছেন যে ব্রহ্মপুত্র বংশের শেষ দিকের এক রাজার ভাণ্ডারী ছুটিয়াদের বশীভূত করে আসামের উত্তরাংশে একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আহোমরা এসে তাদের তাড়িয়ে দেয়। তারা তখন দরঙ্গ জেলায় এসে নূতন রাজ্য গঠন করে এবং অনেক দিন রাজত্ব করে।

কামরূপ জেলার দক্ষিণে জিতারি নামে একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি গৌহাটি থেকে রাজধানী ভাটিতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী ছিলেন এবং পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসেছিলেন এদেশে। এঁর পরে আমরা জল্লেশ্বর নামে এক রাজার নাম পাই। তিনি এক মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আজও সগৌরবে বেঁচে আছেন। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ির নিকটে জল্লেশ্বর নামে যে শিবের মন্দির আছে, তিনি তা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রাজধানীও নাকি সেইখানেই ছিল। আর কামরূপের অন্তর্গত এই স্থানকে বলা হত বড়ছেড়ী দেশ। এই জিতারির বংশে আরও অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁরা প্রত্যেকে একশো পাঁচ বছর করে রাজত্ব করেছেন বলে প্রকাশ।

পৃথু নামে একজন রাজার সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই গল্পটি ইনি রাজা হবার আগের কথা। এই দেশে তখন কীচক নামে এক অসভ্য জাতির অসহ্য উৎপাত ছিল। রাজা তাদের দমন করতে পারছেন না। মনের দুঃখে পৃথু এক

পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জল থেকে তিনি যখন উঠলেন, তাঁর সঙ্গে উঠল অনেক সুসজ্জিত সৈন্য। এদের সাহায্যে পৃথু কীচকদের দমন করে নগর অধিকার করে রাজা হয়ে বসলেন। এখন এই কীচকরা নাকি উত্তর-ভারতে আছে, তারা বনে পশু পালন করে, আর ভাগ্য গণনাও অনেকের বৃত্তি। এই পৃথুর নিজের ও বংশধরদের কিছু কীর্তি রঙ্গপুর অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

আসামের এক বুরঞ্জিতে সতের জন বৌদ্ধ রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। জয়ন্ত চক্রপাল, ভূমিপাল প্রভৃতি এই পাল রাজারাও একশো পাঁচ বছর করে নাকি রাজত্ব করেন। অন্য বুরঞ্জিতে এই নামগুলি অন্য রকম। আর এক জায়গায় দেখা যায় যে রাজারা পঞ্চাশ বছর করে রাজত্ব করেছেন, কিন্তু তাঁদের নাম মিনাঙ্ক রাজা গজাঙ্ক রাজা শৃকবাঙ্ক রাজা মৃগাঙ্ক রাজা। এঁরা রাজত্ব করেছিলেন কামরূপের লৌহিত্যপুরে। কিঙ্গুয়া নামে এক রাজার আমলে মসলন্দ গাজি নামে একজন মুসলমান নবাব লৌহিত্যপুর জয় করেন। এই নবাব মাত্র পঁচিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই লৌহিত্যপুরের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য পণ্ডিতরা চিন্তা করেছেন। জানা গেছে যে কামরূপ জেলার বৈদর গড়ে যে দুর্গ আছে তা রাজা কিঙ্গুয়া নির্মাণ করেছেন বলে প্রবাদ। এর থেকেই অনুমান করা হয় যে একদা বৈদর গড়ই লৌহিত্যপুর নামে পরিচিত ছিল।

বুরঞ্জিতে এক ধর্মপাল আছেন, ইতিহাসেও তাঁকে আমরা দেখতে পাই। ভাস্কর বর্মার মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পরে শালস্তম্ভ নামে এক ম্লেচ্ছ কামরূপের রাজা হয়েছিলেন। তাঁরপর শালস্ত বা প্রালম্ভ রাজবংশ দুশো বছর রাজত্ব করেন। প্রালম্ভ বা তাঁর পুত্র হর্জর-গৌড়েশ্বর দেবপালের অধীনতা স্বীকার করতেন। দেবপালের কাল নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ, তাই এই প্রালম্ভ বংশ নবম ও দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন বলে মেনে নেওয়া হয়। এঁরা শৈব ছিলেন এবং এঁদের রাজধানী হরূপেশ্বর ছিল লৌহিত্য বা বর্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে।

ধর্মপাল আরও পরের রাজা। শালস্ত বংশের শেষ রাজা ছিলেন ত্যাগসিংহ। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাঁরই এক জ্ঞাতি ব্রহ্মপাল রাজা হয়ে দুর্জয়ায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এই দুর্জয়া কোথায় ছিল, এ নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে বর্তমান গৌহাটিই ছিল প্রাচীন দুর্জয়া। ব্রহ্মপালের বংশেরই শেষ রাজা ধর্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন। গৌড়ের রামপালের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। পরাজিত হয়ে তিনি গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। গৌড়ের কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব পরে কামরূপ জয় করে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

বুরঞ্জিতে আমরা যে সব কাহিনী পাই তা কিছু অন্য রকম। সে সব পড়ে অনেকে অনেক রকম অনুমান করেন। কেউ মনে করেন যে গৌড়ের পাল রাজাদের সঙ্গে ধর্মপালের কোন সম্পর্ক ছিল, কিংবা তিনি গৌড়েরই কোন রাজা। আবার অনেকে বলেন যে আসামের পূর্বপ্রান্তে ছুটিয়া নামে যে পরাক্রান্ত জাতি রাজত্ব করত তাদের রাজাদেরও উপাধি পাল ছিল। কাজেই ধর্মপাল একজন ছুটিয়া রাজাও হতে পারেন। এঁর সম্বন্ধে কিছু কথা জানা গেছে তাম্রলিপিতে। ১০৯৭ শকে ইনি রাজত্ব করতেন, আর গৌহাটির নিকটে শোয়ালকুছি গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর জমিদান করেছেন। তাঁর রানীর নাম বনমালা। আর শ্যালিকার নাম ময়নাবতী। ময়নাবতীর পরাক্রমের কথা রঙ্গপুরের পল্লীগীতিতে শোনা যায়। ময়নাবতীর কথায় শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যের কথা এসে পড়ে।

গৌড়েশ্বর ধর্মপালের পুত্রকে নিয়ে ঘনারাম এই কাব্য রচনা করেন। এতে আমরা দেখতে পাই যে ধর্মপালের পুত্রের রাজত্বকালে কামরূপের রাজা ছিলেন কর্পূরধল, আর তিনি নিজেকে স্বাধীন ভাবতেন। একথা জানতে পেরে গৌড়েশ্বর তাঁকে দমন করবার জন্য মন্ত্রী মহামদকে পাঠালেন পাঁচ লক্ষ সেনার অধিনায়ক করে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে পেঁাছে মন্ত্রী দেখলেন যে মহাবিপদ। নদী হঠাৎ

কূলে কূলে প্লাবিত হয়ে গেছে, নদী পার হয়ে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করা একেবারে অসম্ভব। কিছুদিন অপেক্ষা করে মন্ত্রী মহামদ ফিরে এলেন।

এই মন্ত্রী খুব অত্যাচারী ছিলেন। ক্রমে তাঁর অত্যাচারে গৌড়ের প্রজাদের দুর্দশার আর সীমা রইল না। রাজা সব বুঝতে পেরে মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন। আর মন্ত্রী গোপনে রাজসিংহাসন টলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করলেন। কামরূপের রাজাকে লিখলেন গৌড় আক্রমণ করবার জন্যে। কামরূপের রাজা কর্পূরধল ভাবলেন, এই সুযোগ। পদচ্যুত মন্ত্রীর সাহায্যেই গৌড় অধিকার করা যাবে ভেবে সৈন্য-সামন্ত তৈরি করতে লাগলেন। কামরূপে সাজ-সাজ রব উঠল। আর এই খবর গিয়ে পৌঁছল গৌড়েশ্বরের কানে। তিনি দেখলেন বিপদ। কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে পুরনো মন্ত্রীকে ডেকে গদিতে বসালেন। মহামদ গদিতে বসেই ময়নাগড়ের রাজা লাউসেনকে পাঠিয়ে দিলেন কামরূপ আক্রমণ করতে। লাউসেনের পিতা কর্ণসেন রায় ছিলেন গৌড়েশ্বরের ভায়রাভাই। লাউসেন বীর-বিক্রমে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে কামরূপ আক্রমণ করলেন ও রাজা কর্পূরধলকে যুদ্ধে পরাজিত করলেন।

এই ধর্মপালের মানিকচন্দ্র নামে এক ভাই ছিল। তাঁর স্ত্রীর নাম ময়নাবতী। ময়নাবতী খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর শিশু-পুত্রের নাম ছিল গোপীচন্দ্র। ময়নাবতীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে এই শিশুকে বসাবেন গৌড়ের সিংহাসনে। সেই ভাবেই তিনি ছেলেকে মানুষ করলেন এবং পরে ষড়যন্ত্র করে ধর্মপালের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। যুদ্ধ হয়েছিল তিস্তার তীরে। গোপীচন্দ্র তখনও নাবালক, ময়নাবতীই সম্ভবত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে ধর্মপাল পালিয়ে গেলেন। আর ময়নাবতী তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

ছেলে বড় হলে হরিশ্চন্দ্র রাজার দুই কন্যা অদুনা ও পদুনার সঙ্গে

তার বিয়ে দিলেন ময়নাবতী। এই বিবাহে গোপীচন্দ্র একশো জন দাসী যৌতুক পেলেন। তরুণ রাজা তাদের নিয়ে বিলাসে ডুবে রইলেন, আর রাজ্যশাসনের ক্ষমতা রইল মায়ের হাতেই।

কিছুদিন পরে যা হবার তাই হল। ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মাল রাজার, তিনি বললেন, এবারে আমি রাজকার্য দেখব। কিন্তু ময়নাবতী তা দেবেন কেন! তিনি হরিপ বা হাড়ীসিদ্ধ নামে একজন যোগীকে একটা বিহিত করবার ভার দিলেন। হরিপ রাজা গোপীচন্দ্রকে এমন উপদেশ দিলেন যে রাজার বিষয়-বাসনা তো গেলই, তিনি সংসার ত্যাগ করে বনে গেলেন বাণপ্রস্থে।

এই পর্যন্ত শুনে মনে হবে যে গোপীচন্দ্র ছিলেন গৌড়ের রাজা। কিন্তু তাঁকে কামরূপের রাজা বলে সন্দেহ করা হয় অন্য কারণে। কামরূপের যুগী-সম্প্রদায় আজও এক 'শিবের গীত' গায় দুদিন ধরে। সে এই গোপীচন্দ্রের কাহিনী, রাজার বৈরাগ্য ও রানীদের খেদ স্থানীয় ভাষায় সরল গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জন করে।

তার পরের কথা হল হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী। গোপীচন্দ্রের পুত্রের নামই ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্র, আর গবচন্দ্র তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। বাঙলাদেশে এঁদের কাহিনী বিখ্যাত হয়ে আছে। এমন নির্বোধ রাজা ও মন্ত্রীর উদাহরণ ইতিহাসে আর নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিয়ে কবিতা লিখলেন 'হিং টিং ছট্'।—

স্বপ্ন দেখেছেন রাতে হবুচন্দ্র ভূপ।
অর্থ তার ভেবে ভেবে গবুচন্দ্র চুপ।

এই রাজাই নিয়ম করেছিলেন যে তাঁর প্রজারা দিনে ঘুমবে ও রাতে কাজকর্ম করবে। কিন্তু বেশ চলেছিল তাঁর রাজত্ব। তাঁর কোন শত্রু ছিল না, কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয় নি তাঁর আমলে। তাঁর প্রজারা নির্ভয়ে বসবাস করেছে, আর ধনধান্যে সমৃদ্ধিশালী হয়েছে তাঁর রাজ্য।

তাঁর পরে আর একজন এই বংশে রাজা হয়েছিলেন। তাঁরই সময় কামতাপুরের নীলধ্বজ গ্রাস করেছিলেন কামরূপের সিংহাসন।

১৮

আসামের বুরঞ্জি আর ইতিহাসে মিলে একটা কঠিন জট পাকিয়ে গেছে। পশ্চিম দিক থেকে এসেছে কামতাপুর ও কোচবিহারের রাজারা, আহোমরা এসেছে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। আসামের উপরে এদের আধিপত্য ছিল অনেক দিন। রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি এ নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি।

মাঝখানে একটু গোলমাল শুনেছিলুম। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলুম যে কমলাকান্তবাবু একটু বেসামাল অবস্থায় ফিরেছেন। তাঁকে খাইয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমিও আর দেরি না করে খেয়ে নিয়েছিলুম।

কিন্তু চট করে আমার ঘুম আসে নি। অনেক পুরনো কথা আমার মনে আসছিল। শিলঙের এই অভিজাত হোটেলের সুন্দর সাজানো ঘরখানিতে শুয়ে আমার উত্তরপাড়ার সেই ভাঙ্গা ঘরখানির কথা মনে পড়ল। অনেক দারিদ্র্য ও দুঃখের সঙ্গে সেই ঘরখানির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অনেক আনন্দও অনেক দিন মনকে দোলা দিয়েছে। কত পড়েছি, কত লিখেছি, বড় হবার কত স্বপ্ন দেখেছি ঐ ঘরে। সে কি আজকের মতো বড় হবার স্বপ্ন! পয়সা প্রতিপত্তির লোভ তো আমার কোনকালে ছিল না। তাহলে তো দু বছর আগেই জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হয়ে টাকার উপরে আজ গড়াগড়ি দিতে পারতুম।

তবে কোন্ মরীচিকা আমার জীবনকে হাতছানি দিচ্ছে জানি না। জীবনটা পালটে গেছে রাতারাতি। উত্তরপাড়া থেকে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন আর ধরতে হবে না, ট্রামে বাসে বাদুড়ের মতো ঝুলতে ঝুলতে আর ডালহৌসি স্কোয়ারে আসতে হবে না। সারি সারি টেবিলের ভিতর আমার কাঠের চেয়ারখানি কিছু দিন ফাঁকা পড়ে

থাকবে, তারপরেই আসবে নতুন কোন লোক। বাঙলাদেশে শিক্ষিত বেকারের অভাব কোন দিন হবে না, একটি পদের জন্যে এত লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে একজনকে বেছে নিতেই কয়েক দিন সময় লাগবে। তারপর ওরা আমার কথা ভুলেই যাবে।

চাকরিটা আমি ছেড়ে চলে এলুম, কিন্তু ভাড়াটে ঘরখানা ছেড়ে দিতে পারলুম না। মনে হয়েছিল যে প্রয়োজন হলে কলকাতায় অমন নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর একটা খুঁজে পাব না। আজকের এই আশ্রয় আমার নিরাপদ নয়, এর মধ্যে কৃত্রিমতা আছে। রাজ-প্রাসাদের জীবনে বিলাস আছে, কিন্তু কোন উপলব্ধি নেই। জীবনের পরম সত্যের উপলব্ধি আছে হিমালয়ের নির্জন গুহায়। ভোগের জগৎকে যত সঙ্কুচিত করা যায়, উপলব্ধির জগৎ তত বিস্তৃত হয়। উত্তরপাড়ার ছোট ঘরখানি ছেড়ে দিয়ে আমি বড় হবার কথা ভাবি নি।

কাল শনিবার আমাদের আধবেলা অফিস। অফিসের পরে ইভা আসবে, অফিসের গাড়ি নিয়ে মিস্টার মর্গানও হয়তো আসবেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি কোথাও বেরতে চান না। হয়তো তার কোন কারণ আছে। সেই কারণ জানবার কৌতূহল আমার নেই। মিস্টার মর্গানও সে কথা এড়িয়ে গেছেন। আমার তাই মনে হচ্ছে যে তিনি কাল দুপুরে আসবেন। কিংবা রবিবার সারাদিন কাটাবেন আমার সঙ্গে। ইভাকেও যে তিনি টেনে আনবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই।

ইভা এখানে কী কাজ করছে, সেকথা আমি জানতে চাই নি। মিস্টার মর্গান হয়তো ফার্মের কাজের কথা বলবেন। কিন্তু ইভা মিথ্যা কথা বলবে না। সে হয়তো আমার কথাই বলবে, মিস্টার বড়ুয়া তাকে আমার জন্যেই পাঠিয়েছেন। আমি যে ইভাকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, সে কথা তিনি পরে জানতে পারবেন।

পরদিন সকালে অফিসে যাবার আগে আবার আমি খানিকক্ষণ

ইতিহাসের বই নিয়ে বসেছিলুম। ধর্মপাল নিয়ে আরও কিছু বিতর্ক আছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে ধর্মপাল ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু মার্টিন সাহেব তাঁকে বৌদ্ধ মনে করেন। পালবংশের আদি রাজা গোপাল ছিলেন বৌদ্ধ, ধর্মপাল তাঁর পুত্র। আইন ই আকবরীতে এই গোপাল ভূপাল নামে পরিচিত, দিনাজপুরের এক শিলালিপিতে তাঁর লোকপাল নাম দেখি। ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দুখানা তাম্রলিপিতে আমরা গোপাল নাম পাই। জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ধর্মপালকে বাঙলার রাজা বলে স্থির করেছেন। ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা ছিলেন। রঙ্গপুর জেলায় ধর্মপালের নগর ধর্মপুরের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। কিন্তু কামরূপের ধর্মপাল যে গৌড়েশ্বর রামপালের নিকট পরাজিত হন, তিনি বর্তমান ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

ধর্মপালের বংশ উচ্ছেদ হবার পর কামরূপ রাজ্য কিছু দিন অরাজক ছিল। সেই সময়ে চারিদিকের পরাক্রান্ত জাতিরা হানা দিয়ে দিয়ে কামরূপ বিধ্বস্ত করে ফেলে। এই সব জাতির মধ্যে ছিল কোচ মেচ ভোট ও কাছাড়ের পার্বত্য জাতি। তারপরে কামরূপ জয় করেন কামতাপুরের রাজা নীলধ্বজ। তাঁর পুত্র চক্রধ্বজ ভগদত্তের কবচ উদ্ধার করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বর যখন রাজা তখন বাঙলার নবাব হুসেন শাহ কামরূপ অধিকার করেন। বারো বৎসর ধরে তিনি কামরূপ অবরোধ করে ছিলেন। বুরঞ্জির মতে এই আক্রমণের তারিখ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, আর মার্টিন সাহেব এই তারিখ বলেছেন ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে হুসেন শাহ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হাবসি নবাবদের পরাজিত করে বাঙলার সিংহাসনে বসেন।

ইতিহাসের অনেক কথাই যখন আমরা জানি না, তখন এই দশ বছরের তফাতে কিছু আসে যায় না। এর পরে আমরা দুর্লভ-নারায়ণ নামে এক রাজার কথা পাই। গুরুজন-কথা চরিত্র নামে

অসমিয়া ভাষার একখানি কাব্যগ্রন্থে ইনি কামতাপুরের একজন পরাক্রান্ত রাজা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। গৌড়েশ্বর ধর্মনারায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর এক রাত্রে উভয়েই এক অলৌকিক স্বপ্ন দেখে মিত্রতা স্থাপন করেন। ধর্মনারায়ণ তাঁর দলের সাত জন ব্রাহ্মণ ও সাত জন কায়স্থকে রেখে গৌড়ে ফিরে যান। এঁদের মধ্যে প্রধান বারো জনকে রাজা দুর্লভনারায়ণ বারো ভূঞা উপাধি দিয়েছিলেন। শিরোমণি ভূঞা উপাধি দিয়েছিলেন চণ্ডীবর নামে সবচেয়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান একজন কায়স্থকে। চণ্ডীবর দেবীর পূজারী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে দেবীদাস বলত। চণ্ডীবরের পুত্রের নাম রাজধর, আসামের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের পিতামহ তিনি।

এর পর কামরূপ অধিকার করেন কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ। আধুনিক বুরঞ্জিমতে এই তারিখ ১৪৯৮ থেকে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে। কামাখ্যা মন্দিরের প্রসঙ্গে আমরা এই বিশ্বসিংহ ও তাঁর পুত্রদ্বয় নরনারায়ণ ও চিলারায়ের কথা পেয়েছি। এই শক্তিশালী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নরনারায়ণ। কোচবিহার রাজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল তাঁরই সময়ে। আবার তাঁরই জীবদ্দশায় এই রাজ্য দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম জীবনে নরনারায়ণের পুত্রসন্তান ছিল না। নিজের প্রিয় ভাই চিলারায়ের পুত্র রঘুদেবকে তিনি নিজের পুত্রের মতো লালন করেছিলেন। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পরে রঘুদেবকেই তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলেন। তারপরে তাঁর এক পুত্রের জন্ম হল, তার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। রঘুদেব দেখলেন যে তাঁর রাজা হবার আশা বিনষ্ট হল। তিনি বিদ্রোহী হলেন। পূর্বাঞ্চলে এসে কোচরাজ্যের শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদেরই সহায়তায় কোচবিহার আক্রমণের জন্য স্বর্ণকোষী নদীর তীরে এসে ছাউনি ফেললেন। নরনারায়ণও তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন। অশ্বারোহণে বীর নরনারায়ণকে দেখে রঘুদেব পালিয়ে গেলেন।

রঘুদেবকে পালাতে দেখে নরনারায়ণ খুশী হলেন না, আক্ষেপ করে বললেন, 'আমি তো ওকে জয় করতে আসি নি, আমি ওকে রাজা করতে এসেছিলাম। এই নদীই হোক তার রাজ্যের সীমানা। এর পূর্বের সমস্ত রাজ্য আমি রঘুদেবকে দিলাম।' আসামের বুরঞ্জিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

মুসলমানরা এই তুই রাজ্যের নাম দিয়েছিল কোচবিহার ও কোচ হাজো। সোনকোষ নদীর পূর্বে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের নাম হয়েছিল কোচ হাজো। অন্তর্ঘাতী বিবাদে এদের শক্তি নষ্ট হত। তার ফলে আহোম আর মুসলমানরা এসে মাঝেমাঝেই হানা দিত।

আহোম আর মুসলমানদের কথা আগে কিছুই বলা হয় নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মুসলমানরা হানা দিতে আরম্ভ করে। আসামের রাজা তখন কে ছিলেন জানা যায় না। গৌড়ের কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপ জয় করে কিছু দিন রাজত্ব করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেছেন চন্দ্রবংশের রাজারা। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী তিব্বত অভিযান করে দেশে ফিরবার পথে কামরূপে হানা দিয়েছিলেন। যুদ্ধে তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বাইশ বছর পরে ঘিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ কামরূপ আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারেন নি। আরও তিরিশ বছর পরে কামরূপ আক্রমণ করেছিলেন মুঘিন উদ্দীন ইউজবক। প্রথমে কিছু সফল হলেও পরে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল আর বন্দী হয়েছিল পরিবারবর্গ। মুসলমানরা তখন ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য চারিদিকে চেষ্টা করছিল, আর অনেকাংশে সফলও হচ্ছিল। আসামের মতো এমন শোচনীয় পরাজয় তাদের আর কোনখানে ঘটে নি। এই যুদ্ধে রাজা কে ছিলেন তা জানবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কোন হদিস পাই নি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আহোমরা আসামে প্রবেশ করেছিল। এরা শান জাতির একটি শাখা, সুকাফার নেতৃত্বে পাটকাই অঞ্চল পার হয়ে এদেশে আসে। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা চরাই-দেওতে প্রথম আধিপত্য স্থাপন করে। আসামে তখন কামতা-রাজ্যের প্রাধান্য। ক্ষমতা বিস্তারের জন্য আহোমরা কামতারাজ্যও আক্রমণ করে। যুদ্ধবিগ্রহ কিছু দিন চলেছিল, তারপর সন্ধি হয়। কামতারাজকন্যা রজনীর বিবাহ হয় আহোমরাজ সুখাংফার সঙ্গে।

বাঙলার সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। তিনি কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণাংশে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট আক্রমণ করে শ্রীহট্ট অধিকার করেন। এ ঘটনা বোধহয় চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে ঘটেছিল। তারপর ইলিয়াস শাহ এই অঞ্চল আক্রমণ করে কামরূপ পর্যন্ত অধিকার করেন। ঘিয়াস উদ্দীন আজম শাহও যে কামরূপে কর্তৃত্ব করেছিলেন তার প্রমাণ আছে।

কামতারাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন খেন উপজাতির নেতা নীলধ্বজ। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এঁরা সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময় কামতারাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছিল, পূর্ব পশ্চিমে কোচবিহার থেকে কামরূপ ও দক্ষিণ পূর্বে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট। কুচবিহারের নিকট কামতাপুরে ছিল তাঁর রাজধানী, সেই সমৃদ্ধিশালী নগরের চিহ্ন আজও আছে গোমানিমারীতে।

বাঙলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহকে নীলাম্বর পরাজিত করেন, কিন্তু নিজে পরাজিত হন হুসেন শাহের নিকট এবং সমগ্র কামতারাজ্য হুসেন শাহর পদানত হয়। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৪৯৮ থেকে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

কিন্তু বেশি দিন এ ভাবে কাটে নি। বারো বৎসরের মধ্যেই কোচ উপজাতির বিশ্বসিংহ এই অঞ্চলেই তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর রাজধানী হয় কুচবিহার।

অফিসের সময় হয়েছে বলে বই আমাকে বন্ধ করতে হল। আমার মনে হচ্ছিল যে আসামের ইতিহাস আমি ঠিক আয়ত্ত করতে পারছি না। সমস্ত জিনিসটা যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে যে কথা আমি জেনেছিলুম, তাই যেন অব্যক্ত রয়ে গেল। যে ভাস্কর বর্মার কথা আমি আসামের ইতিহাসে পড়লুম, তাঁর সঙ্গে হর্ষবর্ধনের মিত্রতা হয়েছিল অন্য কারণে। হর্ষবর্ধন নিজের স্বার্থে কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার সঙ্গে বন্ধুতা করেছিলেন। আর্যাবর্তে তখন বাঙলার শ্রেষ্ঠ রাজা শশাঙ্কের প্রতিপত্তি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি গঞ্জাম থেকে কান্যকুব্জ পর্যন্ত জয় করে আর্যাবর্তে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। কান্যকুব্জ জয়ের সময় মালবরাজ দেবগুপ্ত তাঁর সহায় ছিল। থানেশ্বরের সিংহাসনে তখন প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন। তিনি রাজা হয়েই শুনলেন যে কান্যকুব্জের রাজা নিহত হয়েছেন ও তাঁর রাণী রাজ্যশ্রী শশাঙ্কের হাতে বন্দিনী। এই রাজ্যশ্রী ছিলেন রাজ্যবর্ধনের ভগিনী। তিনি তখনই শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। মালবরাজ দেবগুপ্তকে তিনি পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু শশাঙ্কের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। এবারে থানেশ্বরের রাজা হলেন প্রভাকর বর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র ভারতবিখ্যাত হর্ষবর্ধন। শশাঙ্ককে যথোচিত শাস্তি দেবেন বলে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন। রাজ্যশ্রীকে শশাঙ্ক মুক্তি দিয়েছিলেন বলে নূতন যুদ্ধ হল না, কিন্তু এই পরাক্রান্ত শশাঙ্ককে দমন করবার জন্যেই হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার সঙ্গে বন্ধুতা করেছিলেন। শশাঙ্ক যত দিন জীবিত ছিলেন হর্ষবর্ধন তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেন নি।

কামরূপ জয় করেছিলেন কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য। কবি-কহ্লনের লেখা রাজতরঙ্গিণীতে এ কথা আছে, কিন্তু আসামের ইতিহাসে আমি ললিতাদিত্যের নাম দেখলুম না।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে যশোবর্মণ গৌড় অধিকার করেছিলেন,

তারপর ললিতাদিত্যও এ রাজ্য ভোগ করেছেন। এই পরাজয়ে বাঙলার গৌরব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক তুর্দশায় সামাজিক তুর্দশা দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে দেশের প্রজারা মিলিত হয়ে গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করেন। গোপাল যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময়েই দেশে শান্তি ফিরে আসে ও বাঙলাদেশ আবার একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। ধর্মপাল এই পাল-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। আর্যাবর্তে আবার তিনি এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কান্যকুব্জের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান। তারপর কান্যকুব্জে যে মহাসভা আহ্বান করেছিলেন তাতে যোগ দিতে এসেছিলেন ভোজ মৎস কুরু মদ্র যদু অবন্তী যবন গান্ধার ও কীর রাজ্যের রাজা। ধর্মপালকে তাঁরা সম্রাটের সম্মান দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র দেবপাল অধিকার করেছিলেন কামরূপ রাজ্য। এ বোধহয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর কথা। কিন্তু আসামের ইতিহাসে আমি এ কথাও দেখলুম না।

থাক ইতিহাসের কথা। এখন আমাকে অফিসে যেতে হবে। ওবেলায় শিলঙ দেখব। ইতিহাসের শুষ্ক কথায় যে বিরক্তি এসেছে, সুন্দর শিলঙ সেই বিরক্তি আমার মুহূর্তে মুছে নেবে। বইখানা তাকের উপরে তুলে রাখতেই মন আমার হালকা হয়ে গেল।

আমি ঠিকই বুঝেছিলুম যে শনি রবি তুটো দিনই আমার হৈ হৈ করে কাটবে। যতক্ষণ কাজ করছিলুম, মিস্টার মর্গান আমার সঙ্গে কাজ ছাড়া একটিও কথা বলেন নি। ছুটির পরে উঠে দাঁড়াতেই বললেন : এ কদিন আপনার অত্যাচার আমরা হাসি মুখে সহ্য করেছি, এবারে আমাদের অত্যাচার আপনাকে সইতে হবে।

আমি হেসে বললুম : আপনারা অত্যাচার করতে জানেন নাকি ?

মিস্টার মর্গান বললেন : একটু পরেই দেখতে পাবেন। আমরা আসছি আপনার হোটেলে, বেরবেন না কোথাও।

কোথাও পালাবার উপায় ছিল না। ইভা এসে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। আমাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই নমস্কার করে হাসল, বলল : আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : ব্যাপার কী বল তো ?

ইভাও আশ্চর্য হয়ে বলল : মিস্টার মর্গান আপনাকে কিছু বলেন নি ?

বললুম : না তো।

মুখহাত ধুয়ে আমি ডাইনিং রূমেই খেতে বসলুম। ইভা আমার সামনে বসল। বললুম : কী খাবে বল ?

ব্যস্ত ভাবে ইভা বলে উঠল : আমি যে খেয়ে এসেছি।

তবে শাস্তি পেতে হবে।

বলে বেয়ারাকে তার জন্যেও কিছু আনতে বললুম। ইভা তাকে নিজেদের ভাষায় কিছু বলে দিল। তারপরে আমাকে বলল : অফিসের গাড়ি নিয়ে মিস্টার মর্গান এখুনি এসে পড়বেন, তারপরে আমরা বেড়াতে বেরব।

কোথায় ?

সমস্ত শিলঙ শহরটা আজ দেখা হবে।

তারপর ?

কাল চেরাপুঞ্জিতে আমাদের পিকনিক। একখানা বাস ভাড়া করা হয়েছে।

এ সব কথা আমাকে তো কেউ বলে নি !

বলবে কে ! অফিসে আপনি এমন ব্যস্ত থাকেন যে সবাই ভয় পায় আপনাকে।

আমি কি বাঘ, না ভালুক !

ইভা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল : আপনার বন্ধুর খবর কী ?

তুমি কি কমলাকান্তবাবুর কথা বলছ ?

তিনিই তো আপনার সঙ্গে আমাদের ডেরায় গিয়েছিলেন !

বললুম : তাঁর কথা জানি নে।

ইভা প্রশ্ন করল : আপনার পুরনো বন্ধু বুঝি ?

হেসে বললুম : এই হোটেলেই প্রথম পরিচয়।

বড় একটা নিশ্বাস ফেলে ইভা বলল : বাঁচলাম।

কেন ?

আপনাকে কিছু বলেন নি বুঝি ! তাহলে আর বোধহয় বলবেন না।

এর বেশি ইভা আর কিছু বলল না। আমিও তাকে জোর করলুম না। বেয়ারা আমার খাবার আনল। ইভার জন্যে আনল শুধু কফি।

খেয়ে উঠতে না উঠতেই বাহিরে মোটরের হর্ণ শুনতে পেলুম। অফিসের গাড়ি নিয়ে মিস্টার মর্গান এসে উপস্থিত হয়েছেন। একাই এসেছেন। কাছে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : মিসেস মর্গান এলেন না ?

উত্তর দিল ইভা, বলল : উনি বিপত্নীক।

আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম।

মিস্টার মর্গান কিন্তু দুঃখ পেলেন না, বললেন : এ চমৎকার জীবন, কোনও গোলামি নেই, নেই ঝঞ্ঝাট ঝামেলা। স্বাধীনতার মতো কি সুখ আছে!

বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন। এই হাসি দিয়ে তিনি তাঁর বেদনা গোপন করলেন কিনা আমি তা বুঝতে পারলুম না।

ইভা আর আমাকে গাড়ির পিছনের সীটে তুলে দিয়ে মিস্টার মর্গান সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। নিজেদের ভাষায় ড্রাইভারকে বোধহয় শহর দেখাবার নির্দেশ দিলেন।

মোটরে চেপে পার্বত্য শহর দেখা এক রকমের শৌখিনতা। ভারতের পূর্ব প্রান্তে শিলঙে তার পরিচয় পেলুম। বৃটিশ আমলে সিমলা ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। সেখানে কার্ট রোডের উপরে মোটর চলাচল আছে। অন্য রাস্তায় তা অনুমতি সাপেক্ষ। দার্জিলিঙেও তাই। প্রধান রাজপথগুলিতে মোটর চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয় না। মসুরি ও নৈনিতালে শুধু শহরে পৌঁছনো যায়, তার পরে পায়ের উপরেই ভরসা, অসক্ত হলে ঘোড়া কিংবা ডাণ্ডি, কিছু রিক্‌শাও আছে। নৈনিতালের একটা রাস্তায় নাকি সাইকেল রিক্‌শাও চলছে।

শিলঙে অন্য রকম। শিলঙের বাস এসে দাঁড়াচ্ছে শহরের প্রায় মাঝখানে। প্রধান রাজপথগুলিতে মোটর চলছে স্বচ্ছন্দে। উত্তর থেকে আসছে গৌহাটির পথ, চেরাপুঞ্জির রাস্তা পশ্চিমে হেলে দক্ষিণে গেছে। এই দিকেই বোধহয় আবার শিলঙ। শিলঙ পিকে যাবার দুটো রাস্তা আমি মানচিত্রে দেখেছি। একটা বেরিয়েছে চেরাপুঞ্জির রাস্তা থেকে, আর একটা কেঞ্চ্‌স্ ট্রেসের পুব ধার দিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টের পাশ দিয়ে উপরে উঠে গেছে। মানচিত্রে দেখা আর চোখে দেখা এক রকম নয়। চোখে দেখে যেমন সব কিছু বোঝা

যায় না, তেমনি মানচিত্র দেখেও কিছু জানা হয় না। এই বোঝা ও জানার জন্যে মানচিত্র দেখে পায়ে হাঁটতে হয়। পায়ে হেঁটে শহর না দেখলে দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মিস্টার মর্গানকে আমি এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করলুম। তিনি বললেন: পায়ে হেঁটে কি শিলঙের মতো ছড়ানো শহর দেখা যায়! আর গাড়ি থাকতে হাঁটবেনই বা কেন? হেঁটে ওয়ার্ড লেক দেখুন, শিলঙ ক্লাব সেক্রেটারিয়েট রাজভবনও দেখুন, সব কাছাকাছি সামনে পিছনে। বোটানিকাল গার্ডেনও দেখুন। তাই বলে শিলঙ পিক! শহর থেকে ছয় মাইলের কম হবে না।

ইভা বলল: কিছু আমাদের হাঁটতেই হবে। সব জায়গায় তো আর গাড়ি যায় না।

শেষ পর্যন্ত ইভার কথাই ঠিক দেখেছিলুম। গাড়ি সব জায়গায় পৌঁছয় না, পথের ধারে গাড়ি রেখে হেঁটে অনেক জায়গায় এগোতে হয়েছে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। কিন্তু ভালো লেগেছে হাঁটতে। পাহাড়ের পথে হাঁটবার একটা আনন্দ আছে, সে আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হই নি।

শিলঙ শহরের উচ্চতা শুনলুম পাঁচ হাজার ফুটের কম, ৪৯০৮ ফুট, আর শিলঙ পিক ঠিক দেড় হাজার ফুট বেশি। এই চূড়োয় উঠলে চারিদিকের দৃশ্য দেখা যায় অপরূপ। শুধু শিলঙ শহর নয়, নিচের গ্রামাঞ্চলও দেখা যায়, আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূর-দিগন্তে হিমালয় পাহাড়ও দেখা যায় ছবির মতো। ভারি সুন্দর পরিবেশ, ভারি মনোহর। মিস্টার মর্গান বললেন: ভালো লাগছে তো?

বললুম: হ্যাঁ।

মিস্টার মর্গান বললেন: ওরা পিকনিক করতে এসেছে।

বলে মেয়ে পুরুষের দু তিনটি দল দেখিয়ে দিলেন। তারা এক এক ফালি রোদে বসে গল্পগুজব করছে, কেউ রেডিও শুনছে। তাদের হাসিখুশি ভাব দেখে আমাদেরও ভাল লাগল।

ইভা বলল : কাল আরও বেশি লোক আসবে। আর যারা জল দেখতে ভালবাসে, তারা যাবে এলিফ্যাণ্টা ফল্‌সে।

সে কোথায় ?

মিস্টার মর্গান বললেন : বেশি দূর নয় এখান থেকে। আসুন, আপনাকে দেখিয়ে আনছি।

সত্যিই খুব বেশি দূরে নয়। আপার শিলঙের মেন রোড ধরে খানিকটা পথ এগোতে হল। তারপরে সেই ঝর্ণার কাছে পেঁ ছিলুম। শহর থেকে মাইল সাতেক দূর হবে। যে পথে আমরা এলুম, এটিই নাকি চেরাপুঞ্জির পথ। জলপ্রপাতের ধারা এখন ক্ষীণ, কিন্তু পরিবেশটি নয়নাভিরাম। শ্যামল শৈলের গা বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। সোপানের আকারে তার বিস্তার দেখছি। নিচে একটি বিক্ষুব্ধ জলাশয়। বর্ষায় এই প্রপাত দেখে কারও হয়তো হাতীর পিঠের কথা মনে হয়েছিল, তাইতেই এর নাম হয়েছে এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্।

এর আশেপাশে আমি কোন লোকজন দেখতে পেলুম না, তাই তাকালুম ইভার মুখের দিকে। ইভা আমার প্রশ্নটা সহজেই বুঝল, বলল : আমি গ্রীষ্মের সময়ে এখানে এসেছি, তখন এই ঝর্ণার অপরূপ রূপ। লোকজনে ভরে থাকে এই জায়গা।

মিস্টার মর্গান বললেন : শীত আসছে। তাই এখানকার আকর্ষণ আসছে ফুরিয়ে।

ফেরার পথে মিস্টার মর্গান আমাকে শিলঙের সেনা নিবাসের কথা বললেন। দুটো ক্যাণ্টনমেণ্ট আছে এই শহরে। একটার নাম এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্, আর হ্যাপি ভ্যালি আর একটার নাম। সে ছাউনিটা শহরের উলটো ধারে, দূর হবে মাইল তিনেক।

মিস্টার মর্গান আমাকে কয়েকটি পাড়ার নাম বললেন। শহর ও শহরতলীতে এই সব পাড়া। ঝালুপাড়া মাওপ্রেম শহরের উত্তর-পশ্চিমে, দক্ষিণ-পশ্চিমে হল লবান আর লুমপারিঙ, পূর্বাঞ্চলে

লাইটুমুখরা। বললেন : শিলঙের লোকসংখ্যা বাড়ছে প্রতি দিন। ১৯৫১ সালে ছিল সাড়ে আটান্ন হাজার, ১৯৬১ সালে হয়েছে ছিয়াত্তর হাজার। স্থানীয় লোকের বসতি আপনি বড়বাজার আর লাইটুমুখরায় দেখবেন, আর দেখবেন লবান আর মঙ্‌থিম্মাইএ। লাইটুমুখরায় তো আপনি গিয়েছিলেন শুনলাম।

আমি ইভার মুখের দিকে তাকালুম।

ইভা বলল : জাস্তিনার বাড়ি ঐ পাড়াতে।

তারপরে মিস্টার মর্গানকে জিজ্ঞাসা করল : কিন্তু আপনি এ কথা জানলেন কোথায় ?

মিস্টার মর্গান হা হা করে হাসলেন, তারপর বললেন : একটা অফিস চালাতে হচ্ছে, সব খবর না রাখলে কি চলে !

মিস্টার মর্গানের হাসিটি সরল প্রাণখোলা ধরনের, এই হাসিতে আমি কোন অভিসন্ধির সন্ধান পেলুম না বলে আমিও হাসলুম। ইভা একটু লজ্জিত ভাবে বলল : এ নিশ্চয়ই জাস্তিনার কাজ, সেই এ কথা আপনাকে বলেছে।

মিস্টার মর্গান বললেন : তুমি বড়ুয়াকে বলবে, আর জাস্তিনা আমাকে বলেছে। তাতে ক্ষতি হয়েছে কিছু ?

ইভাকে বড় বিষণ্ণ দেখাল। আমার মনে হল যে মিস্টার বড়ুয়ার নামেই তার আনন্দ সহসা মুছে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বললুম : না না, ইভা আমাদের কথা কাউকে বলবে না।

বললেই বা ক্ষতি কী !

বলে মিস্টার মর্গান হাসতে লাগলেন।

আমাদের গাড়ি অতি দ্রুত শহরের উত্তর দিকে চলে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

মিস্টার মর্গান বললেন : শিলঙ যে গল্‌ফ্‌ কোর্সের জন্য গর্ব করে তাই দেখতে যাচ্ছি। ভারতবর্ষে নাকি এমন ভাল গল্‌ফ্‌ কোর্স আর একটিও নেই। পৃথিবীতে মাত্র একটি আছে, সে কোথায় তা জানি না

আমি বললুম : গল্‌ফ্‌ খেলার প্রতি সাহেবদের একটা দুর্বলতা ছিল। যেখানেই কয়েকজন সাহেব মেম, সেখানেই একটা গল্‌ফের মাঠ। সংখ্যায় বেশি হলেই একটা রেস কোর্স।

মিস্টার মর্গান বললেন : ঠিক বলেছেন। এখানেও একটা রেস কোর্স আছে।

এই দুটো মাঠই কাছাকাছি। রেস কোর্স আর ক্লাব আমরা দূর থেকে দেখলুম। ক্লাবের পিছনে ঝাউএর বন। গল্‌ফ্‌ কোর্সেও আছে ঝাউএর কুঞ্জ। প্রশস্ত একটি সুন্দর উপত্যকায় গল্‌ফ্‌ খেলার এই বিখ্যাত ময়দান। শিলঙে পোলো খেলাও হয়।

এর পরে আমরা স্প্রেড্‌ ঈগল্‌ ফল্‌স্‌টি দেখে এলুম মাইল খানেক দূরে। এই প্রপাতের জল এখন ঈগল পাখির পক্ষপুটের মতো প্রসারিত নয়, ক্ষীণ জলের ধারা দেখে নামটি হাস্যকর মনে হয়। আমার মন্তব্য শুনে মিস্টার মর্গান বললেন : এখন আপনি এই কথা বলছেন, কিন্তু বর্ষায় বলবেন না। তখন আপনাকে এখানে এসে সারা দিন বসে থাকতে হবে, ঘরে ফিরতে মন চাইবে না।

ইভা তাঁকে সমর্থন করে বলল : সত্যি কথা।

মিস্টার মর্গান বললেন : স্নানের শখ থাকলে যাবেন ক্রিনলিন ফল্‌সে। দূর মোটেই নয়, কিন্তু স্নান করে সুখ পাবেন।

ঝর্ণার জলে স্নানের কথা আমি ভাবতে পারি না। কেউই বোধহয় ভাবতে পারেন না। ইভা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় এ কথা বুঝতে পারল, বলল : সেখানে একটা সুইমিং পুল আছে, ঝর্ণার জলকে বেঁধে এমন ব্যবস্থা হয়েছে যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল সারাক্ষণ পাওয়া যায়। কাছে একটি ছোট রেস্তরাঁও আছে।

বেলা আজ পড়ে আসছিল। তাই বললুম : একদিন যাব আমরা।

ফেরার পথে মিস্টার মর্গান বললেন : সুইট ফল্‌স্‌ আজ থাক, চলুন এবারে বিশপ আর বিডন ফল্‌সে।

ইভা বলল : ওয়ার্ড লেক আমরা আর এক দিন দেখব। খুব কাছেই তো, বিকেলবেলায় হেঁটেই চলে আসব।

পথের উপর থেকে আমি ওয়ার্ড লেক দেখেছিলুম। একটুখানি নিচুতে এই লেক, একটুখানি নেমে যেতে হয়। একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে এই জলাশয়টি সত্যিই সুন্দর। এপার ওপার যাবার জন্যে মাঝখানে একটি পুল আছে। অনেক জায়গায় ছবি দেখেছি এই লেকের। বললুম : হেঁটে বেড়াবার আনন্দ অন্য রকমের। সঙ্গী পেলে আমি রোজই হাঁটতে পারি।

মিস্টার মর্গান বললেন : আপনারা সমতলের মানুষ, আপনারা হাঁটতে ভালবাসেন শুনলে আমাদের আশ্চর্য লাগে।

কেন ?

গৌহাটিতে দেখেন নি, এক পা যেতে হলে লোকে রিক্‌শায় চেপে বসে !

আমি বললুম : আমরাও তাই করি। কাজের বেলায় এক পা হাঁটতে চাই নে। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে আবার গাড়িতে উঠতে বললে মন খারাপ হয়।

বড়বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলুম। শিলঙের এই অঞ্চলটিই সবচেয়ে জমজমাট। ঘরবাড়ি দোকানপাট যেন এখানেই সবচেয়ে বেশি। শিলঙের সাপ্তাহিক হাটও বসে এইখানে। কিন্তু মিস্টার মর্গান একটা নতুন কথা বললেন : হাট এখানে সপ্তাহে বসে না, বসে আট দিন পরে পরে।

মানে ?

মানে আমাদের হপ্তা আট দিনে। আট দিন আট জায়গায় হাট বসে, তারপর আবার প্রথম জায়গায়। এই আটটি হাটের নামে আমাদের হপ্তার আটটি বার।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : আপনাদের হিসেবের গোলমাল হয় না ?

ভদ্রলোক বললেন : গোলমাল হবে কী করে ? আমাদের দেশী মাসের সঙ্গে কি ইংরেজী মাস আমরা গুলিয়ে ফেলি !

তা ফেলি না।

বারের বেলাতেও তাই। এবারের হাটবারে আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। খাসি মেয়েদের কেনা বেচা দেখে আপনার তাক লেগে যাবে। তাই না ইভা ?

ইভা বোধহয় লজ্জা পেয়েছিল, কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ পেল না। মিস্টার মর্গান হৈ-হৈ করে গাড়ি থামালেন, বললেন : মাপ করবেন আমাকে, আমার একটা খুব জরুরী কাজ আছে, সেকথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

বলে নেমে পড়লেন। ইভাকে বললেন : বিশপ বিডন ফল্‌স্‌ দেখিয়ে সাহেবকে হোটেলে পৌঁছে দিও।

ইভা এ কথারও উত্তর দেবার সময় পেল না। মিস্টার মর্গান ভিড়ের ভিতর মিশে গিয়েছিলেন, আর ড্রাইভার কোনও আদেশের অপেক্ষা না করেই চলতে শুরু করেছিল।

গৌহাটি রোড ধরে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে গেলুম। প্রশস্ত পথের এক ধারে ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। আমি সামনে ও পিছনে একবার তাকালুম। দরজা খুলে ইভা বলল : এখানেই আমাদের নামতে হবে।

বাঁ হাতে আমাদের পায়ে চলার পথ। গাড়ি থেকে নেমে আমরা পাহাড়ের ধারে ধারে অগ্রসর হলুম।

শিলঙের সবচেয়ে প্রিয় জলপ্রপাত হল বিশপ আর বিডন। উম্‌সিরপি ও উম্‌খারা নামে দুটি নদী দুটি পাহাড়ের গা বেয়ে জলপ্রপাত রূপে নেমে এসেছে। অনেক নিচে এই ধারা দুটি নাকি মিলিত হয়েছে, সেই মিলিত ধারার নাম উনিয়াম। কে জানে, এখানকার এই জলপ্রপাতগুলি এই দুটি নদীরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ কিনা।

শিলঙের বাতাসে এখন শীতের আমেজ লেগেছে, ঝর্ণার ধারা এসেছে শুকিয়ে। যে রূপ দেখতে পাব আশা করেছিলুম, সে রূপ আর নেই। ক্ষীণ জলধারার দিকে চেয়ে হৃতযৌবনা নারীর কথাই মনে হয়।

বাঁধানো পথ ধরে এগোতে এগোতে ইভা বলল: এই বিডন ফল্‌স্ থেকে শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। নিচে খানিকটা নেমে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাটি দেখা যাবে।

ঘর বাড়ি ও কারখানায় আমার কৌতূহল নেই। বললুম: কারখানা আমি কল্পনা করে নিতে পারব।

ইভা বলল: শিলঙ দেখতে এসে সবাই ঐ কারখানাটিও দেখে যায়।

দেখবার জিনিস বলেই দেখে।

আমরা পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরে আর একদিকে এসে উপস্থিত হলুম। চোখের সামনে শুধু অরণ্যময় পর্বত, মন ভোলাবার মতো আর কিছু দেখতে পেলুম না।

ইভা বুঝি আমার মনের কথা বুঝল, বলল: প্রথম বর্ষায় একবার আপনাকে এখানে আনব। এ জায়গার রূপের কথা আপনার চিরকাল মনে থাকবে।

সত্যিই এ জায়গার রূপের কথা আমি কোন দিন ভুলব না। এক অপরূপ ছবি সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে ভাসে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কথা আমার মনে পড়ে।—

'ঝর্না, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।'

সূর্য এখন অস্ত যাচ্ছে, আকাশ ভরা তারাও ওঠে নি। ক্ষীণধারা ঝর্ণার জলে তাদের কোন প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি না। তবু আমার

মন চলে গেল 'শেষের কবিতা'য়। আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। আর ইভা কোন কথা কইল না।

অলস ভাবে চলতে চলতে আমরা একটি নির্জন স্থানে এসে পৌঁছলুম। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে সেইখানে, আর ঝর্ণার ধারা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, তার কলগানও অল্প অল্প কানে আসছে। ইভা অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল : এখানে বসবেন একটুখানি ?

আমার মনে হল সে আমার অন্যমনস্কতা ভাঙতে চায় নি, আরও অন্যমনস্ক হবার সুযোগ দেবার জন্যেই এই অনুরোধ করেছিল। আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে একখণ্ড উপলের ওপরে বসলুম। ইভা খানিকটা তফাতে গিয়ে বসল।

আমি তাকে কাছে বসতে বললুম না, কোন কথাই বললুম না তাকে। 'শেষের কবিতা'র অমিত ও লাবণ্যর কথা আমার মনে পড়েছিল। লাবণ্যকে ঝর্ণার কথা বলবার সময় অমিত এমন করে ঝর্ণার সামনে এসে বসে নি। সে এই ঝর্ণার কথা লাবণ্যদের বাড়িতেই বলেছিল। একটা মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস্ গাছের 'গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকাল-বেলাকার রোদ্‌দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়ালো, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে।'

এইখানেই অমিত বলেছিল, 'তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

For God's sake hold your tongue
and let me love !'

'দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।'

কিন্তু তারা চুপ করে থাকে নি। অনেক কথা হয়েছিল তাদের, অনেক শৌখিন ধারালো কথা, অনেক গভীর মর্মান্তিক কথাও। তাদের সব কথা আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। লাবণ্য বলেছিল, 'মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহু দূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না—না না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরও জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।'

অমিত এ কথার উত্তরে বলেছিল, 'বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ?'

লাবণ্য বলেছিল, 'বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভাল্‌গার। ওটা বড় রেস্‌পেক্টেবল্; ওটা শাস্ত্রের দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।'

অমিত এ কথার উত্তর দিতে পারে নি, বলেছিল, 'বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।'

কিন্তু লাবণ্যর কঠিন কথা তখনও ফুরোয় নি, বলেছিল, 'মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না—তাতেই আমি খুশি থাকব।'

লাবণ্য এক সময়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড় প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।'

অমিত বলেছিল, 'তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।'

লাবণ্য বলেছিল, 'আমি চাই নে কবি হতে।...জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।'

এর পরেই অমিত তার কবিতা বার করেছিল। বলেছিল, 'তুমি ঝর্না, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথর-গুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতের সুরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী—
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।'

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বলেছিল, 'যতই আমার আলো

থাক্ আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।'

পূর্বের দিগন্ত থেকে ছায়া নামছিল, সেই ছায়ায় আমি ইভার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম। ইভাকে যেন আর ইভা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে অনেক দিনের পরিচিত একটি মেয়ে এই অস্বচ্ছ আলোয় যেন আত্মগোপন করে আছে। তাকে যেন আমি কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় দেখেছি জ্যোৎস্নার বন্যায়, অজন্তার গিরিনির্ঝরিণীর ধারে দেখেছি মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত রৌদ্রে, আবার সোমনাথের মন্দিরের পিছনে পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি পাশাপাশি বসে। লাবণ্যর মতো সেও কি আমাকে একই কথা বলে নি! অমন পরিষ্কার করে বলে নি বলেই কি আমি আজও অন্য কথা ভাবছি! মানুষের মনের কথা মানুষ জানে না।

২০

ইভা আমাকে জাগায় নি, আমি নিজেই জেগেছিলুম। পাশ দিয়ে যাবার সময় একদল মেয়েপুরুষ এমন কলরব করেছিল যে সেই শব্দেই আমি জেগেছিলুম। লাবণ্য নয়, স্বাতিও নয়, খানিকটা দূরে যে নিঃশব্দে বসেছিল সে ইভা। শিলঙ পাহাড়ের খাসি মেয়ে ইভা এক রকম বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখছিল। আমি তার দিকে তাকাতেই সে উঠে দাঁড়াল, বলল ঃ চলুন, এবারে ফেরা যাক।

কোন কথা না বলে আমিও উঠে দাঁড়ালুম, তারপর অনুসরণ করলুম তাকে।

গাড়িতে বসে ইভা বলল : এই জায়গাটা আপনার খুব ভাল লেগেছে।

আমি সংক্ষেপে বললুম ঃ হ্যাঁ।

ইভা আরও কিছু জানবার জন্য বলল : আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মনে হচ্ছিল।

এ কথাও আমি অস্বীকার করলুম না, বললুম : কতকটা তাই, রবীন্দ্রনাথের একখানা উপন্যাসের কথা আমার মনে পড়েছিল, তাঁর নায়ক নায়িকার দেখা হয়েছিল শিলঙে। দুজনের মোটরে ধাক্কা লেগে গিয়েছিল।

ইভা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : তুমি বাঙলা জানলে বইখানা তোমাকে পড়তে দিতুম। এখানকার বইয়ের দোকানে নিশ্চয়ই কিনতে পাওয়া যায়।

হোটেলের দরজা থেকে ইভা বিদায় নিতে চেয়েছিল, আমি তাকে যেতে দিলুম না। বললুম : তা হয় না। আমার সঙ্গে অনেক ঘুরেছ, একটু চা খেয়ে যাও।

ইভা একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল: আপনার সঙ্গে তো আমি অনেক দিন খেয়েছি, আজ থাক।

হেসে বললুম: ঋণের বোঝা বাড়বে বলে ভয় পেও না। তোমার কাছেও আমার ঋণ হচ্ছে, দুইয়ে কাটাকাটি হবে।

বলে তাকে ভিতরে ডেকে আনলুম। ডাইনিং হলে একখানা ফাঁকা টেবিল দেখে বসলুম দুজনে। ইভা আমার সামনে মুখোমুখি বসতে গিয়েও বসল না, পাশে এসে বসল। মনে হল, পরিচিত কাউকে দেখতে পেয়েছে বলেই এমন করে সরে বসল।

এক ফাঁকে আমি পিছনে চেয়ে দেখলুম। ঠিকই বুঝেছি ওধারের একখানা টেবিলে কমলাকান্তবাবু চা খেতে বসেছেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় সে ধারটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বোধহয় আমাদের দেখতে পান নি, দেখে থাকলেও না দেখার ভান করে আছেন।

চায়ের সঙ্গে খাবারও এল। ইভা চা ঢেলে নিয়ে বলল: কালকের পিকনিকের সম্বন্ধে মিস্টার মর্গান আপনাকে কিছু বলেন নি?

আমি বললুম: না।

ইভা বলল: ভদ্রলোক ওই রকমই, কাজের কথাটিই যান ভুলে। কাল হয়তো শুনব যে বাসের ব্যবস্থা করতেই ভুলে গেছেন, ফার্মের গাড়িতেই যেতে হবে ঘেঁষাঘেঁষি করে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কত লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন?

ঠিক জানি নে। আমি শুনেছি জাস্তিনার কাছে। আমাদেরও যেতে হবে।

রান্নাবান্না, খরচপত্তর?

ইভা বলল: ভেবেছিলাম, এখানে ফিরে সব কথা তাঁর কাছে জেনে নেব। তিনি যে অমন ভাবে নেমে যাবেন তা বুঝতে পারি নি। আর সন্ধ্যাবেলায়—

বলে ইভা থেমে গেল।

আমার মনে হল যে মিস্টার মর্গানের সন্ধ্যাবেলার কথা ইভা বলতে চায় না। তাই আর তাকে কোন প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চাইলুম না।

একটু থেমে ইভা বলল : আমার মনে হয়, কাল সকালবেলাতেই তিনি এসে উপস্থিত হবেন।

আমারও তাই মনে হয়।

ইভাকে আমি তার বাড়িতে পেঁ ীছে দেব ভেবেছিলুম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হল না। এমন কঠিন ভাবে আপত্তি করল যে হোটেলের দরজা থেকেই ফিরে আসতে হল।

কমলাকান্তবাবু তখনও তাঁর টেবিলে বসেছিলেন। আমাকে ফিরতে দেখেই কাছে ডাকলেন, বললেন : ভাল করেছেন।

কী ভাল করেছি বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন : আর যাই করুন, ও জাতটাকে বিশ্বাস করবেন না। কেউটের জাত, ছোবল দেবার জন্যে ফনা তুলেই আছে।

ভদ্রলোকের যে কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে তা আমি সন্দেহ করেছি। তার জন্যে তিনিই হয়তো দায়ী। তাই আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিলুম, কিন্তু নিলুম না। তিনি তাঁর পুরনো সিগারেটের আগুনে নতুনটা ধরিয়ে বললেন : এদের চেয়ে নেফার মানুষকে অনেক ভদ্র দেখেছি। তাদের ব্যবহারে আন্তরিকতা আছে, সভ্য মানুষকে সম্মানও করতে জানে।

বলে নেফার মানুষের সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বললেন। বললেন নাগাদের কথাও। আজকের সন্ধ্যাটিও আমরা চা আর কফি খেতে খেতে আসামের আদিবাসী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলুম।

এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : আজ কোথাও বেড়াতে বেরবেন না ?

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন : না।

বললুম : শীতে কষ্ট হবে ভাবছেন ?

কমলাকান্তবাবু বিরক্ত ভাবে বললেন : এখানে কোথায় যাবেন আপনি! পথে পথে ঘুরে বেড়াবার বয়স কি আর আছে!

ঘোরাফেরা না করলে বন্ধুই বা কোথায় পাওয়া যাবে! কেউ সেধে তো আমাদের সঙ্গে ভাব করতে আসবে না!

তবে ঐ মেয়েটার সঙ্গে তার বাড়ি গেলেন না কেন! ব্যবসা চালাবে নিজেদের মধ্যে, আর আপনাকে দেবে গলাধাক্কা।

আমি এই রকমই সন্দেহ করেছিলুম। বেশি ঘাঁটালে কিছু কুৎসিত কথা বেরিয়ে পড়বে ভয়ে চুপ করে গেলুম।

ইভা ঠিকই বলেছিল। পরদিন সকালবেলাতেই মিস্টার মর্গান এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে ইভা ও জাস্তিনা। বললেন : এই মেয়েরাই আমাকে ডোবাবে।

আমি তাঁর উত্তাপ দেখে বললুম : কেন বলুন তো!

কাল অফিসেই এদের বলে দিয়েছিলাম যে আজ আমরা চেরাপুঞ্জিতে পিকনিক করব। একটা বড় বাস নিলে অফিসের অনেকেই যেতে পারবে। এরা ব্যবস্থা কিছুই করে নি, আজ সকালবেলা আমাকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, চেরাপুঞ্জি যাওয়া হবে কিনা। রাগ হয় কিনা আপনিই বলুন।

জাস্তিনার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, হাসছিল ইভা। তার হাসিটি আমার ভাল লাগল। আমিও হেসে বললুম : কাল বিকেলবেলায় আপনি হুড়মুড় করে বড়বাজারে নেমে গেলেন। তাই দেখে ইভা আমাকে বলল, পিকনিকের ব্যবস্থা করবার জন্যেই নামলেন।

বলেছে এই কথা!

বলে তিনি ইভার মুখের দিকে তাকালেন।

ইভা মাথা নেড়ে বলল : আমি তো শুনেছিলাম, আপনি নিজেই সব ভার নিয়েছেন।

মিস্টার মর্গান গর্জন করে উঠলেন : বাজে কথা। তুমি শিলঙের স্টাফ হলে এ কথা ভাবতে না। সন্ধ্যা হলে মর্গানের মাথার ঠিক থাকে! কী বল জাস্তিনা?

বলে জাস্তিনার দিকে তাকালেন। জাস্তিনার ভয় তখন খানিকটা কমেছে। বলল : আমারই ভুল হয়েছে। ব্যবস্থা আমাদেরই করা উচিত ছিল।

আমি বললুম : ভুল আর কী হয়েছে, চল, আমরা এখুনি ব্যবস্থা করে ফেলি। শিলঙ চেরাপুঞ্জির মাঝে তো শুনেছি রেগুলার বাস সার্ভিস আছে। দল বেঁধে চেপে বসলেই হল।

মিস্টার মর্গান বললেন : দল আর কাকে নিয়ে বাঁধবেন। যে যার মতো সব তো হাওয়া হয়ে গেছে। যে হতভাগার বাড়ি নেই এখানে, সে তো এখন নিজের গ্রামে ইয়ের আঁচলের তলায় ঘুমচ্ছে।

ইভা বাধা দিল মিস্টার মর্গানকে। বুঝতে পারলুম যে এই ভদ্রলোকের মুখ কিছু আল্‌গা। পাঁচজনের সামনেই বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারেন। ইভা বলল : দলের জন্যে ভাবনা কেন। দুজনের বেশি হলেই তো দল হয়। আমরা এখানে চার জন আছি। আমাদের গাড়িও আছে সঙ্গে।

তারপর খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে!

আমি বললুম : চেরাপুঞ্জির বাজারে যা পাওয়া যায় তাই ভরসা।

জাস্তিনা বলল : ইউডাহ্‌ থেকেই জিনিসপত্র নেওয়া যেতে পারে।

মিস্টার মর্গান বললেন : ইউডাহ্‌ কেন, এই হোটেল থেকেই চারটে টিফিন কেরিয়ার নেওয়া যায়!

কথাটা তিনি বিদ্রূপের সুরে বললেন। জিজ্ঞাসা করে জানলুম

যে ইউডাহ্ মানে বড়বাজার। বড়বাজারের নামেই হোটেলের কথা এসেছে। আমি মধ্যস্থতার জন্যে বললুম : চারজনকে চারটে আইটেম দিতে হবে, যে যে ভাবে পার সংগ্রহ কর।

মিস্টার মর্গান তখনই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন : বেশ, আমি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আইটেমটা দেব। ভাল ড্রিঙ্কস্।

ইভা প্রবল ভাবে আপত্তি করল। বলল : চলবে না, চেরাপুঞ্জিতে আমরা জল খাব।

মিস্টার মর্গান একটা মুখভঙ্গি করে বললেন : যেখানে জল পাওয়া যায় না, সেখানে গিয়েই জল খেতে চাইবে তো।

আমি বললুম : সে আবার কী কথা! যে জায়গায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়, সেখানে খাবার জল নেই !

ভদ্রলোক বললেন : সেইটাই তো দেবতার রসিকতা। পাঁচশো ইঞ্চি বৃষ্টি হয় বছরে। ১৮৬১ সালে নাকি নশো তিন ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছিল। চেরাপুঞ্জির মাটিতে সিমেণ্ট বাঁধানো চৌবাচ্চা থাকলে বৃষ্টির জল জমে প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়েও গভীর হত। কিন্তু সেখানকার গরিব লোককে আজও এ সময় অনেক দূরের ঝর্ণা থেকে জল সংগ্রহ করে আনতে হয়।

আমি আশ্চর্য হলুম এই সংবাদ শুনে। কিন্তু মিস্টার মর্গান বললেন : সত্যি কথা।

আমি বললুম : বেশ, তাহলে আপনি জল নিন, আর আমি নিই তার চেয়েও প্রয়োজনীয় জিনিসটা।

কী সেটা ?

পাঁউরুটি, যা খেয়ে আপনারা জল খাবেন।

মিস্টার মর্গান অট্টাহাস্য করে উঠলেন। বললেন : চমৎকার বলেছেন। পৃথিবীতে এই রুটির জন্যেই তো সব লাফালাফি, আপনি ওটাই নিন।

ইভা বলল : আমরা তাহলে মাখন আর জ্যাম নিই।

মিস্টার মর্গান হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন : জ্যাম নয়, সস্। জাস্তিনা আমার অফিসে কাজ করে, সে আমাদের জন্যে মাখন নিক, আর গৌহাটি থেকে বড়ুয়া তোমাকে সাহেবের সঙ্গে পাঠিয়েছেন, সস্‌টা তুমি নাও।

বলে আবার হেসে উঠলেন। তারপর মেয়ে দুটিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন : চল চল, তোমাদের এসব ভাবতে হবে না। আপনি তৈরি আছেন তো, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে!

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : আপনার জন্যে তৈরি হয়েই আছি।

তবে আর দেরি কেন!

বলতে বলতে তিনি গাড়ির কাছে সবাইকে টেনে আনলেন। ইভা আর জাস্তিনাকে পিছনের সীটে ঠেলে দিয়ে আমাকেও তাদের সঙ্গে তুলে দিলেন। নিজে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসেই বললেন : চল।

কোথায় যেতে হবে তা বললেন না, কিন্তু ড্রাইভারের যে গন্তব্য স্থান জানা ছিল তা কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারলুম। একখানা ছোট বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই মিস্টার মর্গান নেমে পড়লেন। ড্রাইভারও নামল। মিস্টার মর্গান ঢুকলেন বাড়ির ভিতরে, আর ড্রাইভার গাড়ির পিছনের ঢাকনা খুলল। আমার কৌতূহল দেখে ইভা বলল : মিস্টার মর্গানের বাড়ি।

আমরা নামব কিনা ইতস্তত করছিলুম, এমন সময় মিস্টার মর্গান বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে গোটাকয়েক বেতের বাস্কেট, পিছনে তাঁর ভৃত্যের হাতে আরও অনেক জিনিসপত্র। সেসব গাড়ির পিছনে তুলে দিয়ে মিস্টার মর্গান তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে সামনে বসলেন। এবারে যে আমরা চেরাপুঞ্জির দিকে যাত্রা করলুম তাতে আমার সন্দেহ রইল না।

ইভা এবারে আস্তে আস্তে বলল : ব্যবস্থা তো আপনি সব করেই রেখেছিলেন।

সামনে থেকে মিস্টার মর্গান বললেন : না করে আর উপায় কী ! তোমাদের উপর কি কিছু ভরসা রাখবার জো আছে ! যেমন অফিসে ডোবাচ্ছ তেমনি বাইরেও ডোবাবে।

আমি হেসে বললুম : শুধু দলটা আপনি একটু ছোট নিতে চেয়েছিলেন, এই তো !

মিস্টার মর্গান আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : এই দেখুন, ব্যাপারটা আপনি কত চট করে বুঝে গেলেন। অফিসের হতভাগাদের সঙ্গে নিলে সবার কাছে গাল খেতে হত। কেউ বলত, হপ্তায় একটা দিন ছুটি, তাও নষ্ট হল। আবার কেউ বলত—

বলে ইভার দিকে তাকাতেই সে চেঁচিয়ে উঠল : বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

মিস্টার মর্গান তার ভয় দেখে হেসে উঠলেন।

আমরা সোজা চেরাপুঞ্জি যাচ্ছি। শহর থেকে পশ্চিমমুখো বেরিয়ে পথ সোজা দক্ষিণে নেমেছে। অনেকটা পথ সমতল, তার পরেও ওঠানামা বেশি নেই। যে পথে আমরা চলেছি তা ন্যাশনাল হাইওয়ে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে গোয়ালপাড়া শহর থেকে শিলঙ এসেছে গৌহাটির উপর দিয়ে, শিলঙ থেকে সীমান্তের গ্রাম ডাওকি পর্যন্ত যাবে। তারপরেই পাকিস্তান। শিলেট শহর ডাওকির খুব কাছে। যারা ট্রেনে শিলেট যেতে চান তাঁদের অনেক ঘোরা পথ। গৌহাটি থেকে পূর্ব মুখে লামডিং হয়ে দক্ষিণে করিমগঞ্জ আসতে হবে, করিমগঞ্জ থেকে মোটরে শিলেট। সুর্মা নদীর তীরে বাঙলার এই প্রিয় স্থানটি আর ভারতের হাতে নেই। দেশ ভাগাভাগির সময় শ্রীহট্ট জেলাটাই পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে।

শিলেট শহরেই এই পথ ফুরিয়ে যায় নি, সুর্মা নদী অতিক্রম করে দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। ত্রিপুরার রাজধানী

আগরতলা সীমান্তের খুব কাছে। তারই উপর দিয়ে এ পথ পৌঁছেছে কুমিল্লায়। কুমিল্লা এখন পাকিস্তানে। কুমিল্লাতেও পথের শেষ নয়, ফেণী হয়ে চট্টগ্রামে গেছে। অবিভক্ত বাঙলার প্রিয় পার্বত্য শহর চট্টগ্রামও এখন পাকিস্তানে। সমুদ্র আর কর্ণফুলী নদী এই শহরটিকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করেছে।

করিমগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেললাইনও আছে। কুমিল্লার উপর দিয়ে গেছে, কিন্তু আগরতলাকে ছুঁয়ে যায় নি। ত্রিপুরা রাজ্য এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। যেমন মনিপুর নাগাল্যাণ্ড ও নেফা। করিমগঞ্জ থেকে আগরতলা আমরা পাকিস্তানের উপর দিয়ে যাই, যাই মোটরে। আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের উপর দিয়ে মোটরের পথ আছে। উড়োজাহাজে আগরতলা যাওয়াই সুবিধে। কলকাতা থেকে গৌহাটিও শিলচর থেকে আসা যায়, শিলচর থেকে মনিপুরের ইম্ফলও খুব কাছে।

শিলঙ থেকে মোটরেও শিলচরে আসা যায়। জোয়াই নামে জয়ন্তিয়া পাহাড় সাবডিভিশনের প্রধান শহরটি শিলঙ থেকে মাত্র তেতাল্লিশ মাইল দূরে। সরকারী পরিবহনের গাড়ি নিত্য যাতায়াত করে। তারপরে এই সড়ক কাছাড় জেলার সমতলে নেমেছে। গরমপানি নামে একটা জায়গায় আছে গরম জলের প্রস্রবণ, তারই উপর দিয়ে শিলচরের পথ।

সামনে থেকে মিস্টার মর্গান বললেন : আপনারা এমন চুপচাপ বসে আছেন কেন ?

আমি বললুম : এই পাহাড়ের রাস্তায় খুব ভাল লাগছে।

মিস্টার মর্গান খুশী হয়ে বললেন : নিশ্চয়ই লাগবে, দেশটা তো আমাদের খারাপ নয়।

তারপরে ইভাকে বললেন : এর পরের বার ওঁকে মফ্‌লঙ আর মইরঙে নিয়ে যাব।

সে আবার কোথায় ?

ইভা বলল : আমাদেরই খাসি পাহাড়ে।

মিস্টার মর্গান পিছন ফিরে বললেন : আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে পথ ধরে আমরা চলেছি, এ পথ গেছে ডাওকি পর্যন্ত। একদিন সেখানেও আপনাকে নিয়ে যাব।

কী আছে সেখানে দেখবার ?

পথটাই দেখবার মতো। বারো মাইলে পাব চেরাপুঞ্জির পথ, দক্ষিণ পশ্চিমে গেছে, আর ডাওকির পথ দক্ষিণ পূর্বে। প্রথমটায় খাদের পাশ দিয়ে সরু পথ, তারপরেই এক সময় সামনে দেখবেন প্রশস্ত উপত্যকা। আগে লোকে এই পথেই শিলেট যাতায়াত করত।

আমি বললুম : আপনি আর দুটো জায়গার নাম করেছিলেন।

মিস্টার মর্গান তখন বললেন : একটু আগে ডান হাতে আমরা একটা পথ পেয়েছিলাম, সেই পথ মফ্‌লঙ গেছে, মফ্‌লঙ থেকে মইরঙ। এই ধরুন, পনর আর বারো সাতাশ মাইল। ছোট ছোট দুটো গ্রাম, কিন্তু পিকনিক করে সুখ পাবেন।

জাস্তিনা বলল : আর বাইলঙ রক !

মিস্টার মর্গান বললেন : পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আপনার চোখে ধাঁধা লাগবে। দেখিয়ে আনব এক দিন।

এক সময় আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে দিয়ে চেরাপুঞ্জির রাস্তা ধরলুম। এই পথে ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক, এক সময়ে এক দিক থেকে গাড়ি যাবে। সেই সময়ে পৌঁছতে না পারলে অপেক্ষা করতে হবে। চেরাপুঞ্জির বাস শিলঙ থেকে বোধহয় চারবার ছাড়ে। তার সময় এদের জানা আছে। কাজেই অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করতে হয় না।

শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব মাত্র তেত্রিশ মাইল। তার মধ্যে বারো মাইল আমরা পেরিয়ে এসেছি, বাকি আছে একুশ মাইল। এই পথটুকু সঙ্কীর্ণ, পাহাড়ের গা ঘেঁষে সাবধানে চলতে হয়। তবে

সামনে থেকে কোন গাড়ি ঘাড়ের উপরে এসে পড়বার ভয় নেই। সে দিক থেকে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে চলা যায়।

মিস্টার মর্গান বললেনঃ আজ আকাশ পরিষ্কার আছে তাই রক্ষে। তা না হলে এ পথ প্রায় সারাক্ষণই মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সামনে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। হঠাৎ যদি মেঘের ভেতর ঢুকে পড়তে হয় তো আপনার ভয় করবে।

মনে মনে আমি সেই অবস্থা কল্পনা করতে পারি। পাহাড়ের মেঘ আমি দেখেছি। একবার সেই মেঘ এলে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। ঘর বাড়ি গাছপালা সবই ঢেকে যায় ধূসর মেঘে। তখন সামনে পা ফেলতে ভয় করে, মোটর চালাতে তো ভয় করবেই।

চেরাপুঞ্জিতে একটা সার্কিট হাউস আছে। আমাদের গাড়ি এসে সেই সার্কিট হাউসের হাতার ভিতরে ঢুকল। বেয়ারা এগিয়ে এসেছিল, মিস্টার মর্গানকে দেখে মস্ত বড় একটা সেলাম ঠুকল। মিস্টার মর্গান গাড়ি থেকে নেমেই তার পিঠে একখানা হাত রাখলেন, তারপরে নিজেদের ভাষায় কিছু বললেন। বেয়ারার মুখে প্রসন্নতা দেখেই বুঝতে পারলুম যে আমাদের আগমনে সে কৃতার্থ হয়ে গেছে। আমি বললুমঃ এসব জায়গায় তো আগে থেকে ব্যবস্থা করে আসতে হয়।

ভদ্রলোক বললেনঃ সে সব নিয়ম বড়লোকের জন্যে, আমরা জায়গা আছে শুনলেই ঢুকে পড়ি। চেরাপুঞ্জি না হয়ে অন্য জায়গা হলে এখানে আসতাম না, কোন খোলা জায়গা দেখেই বসে যেতাম।

বৃষ্টির ভয় বুঝি!

ঠিক ধরেছেন। ট্রেচারাস জায়গা, কখন কোন্ দিক থেকে মেঘ এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাবে বোঝা যায় না।

বেয়ারার সঙ্গে মিস্টার মর্গানের ভৃত্য ততক্ষণে জিনিসপত্র সব

নামিয়ে ফেলেছে। আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলুম, একটু কফি খেয়ে আমরা বেড়াতে বেরব।

বেড়াবার প্রধান জাগয়া এখানে ছটো। মোস্‌মাই ফল্‌স্‌ ও মোস্‌মাই কেভ্‌স্‌ এখান থেকে প্রায় ছু মাইল দূরে। তাছাড়া আছে কিনরেম ফল্‌স্‌, অ্যামেরিকান মিশন ও রামকৃষ্ণ মিশন। চেরাবাজারকে ঘিরে খাসিদের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই চেরাপুঞ্জি। কফি খাবার পরে গাড়িতে চেপে আমরা এই সমস্ত জায়গা দেখে নিলুম। পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের সমতল ভূমিও দেখতে পেলুম।

মোস্‌মাই ফল্‌স্‌ই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। দূর থেকে এই জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে আমরা একটি বিরাট প্রপাতের কঙ্কাল দেখছি। একদা হয়তো অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি বিশাল জলধারা সবেগে নিচে নামত, এখন দূরে দূরে কয়েকটি সূক্ষ্ম জলধারা রূপোলী রেখার মতো নিচে ঝরে পড়ছে। একটি ধারার সঙ্গে আর একটি ধারা যুক্ত নয়, কিন্তু একই উৎস থেকে এই জল আসছে বলে মনে হল। হয়তো ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক কোন ছুর্যোগে এই পরিবর্তন ঘটেছে।

সহসা মাথার উপরে রৌদ্র উঠল ঝকমক করে। সামনের ঝর্ণারও রূপ বদলে গেল। মনে হল জলের ধারা নয়, চোখের সামনে গলা রূপোর ধারা নামতে দেখছি।

মিস্টার মর্গান বললেন: ভারি আশ্চর্য হচ্ছেন তো, এই ফল্‌স্‌টি প্রায় আঠারোশো ফুট নিচে পড়েছে। বর্ষায় এর বিস্তার হবে প্রায় তেরোশো ফুট।

এখান থেকে আমরা মোস্‌মাই গুহা দেখতে গেলুম। খানিকটা পথ আমাদের হাঁটতে হল। তারপর একটি অরণ্যময় পরিবেশে সেই প্রাচীন গুহা। অন্ধকার শীতল ও ভয়াবহ। এ গুহা কত প্রাচীন, কত বিস্তার এর, এ সব তত্ত্ব নিয়ে আমাদের আলোচনা হল না।

মিস্টার মর্গানের পকেটে যে একটা টর্চ ছিল তা জানতুম না। হঠাৎ তিনি গুহার দেওয়ালে একটা আলো ফেললেন। মনে হল, অসংখ্য নক্ষত্রখচিত একটুকরো আকাশ দেখতে পেলুম। বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। তা লক্ষ্য করে মিস্টার মর্গান বললেন: আকাশ নয়, নক্ষত্র নয়। গুহার ছাদে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে।

ফেরার পথে তিনি অন্য কথা বললেন: নির্বিঘ্নে এসব জায়গা দেখে গেলে মনে থাকে না। কোন বিপদ আপদে পড়লেই সারা জীবন মনে থেকে যায়।

ইভা বলল: আপনি কি কোন বিপদ আপদ চাইছেন?

মিস্টার মর্গান বললেন: তা কেউই চাই নে। কিন্তু হঠাৎ খানিকটা ভিজলেও তা অনেক দিন মনে থাকবে।

আমি বললুম: তা সত্যি।

কিন্তু তবু আমরা চেরাপুঞ্জির আকাশে কোন মেঘ জমতে দেখলুম না, এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল না কারও মাথায়।

সার্কিট হাউসে ফিরে এসে দেখা গেল যে মধ্যাহ্নের আহার তৈরি হয়ে গেছে। প্রেসার কুকারে মুরগি রোস্ট হয়েছে, আর আমরা খেতে বসলেই গরম গরম পরোটা ভেজে দেওয়া হবে। তরিতরকারিও রাঁধা হয়েছে দু একরকম। আর শামি কাবাব। দুটো কেরোসিনের স্টোভ পাশাপাশি জ্বলছে। মিস্টার মর্গান তাঁর ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন: রোস্টে কি কি মসলা দিয়েছ?

ভৃত্যটি তাঁর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

মিস্টার মর্গান বললেন: আরে, আমি কি ধনে জিরের কথা জিজ্ঞেস করছি! আমি জানতে চাইছি রাঁধলে কী করে?

ভৃত্যটি সসঙ্কোচে বলল: আদা-পেঁয়াজ-রসুনের রসে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর নুন মিষ্টি দিয়ে ঘিয়ে ভেজেছি।

একেবারে নষ্ট করেছ। ভিনিগারে ভেজাও নি?

মাথা চুলকে ভৃত্যটি বলল : সে তো শিলঙ থেকেই ভিজিয়ে এনেছিলাম।

আশ্বস্ত হয়ে মিস্টার মর্গান বললেন : তা তো বলতে হয়। খানা লাগাও তাহলে।

এ সব কথা ওঁদের নিজেদের ভাষায় হয়েছিল। আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। পরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম। বললুম : আপনি তো দিব্যি রান্না জানেন দেখছি।

ভদ্রলোক প্রচুর আনন্দ সহকারে বললেন : গিন্নী না থাকলে যা হয় আর কি, সব ব্যাপারেই স্বাবলম্বী হতে হয়েছে। তা না হলে কী কষ্ট!

আমি বললুম : সত্যি কথা।

মিস্টার মর্গান বললেন : সত্যি কথা মানে? স্ত্রী না থাকার জন্যে কষ্ট বলছেন!

আমি কিছু বলবার আগেই বললেন : ক্ষেপেছেন আপনি! স্ত্রী যখন বেঁচে ছিলেন, আমি সেই আমলের কষ্টের কথা বলছি। কোন স্বাধীনতা ছিল না, সমাজে কোন ইজ্জতও ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় এক আধটু যে পান করব তারও উপায় নেই। পয়সার অভাব, ধারে কেউ এক ফোঁটা দেবে না। বউয়ের কাছে হাত কচলে কচলে হাত দুটোই ক্ষয়ে গিয়েছিল।

বলে নিজের হাত দুটো আমাদের দেখালেন। তারপর বললেন : এখন সেই সব দোকানদারই চাইবার আগেই গেলাস ভর্তি করে দিচ্ছে, পয়সার কথা আর মুখ ফুটে বলে না, সব ধারে কারবার।

জাস্তিনা হাসছিল তাঁর কথা শুনে, কিন্তু ইভা গম্ভীর হয়ে শুনছিল। আমি কী বলব ভেবে পেলুম না।

সার্কিট হাউসের বেয়ারা আমাদের টেবিল সাজাতে এসেছিল। তাকে দেখতে পেয়ে ইভা ও জাস্তিনা এগিয়ে গেল। মিস্টার মর্গানও এগিয়ে গিয়ে বললেন : রাখো রাখো, এ তোমাদের কর্ম নয়।

বলে নিজেই সব জিনিসপত্র বেতের বাস্কেট থেকে বার করতে লাগলেন। প্লেট ছুরি কাঁটা চামচে ন্যাপকিন, টম্যাটো সস্ ফলমূল ইত্যাদি। অনেকক্ষণ ধরে অনেক আনন্দ করে আমরা খেলুম।

মিস্টার মর্গান একবার ভিতরে গিয়ে তাঁর ভৃত্যের আহারের তদারক করে এলেন। মনে হল, সার্কিট হাউসের বেয়ারাকেও তিনি খেতে দিলেন। তারপর ফিরে এসে আমাকে বললেন: এই সময়ে আপনি একটু গড়িয়ে নিন, বিকেলের চা খেয়ে আমরা ফিরব।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনারা কী করবেন?

ভদ্রলোক তাঁর কোটের পকেট থেকে এক প্যাক তাস বার করে দেখালেন। আমি বললুম: সাবাস।

খুশী হয়ে মিস্টার মর্গান বললেন: আপনিও ভালবাসেন নাকি?

বললুম: আপনার কাছে গল্প শুনতে আরও বেশি ভাল লাগবে।

মিস্টার মর্গান ইভার দিকে তাকিয়ে বললেন: সেই থেকে আমিই তো বকছি, এ দুটো মেয়েকে তাহলে আনলাম কী জন্যে!

কথায় কথায় খাসিদের নঙ্‌ক্রেম উৎসবের কথা উঠে পড়ল। শহর থেকে মাইল আষ্টেক দূরে শিলঙ পিকের পূর্বে স্মিত নামে একটি গ্রামে প্রতি বছর বর্ষার পরে এই উৎসব হয়। বাঙালীর দুর্গাপুজোর মতো খাসিদের প্রাণের উৎসব। শ্যামল সমতলের উপরে একটি উপাসনার মন্দির, তার নাম ইঙসদ, আদত খাসি রীতিতে তৈরি কাঠের ঘর, উপরে খড়ের ছাদ। চারিদিক থেকে যাত্রীরা এসে এইখানেই সমবেত হবে। ইঙসদের বড় ঘরখানির নাম কা শ্লুর, তার উত্তর দিকের দেওয়ালে একটি ওক গাছের গুঁড়ি। এইটিকে একটি পবিত্র স্তম্ভ মনে করে উৎসবের সময় পুরোহিতেরা এরই সামনে পূজাপাঠ করে। এই পূজায় খাসি ছাড়া অন্য কারও যোগ দেবার অধিকার নেই।

মিস্টার মর্গান বললেন: আপনি যদি ইঙসদ দেখতে চান তো

আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সায়েমের রাজার কাছে বিশেষ অনুমতি পাওয়া যায়।

পূজার্চনাই যদি দেখতে না পেলুম তো শুধু ঘর দেখে কী করব!

মিস্টার মর্গান বললেন: লোকে যায় নাচ দেখতে। ইঙসদের উত্তরে একটা আঙ্গন আছে, উৎসবটা হয় সেইখানে। রাজপরিবারের একজন অবিবাহিত মেয়ে এই উৎসবে যোগ দিতে আসবেন, নাচবেন সকলের সঙ্গে। ঝকমকে তাঁর বসনভূষণ, মাথায় সোনার মুকুট, একজন তাঁর মাথায় ছাতা ধরবে। তিনি নাচলে তবে সবাই নাচবে।

কারা নাচবে তাঁর সঙ্গে?

গ্রামের সব অবিবাহিত মেয়েরা। কমলালেবু রঙের উজ্জ্বল পোশাক পরে তারা আসবে, পা পর্যন্ত ঢাকা পোশাক, আর গায়ে ভারি ভারি অলঙ্কার, লাল আর সোনালী পাথরের মোটা মালা গলায়, মাথায় রূপোর মুকুট। খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে তারা নাচবে, কিন্তু দেহ একটুও দুলবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: পুরুষেরা নাচবে না?

মিস্টার মর্গান বললেন: নাচবে বৈকি। জন কয়েক পুরুষ আসবে মেরুন রঙের সিল্কের ধুতি পরে, গায়ে তাদের হাতাহীন নকশা করা কোট, আর মাথায় পাগড়ি। এক হাতে একটা চামর আর অন্য হাতে তরোয়াল নিয়ে মেয়েদের প্রদক্ষিণ করে তারা নাচে। মেয়েরা যেমন ধীর স্থির সলজ্জ লীলায়িত, পুরুষদের তেমনি মদমত্ত সৈনিকের মতো উদ্ধত আস্ফালন। সামনের বছর স্মিতে আপনাকে নিয়ে যাব।

আমি বললুম: তার তো অনেক দেরি।

ইভা বলল: শীতে আমাদের আর একটা উৎসব আছে। শিলঙের উইকিং মওলাইতে হয়।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: আমি তো ভেবেছিলুম, আজই আমাদের একটা উৎসব হবে।

সবিস্ময়ে সবাই আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললুম: আমি সেই ওক গাছের গুঁড়ি। আমার সামনে একটি গ্রামের মেয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরে এল রাজকন্যে। রাজকন্যে নাচ আরম্ভ করতেই বীরের বেশে এল এক পুরুষ, তার হাতে তরোয়াল।

বলে একখানা পরিষ্কার ছুরি টেবিল থেকে তুলে মিস্টার মর্গানের হাতে ধরিয়ে দিলুম।

মিস্টার মর্গান উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠলেন, বললেন: স্প্লেনডিড। এস ইভা, এর পরে আর না নেচে পারা যায় না।

জান্তিনা সাজল গ্রামের মেয়ে, আর ইভা রাজকন্যা। মিস্টার মর্গান বীরবেশে অবতীর্ণ হলেন। চেরাপুঞ্জির সার্কিট হাউসে আমি নঙ্‌ক্রেম নাচ দেখলুম।

২১

কাজের জন্যে শিলঙে আমার আরও কয়েকটা দিন কাটাতে হল, কিন্তু ইভা কিছুতেই গৌহাটি ফিরে গেল না। শিলঙ অফিসে তার কোন কাজ ছিল না, আমার জন্যেই তাকে পাঠানো হয়েছে জেনে আমি বারে বারে তাকে ফিরে যেতে বলেছিলুম। একদিন ওয়ার্ডস লেকের ধারে এই কথা বলবার সময় সহসা তার চোখ ছলছল করে উঠল। ইভা আমার কাছে ঘনিয়ে বসে নি, অনেক দূরত্ব রেখে বসেছিল। সায়াহ্নে অস্পষ্ট আলোয় তার চোখে জল দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম। নিজের অজ্ঞাতসারে তার কোন দুঃখের তারে হাত দিয়ে ফেলেছি বলে আমার পরিতাপের সীমা রইল না।

মিস্টার মর্গানের কথা আমার মনে পড়ল। একদিন অফিসে আমি ইভাকে ফিরে যেতে বলেছিলুম। মিস্টার মর্গান আমাকে তখনই বলেছিলেন: এই অফিসে ওর কিছু কাজ আছে, তা ফুরোলেই ওকে পাঠিয়ে দেব।

আশ্চর্য গম্ভীর মানুষ এই মিস্টার মর্গান। সবাই ভয় পায় তাঁকে, বাঘের মতো ভয় পায়। মেয়েরা তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না, ছেলেরা চোরের মতো তাকায়, না ডাকলে কাছে আসবার সাহস কারও নেই।

মিস্টার মর্গানের পিকনিক করবার কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। একখানা বড় বাস ভাড়া করে সবাই মিলে পিকনিক করতে যাবার কথা শুনে সবাই তামাশা ভেবেছিল। কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করে নি, কোন ব্যবস্থা করার দুঃসাহস হয় নি কারও। সত্যি সত্যিই তিনি কিছু চাইলে কোন কাজের ছেলেকে ডেকে সে ভার দিতেন।

এই ভদ্রলোকের আচরণে আমার অনেক কথা মনে হয়েছে। গত শনিবারে যে তিনি আকস্মিক ভাবে গাড়ি থামিয়ে বড়বাজারে

নেমে গিয়েছিলেন, আমি তারও একটা কারণ খুঁজে পেয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় যে তিনি মদের দোকানে বসেন তা তাঁর কাছেই শুনেছি। কিন্তু ইভারা এ কথা মানে না। বলে, কেউ কোন দিন তাঁকে মদের দোকানে দেখে নি। সন্ধ্যাবেলায় তিনি নিজের ঘরে বসেই মদ খান, কখনও কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বসেন কিনা তা কারও জানা নেই। এ কথা শোনবার পরে আমার মনে হয়েছে যে মিস্টার মর্গান নিজের কোন প্রয়োজনে নেমে যান নি, তিনি নেমে গেছেন ইভা ও আমার মাঝখানে নিজেকে অতিরিক্ত ভেবে। আকাশে তখন বেশি আলো ছিল না, একটু পরেই নামত অন্ধকার। বিশপ ও বিডন ফল্‌সের কাছে গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের কোল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনের কথা অনেক বলা যায়। সেখানে দুজনই ভাল। তৃতীয় ব্যক্তির স্থান সেখানে নেই। এ কথা ভেবেই বোধহয় প্রৌঢ় মানুষটি তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে ভুল করেছিলেন ইভা কি সে কথা তাঁকে বলেছে! বোধহয় বলেছে, তা না হলে পরদিন তাঁর আর সে বাসনা দেখলুম না কেন! চেরাপুঞ্জির পিকনিকে তিনি আর একটা মেয়েকে সঙ্গে নিলেন, নিজেও গেলেন, আর এক সঙ্গেই কাটালেন সারা দিন। ইচ্ছা করলে সার্কিট হাউসে আমাদের রেখে জাস্তিনাকে নিয়ে তিনি ফিরে আসতে পারতেন, কিংবা অন্য কোন পরীক্ষা। ইভাকে যে ফিরে যেতে দিচ্ছেন না তার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা বুঝতে পারি নে। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে আমি না ফেরা পর্যন্ত ইভা আমার সঙ্গেই থাকবে, আর এমনি করে আমার কাছে আসবে অফিসের কাজের পরে।

এক সময়ে ইভা মুখ তুলে প্রশ্ন করল: আপনি কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

রাগ করব কেন?

অসহায় ভাবে ইভা বলল: আমি যে আপনার কথা শুনি নে, তার জন্যেই ভয় পাই।

তাতে তো আমার কোন ক্ষতি হয় না।

কিন্তু ফার্মের তো ক্ষতি হয়।

আমি বললুম: মিস্টার মর্গান তো তোমার কাছে কাজ নিচ্ছেন, কাজ এক জায়গায় করলেই হল।

ইভা প্রবল ভাবে মাথা দুলিয়ে বলল: সব মিথ্যে কথা, আমি এখানে কোন কাজ করি নে, কোন কাজ নেই আমার।

পরম বিস্ময়ে আমি ইভার মুখের দিকে তাকালুম।

ইভা বলল: মিস্টার মর্গান আমাকে স্নেহ করেন, তাই আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন। আপনি ফিরবার আগে আমি ফিরে গেলে মিস্টার বড়ুয়া আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। মিস্টার মর্গান বোঝেন সেই কথা, সেই জন্যেই আমাকে যেতে দিচ্ছেন না।

ইভার চোখজোড়া আবার ছলছল করে উঠল।

আমি কী বলব ভেবে পেলুম না। অনেক প্রশ্ন আমার মনে জট পাকিয়ে উঠেছিল। মিস্টার বড়ুয়ার কথাই জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল বেশি করে। কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করতে পারলুম না। আমার মনে হল যে ইভা হয়তো আঘাত পাবে তাতে, তার চোখের জল আর বাঁধ মানবে না। কিন্তু—

বিবেকের কাছে আমি একটা ধাক্কা খেলুম। কর্তব্যে আমার ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে হল। এই মেয়েটা তার চাকরির ভয়ে কেন সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে! কেন সে নির্ভয়ে কাজ করতে পারে না! ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বলেই কি মিস্টার বড়ুয়া এই মেয়েটার ভাগ্যবিধাতা! আমি ইতস্তত করলুম একটুখানি, তারপরে বললুম: তোমার সব কথা কি আমায় খুলে বলবে না?

ইভা আর্তনাদের সুরে বলে উঠল: না না, এমন অনুরোধ আপনি আমায় করবেন না।

আমি আর দ্বিধা করলুম না, বললুম : তোমাকে বড় অসহায় মনে হয়, বড় নিঃসঙ্গ, আমার মতোই নিঃসঙ্গ। তাইতেই তোমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছি। আমি কি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি নে?

কোথা থেকে এক ঝলক শীতার্ত বাতাস এল। ইভা তার দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কাছে গিয়ে আমি তাকে সান্ত্বনা দেব, না নিঃশব্দে বসে থাকব দূরে, তা ভেবে পেলুম না। কিন্তু ইভা খুব অল্প সময়েই সামলে নিল নিজেকে, বলল : আমার উপকার করার চেষ্টা আপনি করবেন না। আমাকে শান্তি দিন আপনি, তাতেই আমার ভাল হবে।

এ বড় আশ্চর্য কথা।

পরে আপনি আর আশ্চর্য হবেন না, পরে আপনি সবই জানতে পারবেন। হাত পা আমার বাঁধা বলেই আজ আমার এই অবস্থা। সব নির্যাতনই এখন আমাকে নীরবে সইতে হবে।

ধাঁধা আরও জটিল হচ্ছে, শক্ত হচ্ছে জট। এ জট আমি খুলতে পারব বলে ভরসা হল না। ধীরে ধীরে অন্ধকারে আবৃত হচ্ছিল চারিদিক। দূরের মানুষ আর দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, শুধু আমি আর ইভা এই ওয়ার্ডস লেকের ধারে পাশাপাশি বসে আছি, আমাদের কাছে আর কেউ নেই, কেউ আসবে না, এই অন্ধকারে সবাই এখন আলোকিত পৃথিবীতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আমার জীবনে এখনও নিশ্চিন্ত আশ্রয় মেলে নি, আজও আমি ইভার মতো একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় অস্থির হয়ে থাকি। মনে হল, ইভার সঙ্গে আমি আমার জীবনের একটা মিল খুঁজে পেয়েছি। শুধু নিঃসঙ্গতায় নয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য একটা ভাবনাও আছে। ইভা যদি এই কথা বুঝতে পারত, তাহলে সে আমার কাছে কিছু লুকোত না।

ইভা বোধহয় ওঠবার কথা ভাবছিল, তাকে বাধা দিয়ে আমি বললুম : আজ তোমাকে আমার জীবনের কথা কিছু বলব।

গভীর ভাবে ইভা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমি যে একান্ত ভাবেই একা, তা তোমাকে একদিন হয়তো বলেছি। কিন্তু সত্যিই যদি নিজেকে একা ভাবতে পারতুম তাহলে শান্তি ছিল। মিস্টার মর্গানের মতো আমিও অমন আনন্দে দিন কাটাতে পারতুম।

ইভা বলল : মিস্টার মর্গান তো অত্যন্ত দুঃখী মানুষ। নিজের দুঃখ ভুলে থাকবার জন্যেই তিনি অমন ভাবে থাকেন।

তবু তাঁর একটা শান্তি আছে। ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁর নেই, যে ভাবনা তোমার আছে আমার আছে, আর এমন উৎকট ভাবে আছে যে মনে একটুও শান্তি নেই।

খুব সত্যি কথা।

বললুম : আমার কথা তুমি কিছুই জান না। আমি খুব সাধারণ ঘরের ছেলে, তোমার মতো সাধারণ কাজই এত দিন করতুম। লেখাপড়ায় ভাল ছিলুম বলে এক রকমের সম্মান পেয়েছি, কিন্তু সমাজে কোন প্রতিষ্ঠার আশা করতে পারি নি। পয়সার অভাব এমন অভিশাপ যে মানুষের সমস্ত গুণ সেই অভাবের নিচে চাপা পড়ে। এই দুঃখেই আমি এই চাকরি নিয়ে বিদেশে এসেছি।

ইভা আর কোন কথা কইল না, নীরবে বসে রইল।

বললুম : তোমাদের দেশে সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপরে মানুষের মূল্য নির্ভর করে কিনা জানি না, আমাদের সমাজে এই মনোবৃত্তি খুব দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাপকাঠি হল পয়সা। আমরা জাত নিয়ে গৌরব করতুম, এখন আমরা পয়সা নিয়ে গৌরব করি, পয়সা থাকলেই উঠি জাতে। যত দিন এই নতুন সমাজে প্রতিষ্ঠার লোভ ছিল না তত দিনই আমি শান্তিতে ছিলুম। এখন আর সে শান্তি আমার নেই, লোভ হয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠার।

ইভা এর কারণ জানতে চাইল না, কারণ তাকে আমিই বললুম : ভালবেসেই আমার সর্বনাশ হয়েছে। না না, ভুল হল

কথাটা, নিজের ভালবাসা আমি সংযত করতে পারতুম, তার জন্যে আমার শান্তি নষ্ট হত না। কিন্তু আমি যাকে ভালবাসলুম সে যে আমাকেও ভালবাসল, নিজে অভিজাত ঘরের মেয়ে হয়েও আমার মতো সাধারণ মানুষকেই সে ভালবাসল। ধন নয় মান নয়, শুধু ভালবাসা. তার দাম টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে হয় না। এই ভালবাসার কাছেই যে আমি হেরে গেলুম ইভা, আমার সমস্ত অহংকার গেছে মিলিয়ে। এখন আমার জন্মান্তর হয়েছে।

ইভার মুখ থেকে বেদনার ছায়া কখন অপসৃত হয়েছিল দেখতে পাই নি। এখন তার দু চোখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আমি থামতেই বলল : তবে আর আপনার অশান্তির কী রইল!

আছে ইভা। দিল্লীর যে সমাজের কথা বলছি, এ চাকরির মূলধন সেখানে অচল। সান্ত্বনা এইটুকুই যে যাকে ভালবেসেছি তার কাছে আর কোন পরীক্ষা দিতে হবে না। সে হয়তো নিজেই আমার কাছে নেমে আসবার কথা ভাবছে।

ইভা বলল : আমারও সেই আশা আছে।

আমি আমার কৌতূহল দমন করে বললুম : কী রকম?

ইভা বলল : কোহিমায় কাজ করতে গিয়ে আমার স্বামী হারিয়ে গেছে, আমি জানি সে একদিন ফিরে আসবে। আমি সেই দিনেরই অপেক্ষা করে আছি, আর মানুষ করছি আমার মেয়েটাকে।

মেয়ে কোথায়?

ইভা একটু ম্লান হাসি হেসে বলল : মেয়ে এখানকার কনভেণ্টে আছে।

কত বড় মেয়ে সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করলুম না, ইভার যে বড় মেয়ে আছে সে কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার বয়স আরও কম ভেবেছিলুম। আমি তাকে অন্য প্রশ্ন করলুম : মিস্টার বড়ুয়াকে ভয় পাও কেন?

ইভা আর দ্বিধা করল না, বলল : ভয় পাই অনেক কারণে।

আমার স্বামীর খবর তিনি জানেন। আমাকে লেখা একখানা চিঠি নাকি তাঁর হাতে পড়েছে, তাঁর কথার অবাধ্য হলে সেখানা তিনি ব্যবহার করবেন।

তাতে ভয় কিসের ?

আপনাকে বলতে আর আমার কোন ভয় নেই। বিদ্রোহী নাগারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, পালিয়ে আসবার উপায় নেই বলে সে তাদের লেখাপড়ার কাজ করে দিচ্ছে।

বললুম : বুঝেছি। আর কী কারণে তাকে ভয় করে ?

ইভা বলল : সব কথা শুনলে আপনারও ভয় করবে। আপনার প্রিডিসেসারও মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু মেজাজ খুব কড়া ছিল। মিস্টার বড়ুয়া নিজে ধাক্কা খাবার আগে তাঁকেই ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করলেন।

কেমন করে ?

তাঁর একটা দুর্বলতার কথা মিস্টার বড়ুয়া বুঝতে পেরেছিলেন। তারপরেই তাঁর সঙ্গে আমাকে কয়েকবার বেড়াতে পাঠিয়েই একটা মুখরোচক গল্প চালু করে দিলেন। সত্য কথা কেউ জানল না, আমার নামে কলঙ্ক রটল, আর দিল্লীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

ইভা এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলল। লজ্জা পেল না, সঙ্কোচ এল না, ইতস্ততও করল না একবার। একেবারে অবলীলাক্রমে নিজের কলঙ্কের উল্লেখ করে বলল : এবারে আপনার সঙ্গেও মিস্টার বড়ুয়া সেই খেলা খেলতে চাইছেন। অথচ নিজে তিনি কী চরিত্রের লোক সে কথা তাঁর মনে থাকে না।

ইভা আজ মুখর হয়ে উঠেছে, তাই সে থামল না, বলল : সেদিন মিসেস বড়ুয়া বলে যাকে দেখলেন তিনি তাঁর বিবাহিত স্ত্রী নন। ঐ মহিলা একদিন আমাদের অফিসেই কাজ করতেন। ওঁর স্ত্রী জীবিত থাকতেই তিনি ওই মহিলার সঙ্গে সংসার করতেন কি না সে কথা জানতে চাইবেন না।

ইভাকে আমি সাহস দিয়ে বললুম: মিস্টার বড়ুয়াকে তুমি ভয় পেও না, উনি তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না।

আমি বললুম: শিলঙের অফিসে তুমি চলে এসো না, তোমার মেয়ে তো এখানেই আছে, ভাল লাগবে তোমার।

ইভার মুখে আমি ম্লান হাসি দেখলুম, বলল: সে চেষ্টাও করেছিলাম, মিস্টার বড়ুয়া আমাকে ছেড়ে দেন নি। জোর করলে বিপদ হবে বলে ভয় দেখিয়েছিলেন।

অন্ধকার গভীর হচ্ছিল। হেমন্তের হাওয়ায় এখন শীত বোধ হচ্ছে। ইভা উঠে দাঁড়িয়ে বলল: আসুন, এইবারে আমরা ফিরে যাই।

পথ চলতে চলতে ইভা বলল: আজ আমার মনটা খুব হালকা হয়ে গেল। অনেক দিন আগেই আমি এসব কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারি নি। আজ আপনি নিজের কথা বললেন বলেই আপনাকে সব জানিয়ে দিলাম। মিস্টার বড়ুয়া যে আপনার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করছেন, এ কথা আপনার জানা থাকা দরকার।

ইভাকে আমি তার বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিলুম, বললুম: তোমার কাছে আমি ঋণী রইলুম।

ইভার দু চোখ আবার ছলছল করে উঠল।

বললুম: যদি পারি এই ঋণ আমি শোধ দিয়ে যাব।

তারপরে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলুম না।

২২

গৌহাটিতে আমি আমার পুরনো হোটেলেই ফিরে এলুম। ম্যানেজার আমার সম্বর্ধনার কোন ত্রুটি করলেন না। আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরেছিলুম। ম্যানেজার আমার চা পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই একবার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন: দিন কয়েক থেকে অধ্যাপক হাজারিকা আপনার খোঁজ নিতে আসছেন। আজও এসে পড়তে পারেন।

অধ্যাপক হাজারিকার পরিচয়ও তিনি দিলেন। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক, বয়স কম, ভাল বাঙলা জানেন বলে বাঙালীদের সঙ্গে খুব ভাব। আপনাকেও তিনি জানেন বললেন।

জানেন আমাকে!

তাইতো বললেন। আপনি বই লেখেন না?

ভদ্রলোকের এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এড়িয়ে গেলুম, বললুম: তিনি থাকেন কোথায়? আমিই তাঁর কাছে যেতে পারি।

এ কথা বলতে না বলতেই অধ্যাপক হাজারিকা এসে পড়লেন। বললেন: আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজেই আপনাকে বিরক্ত করতে আসব। শুনলাম একা এসেছেন, তাই সাহস করে সরাসরি এসে পড়লুম।

খুব ভাল করেছেন।

বলে আমি তাঁকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দেব ভাবছিলুম, ম্যানেজার নিজে উঠে তাঁর চেয়ারখানিই এগিয়ে দিলেন, বললেন: আমি এবারে পালাই।

আমি বললুম: একটা চায়ের পেয়ালা পাঠিয়ে দেবেন।

চা খেতে খেতে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি বিজ্ঞানের

অধ্যাপক, কিন্তু সাহিত্যে তাঁর অপরিসীম অনুরাগ, বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যে। আসামের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নাকি বাঙলা বই স্বচ্ছন্দে পড়েন। তিনিও প্রায় সমস্ত ভাল লেখাই পড়েছেন, আমার লেখাও পড়েছেন বললেন।

আমার কথা তিনি কোথায় জানলেন সেইটুকু জানবার কৌতূহল আমার ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলুম : আমার খবর আপনি কোথায় পেলেন ?

ভদ্রলোক হাসলেন একটুখানি, বেশ রহস্যময় হাসি, তারপরে বললেন : সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন : লাইব্রেরিতে খবর পেলুম, নতুন একজন বাঙালী ভদ্রলোক এসে মোটা মোটা আসামের ইতিহাস পড়ছেন। আমি আপনার নাম শুনেই চিনে ফেলেছি।

লজ্জা পেলুম, আনন্দও পেলুম। আমার নাম শুনে লোকে চিনতে পারছে, এই অনুভূতির মধ্যেই এক রকমের আনন্দ আছে। সেই আনন্দ আমার মনেও ছড়িয়ে পড়ল।

অধ্যাপক হাজারিকা সহাস্যে বললেন : একা এলেন কেন ?

বললুম : আমি তো একাই।

এখনও একা আছেন! কিন্তু আমরা আপনাকে একা ভাবতে পারি নে।

ভদ্রলোক বললেন : ওঁরা এখন কলকাতায়, না দিল্লীতে ?

বললুম : বোধহয় দিল্লীতে। কাশ্মীরে ওঁদের ফেলে এসেছি, তারপরে আর খবর পাই নি।

ভদ্রলোক চিন্তিত ভাবে বললেন : অনেক দিন তো হল।

বললুম : তা হল।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মনে মনে আমি খুশী হয়েছিলুম। এঁর কাছে আসামের অনেক খবর পাওয়া যাবে।

ভদ্রলোকও খুব উৎসাহী দেখলুম। মনের বাসনা তাঁকে জানাতেই রাজী হয়ে গেলেন, একগাল হেসে বললেন : আমি বিজ্ঞানের লোক, আমার জ্ঞান তো সামান্য, তবু আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। দরকার হলে যোগ্য ব্যক্তিকে এনে হাজির করব।

খুশী হয়ে আমি বললুম : আজ তাহলে অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস দিয়েই শুরু করা যাক।

আজই! না না, আজ আপনি ক্লান্ত আছেন, আমি কাল আসব।

ক্লান্ত কেন, শিলঙ থেকে ফিরলুম বলে! এ তো চমৎকার জানি! সুস্থ শরীর, মন প্রফুল্ল, সাহিত্য আলোচনার জন্যে আর কী চাই!

ভদ্রলোক একটুখানি বিব্রত বোধ করেছিলেন, তারপরে বললেন : একটুখানি যে তৈরি হয়ে আসব তার সময় দিলেন না। নিউক্লিয়ার উয়েপনের ওপর আলোচনা তো নয়, এ হল অনধিকার চর্চা। সাহিত্যের কতটুকুই বা আমি জানি!

আমিও তো সাহিত্যের ইতিহাসে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হতে চাইছি না। নিজের দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার যা জানা আছে, সেটুকু জানলেই আমার চলবে।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন : বসুন একটুখানি, আমি আসছি।

বলে বেরিয়ে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই কয়েকখানা কাগজ হাতে ফিরে এলেন। বললেন : হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। আসামের খবরের কাগজ দেখুন—ইংরেজী দৈনিক দি আসাম ট্রিবিউন, অসমীয়া ভাষায় দৈনিক অসম আর সাপ্তাহিক অসম বাণী।

অসম বাণী কাগজটি ব্লিৎস বা দর্পণের মতো আকারে, সুমুদ্রিত কাগজ। রঙালী বিহু বিশেষ সংখ্যাও একখানা এনেছিলেন, তার আকারপ্রকার শারদীয় দেশ বা অমৃতের মতো। পাতা উলটে দেখলুম যে হরফ একেবারে বাঙলার মতোই, তফাত শুধু ব আর

র-এ। অন্তস্থ ব-এর নিচে র-এর মতো বিন্দুর বদলে একটা হাইফেন, আর র-এর পেট কাটা। তাইতেই রঙালীকে বঙালী মনে হচ্ছে।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন: উচ্চারণেও একটু প্রভেদ আছে। ত বর্গের স্থানে ট বর্গের ও ট বর্গের স্থানে ত বর্গের প্রাধান্য, চ-এর বদলে শ ও শ স্থানে হ। ভদ্রলোক ফোনেটিক্স্ নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করলেন না, বললেন: সমস্ত দেশের সাহিত্যের মতো অসমীয়া সাহিত্যেরও কয়েকটা যুগ আছে বলে শুনেছি। শৈশবটা খুবই প্রাচীন সন্দেহ নেই, তারপরে কন্দলী যুগ, বৈষ্ণব যুগ তার পরে। বুরঞ্জি সাহিত্যেরও একটা যুগ ছিল বলতে পারেন। আধুনিক সাহিত্যে আছে জোনাকি যুগ।

আমি বললুম: তার আগে ভাষার সম্বন্ধে কিছু জানবার আগ্রহ ছিল।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন: আসামে অনেক ভাষা আছে, তার মধ্যে অসমীয়া হল প্রধান ভাষা। এই ভাষা বাঙলার মতো মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ বলে শুনেছি। নব্য ইন্দো-আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেও শব্দে ও ব্যাকরণে ভোটবর্মীর প্রভাব নাকি লক্ষ্য করা যায়, কিছু অস্ট্রিক প্রভাবও আছে। অনেক অসমীয়া শব্দে ভাষাবিদরা এর প্রমাণ পেয়েছেন। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরপূর্ব বাঙলার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার প্রভেদ খুব স্পষ্ট ছিল না। তার পর থেকেই অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের আরম্ভ।

ভাষা সম্বন্ধে এর বেশি কিছু যদি জানতে চান তাহলে আপনার কাছে অসমীয়া ভাষার কোন অধ্যাপককে এনে হাজির করব।

বললুম: বাঙলা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে আমারও এই ধারণা হয়েছিল। এর বেশি জানবার প্রয়োজন আমার নেই। এইবারে আপনি সাহিত্যের যুগের কথা বলুন।

অধ্যাপক আমাকে একে একে সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের কথা বললেন। সকল দেশের সাহিত্যের মতো অসমীয়া সাহিত্যেরও

প্রথম যুগ হল গীতি যুগ। এই যুগের বিহু গান ডাকের বচন ও ছড়াগুলি মুখে মুখেই চলে আসছে। এদের রচনাকাল সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে বলে অনুমান করা হয়। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, তাকে মন্ত্র আর ভণিতার যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

গীতি যুগের কাহিনী ও উপাখ্যানগুলি আজও জনসাধারণের মনোরঞ্জন করছে। রুক্মিণীহরণ কুমরহরণ চন্দ্রাবলীর উপাখ্যান হরগৌরীর বিয়া রামসীতার বিয়া প্রভৃতি বিয়ানাম কবিতাগুলি পল্লীগ্রামে অমর হয়ে আছে। বিহুগীতি বেশির ভাগই আদিরসাত্মক। সাহিত্যের আলোচনায় তা টেনে আনার সার্থকতা নেই।

এই মন্তব্য শুনে আমি বললুম: বিহু গীত ও বিহু নাচের সম্বন্ধে আমি আর একদিন আপনার কাছে শুনব। বিহু সম্বন্ধে বাঙালীদের একটা কৌতূহল আছে।

অধ্যাপক রাজী হলেন, বললেন: যতটুকু জানি আপনাকে বলব।

তারপরে মন্ত্র আর ভণিতার যুগের কথা বললেন। নবম ও দশম শতাব্দীতে কামরূপ শ্রীহট্ট ও আসামের আরও অনেক অঞ্চলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা প্রসার লাভ করেছিল। এই সময়ে আসামে বহু তন্ত্রমন্ত্রের প্রচার ছিল, তারই ব্যাখ্যা ও প্রকরণ নানা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হয়ে এক বিরাট মন্ত্রসাহিত্য গড়ে উঠেছিল। এই সব মন্ত্র পদ্যে আছে, গদ্যেও আছে। চিরিকিকুমার বড়ুয়া বিষয়ভেদে এই সব মন্ত্রকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন—পাপমুক্তি ও ব্যাধি উপশমের মন্ত্র, ভূতপ্রেত তাড়াবার মন্ত্র, বিষ হরণের মন্ত্র, গ্রহদোষ ও পশুভয় নিবারণের মন্ত্র ও অন্যান্য নানা ধর্মের মন্ত্র। এর মধ্যে জন্ম মৃত্যু বিবাহেরও মন্ত্র আছে, মন্ত্র আছে বৃক্ষরোপণ গৃহকম্পন তাম্বুলঝরা ও পুষ্পঝাড়ার মন্ত্র। পুষ্পঝাড়ার মন্ত্র শুনবেন? ছেলেবেলায় আমরা মুখস্থ করেছিলাম।

আমি বললুম: বেশ তো, বলুন না।

ভদ্রলোক মন্ত্রটি আমাকে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে শোনালেন।—

ডাহিন হাতে মালতী বাম হাতে পুষ্প চয়
আচোক মনুষ্য দেবতা কাম্পয়
কম্পো অস্তগিরি করে টলবল
পাতালর পরা আসি নিকালিন জল
লং ইতি পুষ্প ঝারণং।

এই মন্ত্র শুনে আমি হাসলুম। ভদ্রলোক বললেন: হাসবার মতোই মন্ত্র। ছেলেবেলায় আমরা তো গ্রামে মানুষ হয়েছি। এ রকম মন্ত্র আমার আরও জানা আছে। নামেই মন্ত্র।

তারপরে অধ্যাপক আমাকে ডাক-ভণিতার কথা বললেন। জন্ম-প্রকরণ ধর্মপ্রকরণ কৃষিলক্ষণ গৃহিণীলক্ষণ ইত্যাদি। সুগৃহিণীর লক্ষণ শুনেও আপনি হাসবেন।—

পতিপদ বিনে আনত নাই মতি
গৃহে বাতি দেই সন্ধ্যাবেলাত
রন্ধন করয় বচণ মিঠ
সেই গৃহিণীক বোলয় ইষ্ট।

অথবা—

শাশুরীত পুছি করে আয় ব্যয়
সে নারীক সদা লক্ষ্মী নেরয়।

তারপরেই ভদ্রলোক সচেতন হয়ে বললেন: এ ভাবে সাহিত্যের ইতিহাস বললে আজ সারা রাতেও শেষ হবে না। আমি সংক্ষেপে বলি।

বললুম: তাই বলুন।

অসমীয়া ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা হয়েছে প্রাক্ বৈষ্ণবী 'কন্দলী' যুগে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কামতাপুরের রাজা ছিলেন দুর্লভনারায়ণ। তাঁরই সভায় কবি ছিলেন হেম সরস্বতী ও হরিহর বিপ্র। হেম সরস্বতীর পুরাণাশ্রিত প্রহ্লাদ চরিত্র

একখানি বিখ্যাত কাব্য। হরিহর বিপ্র রামের সঙ্গে লব-কুশের যুদ্ধ ও অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। মাধব কন্দলী পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি রামায়ণের পাঁচটি কাণ্ড মনোরম ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাকি দুটি কাণ্ডের অনুবাদ করেন শঙ্করদেব ও মাধবদেব।

রুদ্র কন্দলী এ যুগের আর একজন খ্যাতিমান কবি। তিনিও পুরাণ ও মহাভারতের ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, সাত্যকি প্রকাশ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। কন্দলী উপাধির আরও অনেক কবি ছিলেন বলে এই কন্দলী উপাধি কোথা থেকে এল এ নিয়েও কিছু গবেষণা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে তর্কে বা কন্দলে পটু বলে কন্দলী নাম। মাধব কন্দলীর নামেই যুগের নাম।

আসামের শঙ্করদেব ছিলেন বাঙলার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বৈষ্ণব যুগের সূত্রপাত। তিনি ও তাঁর প্রিয় শিষ্য মাধবদেব শুধু বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, অনেক কাব্য নাটক ও গান রচনা করেছেন। এই গানগুলি বরগীত নামে প্রসিদ্ধ। 'কীর্তনঘোষা' যেমন শঙ্করদেবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তেমনি 'নামঘোষা' মাধবদেবের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

আরও অনেক কবি এই যুগে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁদের নাম মনে রাখা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।

এই পর্যন্ত বলে অধ্যাপক হাজারিকা কিছু ভাবতে লাগলেন। আমার মনে হল যে তিনি কয়েকজন কবির নাম মনে করবার চেষ্টা করছেন। তাই বললুম: কবির নামে আমার প্রয়োজন নেই, আপনি তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যের কথা বলতে পারেন।

অধ্যাপক বললেন: আমি তাই ভাবছি। আমার যত দূর মনে পড়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাটকেই অসমীয়া গদ্যসাহিত্যের সূচনা। এই সময়ে গদ্যে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও হয়েছে। তারপরেই বিস্তারের যুগ, বুরঞ্জি সাহিত্য এ যুগের প্রধান রচনা।

অধ্যাপক বললেন: অসমীয়া গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কী বলেছেন বোধহয় জানেন। তিনি বলেছেন যে ষোড়শ শতাব্দীতে অসমীয়া গদ্যের মতো উন্নতি এক ইংলণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় নি। এই সময়ে লিখিত অসমীয়া 'কথা-গীতায়' গদ্যরীতির যে মান লক্ষ্য করা যায়, বাঙলা সাহিত্য সেখানে পৌঁছেছে ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমের সময়।

আমি এ কথা শুনি নি। এই মন্তব্যের সত্য যুক্তি যাচাই করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কোন উত্তর দিলুম না।

অধ্যাপক হাজারিকা এবারে আধুনিক সাহিত্যের কথায় এলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম বৃটিশ অধিকারে আসে, তার দশ বৎসর পরেই বাঙলা ভাষা অসমীয়া ভাষার স্থান অধিকার করে। স্কুলে ছাত্ররা বাঙলা শিখবে, আর আদালতের কাজকর্ম হবে বাঙলায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসামে এই অবস্থা চলেছিল। আনন্দরাম ফুকন ও বিদেশী মিশনারীদের চেষ্টাতেই অসমীয়া ভাষা পুনরায় সরকারী ভাষা হয়। মার্কিন মিশনারীরা শিবসাগর থেকে 'অরুণোদই' নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন তাতেই হয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্চার। এই সময়ের প্রধান সাহিত্যিক হলেন আনন্দরাম ফুকন হেমচন্দ্র বড়ুয়া ও গুণাভিরাম বড়ুয়া। হেমচন্দ্র ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেন, তিনি উপন্যাস ও নাটকও লিখেছেন। গুণাভিরাম ঐতিহাসিক ও চরিতকার।

এর পরেই 'জোনাকি' যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা থেকে যাঁরা অসমীয়া ভাষায় 'জোনাকি' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন লক্ষ্মীনাথ

বেজবড়ুয়া চন্দ্রকুমার আগরওয়াল ও হেমচন্দ্র গোস্বামী। লক্ষ্মীনাথই আসামের সাহিত্য-সম্রাট। কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক ও প্রহসন লিখে তিনি এ কালের ভাবনাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রকুমার আগরওয়াল রোমান্টিক কবি এবং হেমচন্দ্র গোস্বামী প্রথম সনেট লেখেন, গদ্য রচনাতেও তাঁর শক্তি আজও স্বীকৃত। আরও কয়েক জন লেখক এ যুগে নাম করেছিলেন।

'জোনাকি' পত্রিকা এমন একটি আদর্শ স্থাপন করেছিল যে বিংশ শতাব্দীর নবীন লেখকেরা তারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অসমীয়া সাহিত্য সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত।

অধ্যাপক বললেন: এ যুগের সমস্ত কবির নাম আমার মনে নেই, মনে রাখা সম্ভবও নয়। কিন্তু কয়েকটি নাম কিছুতেই ভোলা যায় না। কে বড় আর কে ছোট, তার বিচার সাহিত্যের ইতিহাস লেখক করবেন। আমি আপনার কাছে কয়েকটি নাম করব।

আমি বললুম: সেই নাম কটি জানলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট জানা হবে।

ভদ্রলোক বললেন: সকলের আগে আমি রঘুনাথ চৌধুরীর নাম করব। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তিনি প্রকৃতির কবি, 'বিহগ কবি' নামে পরিচিত। তারপরেই অম্বিকাগিরি রায়চৌধারী, তিনি প্রিয় হয়েছেন স্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখে। যতীন্দ্রনাথ দুওরা লিখেছেন 'ওমর-তীর্থ' ও 'মিলনের সুর', সে কবিতার সুর ওমর খৈয়াম ও হাফিজের মতো। দেবকান্ত বড়ুয়ার নামও উল্লেখযোগ্য।

এই সময়েই নাটক লিখে নাম করেছেন অতুলচন্দ্র হাজারিকা ও জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার পরে দৈবচন্দ্র তালুকদার ও দণ্ডিনাথ কলিতার নাম করা যেতে পারে। ছোট গল্পের শাখা এই তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আসামের সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক ক্ষতি

হয়েছে। কিছু সাময়িক পত্রিকা ছাড়া উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থের প্রকাশ এক রকম বন্ধ ছিল। তারপরে যে সাহিত্যিকরা এগিয়ে এলেন তাঁদের রচনায় দুঃসাহসী অগ্রগতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দেরই প্রভাব পড়ে নি, ফরাসী ও জাপানী কবির প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে। সার্থক উপন্যাস রচনাও আরম্ভ হয়েছিল। উপন্যাস ও ছোট গল্পে সাহিত্য ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে।

তুলনায় নাট্যসাহিত্য কিছু অনাদৃত। তার প্রধান কারণ হল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অভাব। শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের কাছে ঐতিহাসিক নাটকগুলিই আজও প্রিয় হয়ে আছে। কিছু সামাজিক নাটক ও একাঙ্কিকা অবশ্য লেখা হচ্ছে, কিন্তু তেমন জনপ্রিয় নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি বললুম: কলকাতায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আছে, কিন্তু নাটকের দৈন্য তবু ঘোচে নি বলে শুনতে পাই। কলমে যাঁর জোর আছে, নাটক রচনায় তিনি মনোযোগী নন।

অধ্যাপক বললেন: আশ্চর্য!

আমি বললুম: আশ্চর্য কিছুই নয়। এ যুগে কালিদাস সেক্সপীয়র বা বার্নার্ড শ আর জন্মাবেন না। তার জন্যে দুঃখ করবার কিছু নেই। সাহিত্যের ধারা পালটে গেছে।

অধ্যাপক বললেন: আমারও তাই মনে হয়। উপন্যাস এ যুগে নাটকের স্থান অধিকার করেছে। তাই উপন্যাস ভেঙে নাটক হচ্ছে, চলচ্চিত্রের গল্পও হচ্ছে।

তারপরে তিনি আমাকে গদ্য-সাহিত্যের কথা বললেন। এই শাখাটি খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। শিক্ষিত সমাজ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে উৎসাহী নন, প্রবন্ধ সমালোচনা ও জীবনীগ্রন্থ অল্পস্বল্প রচিত হচ্ছে।

তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন: এখনও

আমরা আপনাদের লেখা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ছি, এদেশের দু-একজন অবশ্য বিদেশের উপর ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন।

আমি লক্ষ্য করলুম যে একেবারে সাম্প্রতিক কালে এসে তিনি কোন লেখকের নাম করলেন না, সমস্ত নামই তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা না করে আমি থাকতে পারলুম না। ভদ্রলোক বললেন: তাতে আমার বিপদ হত। প্রথমত সঠিক ভাবে সব নাম আমি বলতে পারতাম না, দ্বিতীয়ত আধুনিক লেখকের শক্তির বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার বিপদ হত অন্য কারণে।

বলে তিনি আবার হাসলেন।

আমি বললুম: আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?

একেবারে খাঁটি কথা। আপনার আসাম ভ্রমণে যদি আমার নামটা এই প্রসঙ্গে উঠে পড়ে, তাহলে দু-চারটে লাঠি আমার পিঠে পড়বেই।

আমিও হেসে বললুম: কেন?

অনধিকার চর্চার জন্যে।

বলে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন

২৩

পরদিন অফিসে চিঠিপত্রের মধ্যে চাওলার একখানি চিঠি পেলুম। নীল খামের চিঠি, উপরে 'পার্সোনাল' লেখা। পোস্টঅফিসের ছাপ দেখে বুঝলুম যে চিঠিখানা দিন কয়েক আগে এসে এখানে পড়ে আছে, শিলঙে কেউ পাঠিয়ে দেন নি। অন্য সব চিঠি ফেলে রেখে আমি চাওলার চিঠিখানিই আগে খুলে পড়লুম।

সে একটা দুঃসংবাদ দিয়েছে, গভীর উদ্বেগের খবর। কাশ্মীর থেকে সবাই দিল্লী এসে অনেকদিন আগেই পৌঁছেছেন, কিন্তু মামা অসুস্থ। শ্রীনগরেই তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল, বুকে একদিন একটা বেদনা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করেন নি। দিল্লীতে পৌঁছেই সেই বেদনাটা বেড়েছিল, ডাক্তার পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে কোন মারাত্মক রোগ ধরা পড়ে নি, কিন্তু তার আগে সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

চাওলা লিখেছে, দোস্ত্, তোমার মামী তোমাকে 'তার' করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতি কিছুতেই রাজী হয় নি। সে বলেছে, দিল্লীর মতো শহরে আমরাই ব্যবস্থা করতে পারব, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। মিত্রাকে নিয়ে আমি প্রায়ই যাচ্ছি, সাহস দিচ্ছি তাঁদের, কিন্তু চাঙ্গা করে তুলতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে পেলেই স্বাতির মা বল-ভরসা পাবেন। কিন্তু দোস্ত্, আমার কথায় তুমি চলে এস না, সে খুব কাঁচা কাজ হবে। ভদ্রলোকের শরীরের অবস্থা এমন গুরুতর নয় যে কাজকর্ম ফেলে তোমার চলে আসা উচিত, ওঁদের আহ্বানে এলে তোমার দাম বাড়বে।

চিঠিখানা পড়বার পরে আমি অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত বিষয়টা

ভাবলুম। কোন মারাত্মক রোগ নয়, কিন্তু চিকিৎসকরা তার পদক্ষেপের সম্ভাবনার আশঙ্কা করেছেন। তারই জন্যে বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে তাঁরা উপযুক্ত চিকিৎসা করছেন। মামার খবর আমি অনুমান করতে পারি নি। আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর পাতানো সম্বন্ধ ছিল, আমার মাকে তিনি দিদি বলতেন। কাজেই বয়স তাঁর ষাট হয় নি, পঞ্চাশের উপরে হয়তো কয়েক বছর হয়েছে। দেহ একটু ভারি বলেই বয়সটা বেশি মনে হয়, তাই বলে অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়। মামী ভয় পেয়েছেন, পাবেনই। যে কোন মহিলাই এই অবস্থায় ভয় পেতেন। কিন্তু স্বাতি ভয় পেল না কেন, তার সাহসটা কোন্‌খানে!

মাঝে মাঝে সংশয় আসে মনে, নানা ধরনের সংশয়। এই তো সেদিন আমি ওয়ার্ডস লেকে বসে স্বাতির সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম ইভাকে, সে সব কি সত্য নয়! স্বাতি কি আমার জন্য আর অপেক্ষা করছে না! অপদার্থ বলে তার মনের পাতা থেকে আমার নামটা কেটে দিয়েছে! জানি না সে কী করবে, কোন্‌ আলোতে জ্বলবে তার জীবনের প্রদীপ।

আমি অন্যমনস্ক ছিলুম, ভুলে গিয়েছিলুম অন্য চিঠিপত্রগুলি খোলবার কথা। মিস্টার বড়ুয়া হঠাৎ দরজা ঠেলে ভিতরে এলেন। তাঁর জুতোর শব্দ পেয়েই আমি ব্যস্ত হবার ভান করলুম। যেন অনেকক্ষণ থেকেই ব্যস্ত আছি।

মিস্টার বড়ুয়া বললেন: শিলঙের খবর সব ভাল তো?

সংক্ষেপে বললুম: ভাল।

বাড়ির খবরও ভাল?

আমার কানে এই প্রশ্নটি সন্দেহ জাগাল। কিন্তু তা বুঝতে না দিয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলুম: হ্যাঁ।

মিস্টার বড়ুয়া আমার সামনের চেয়ারে খানিকটা বসলেন, দু একটা কাজের কথা বললেন, তারপর উঠে চলে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পরে চাওলার খামখানা আমি পরীক্ষা করে দেখলুম। কিন্তু সেখানা খুলে পড়বার কোন চিহ্ন দেখতে পেলুম না।

অফিস থেকে হোটেলে ফিরে সমস্ত মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে রইল। মনে হল, আমার জীবনের উপর দিয়েই যেন একটা বিপর্যয় হয়ে গেছে। যোগ্যতা দিয়ে জীবনকে জয় করব, এমনি একটা দৃঢ়তা নিয়ে এতদিন চলেছি। কোন পঙ্গু জীবনকে জয়ের বাসনা আমার ছিল না। আজ মনে হল যে সে সুযোগ আমি চিরদিনের মতো হারালুম। ভয়ে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি হয় অন্তর্হিত, রাগ দ্বেষ স্তিমিত হয়ে যায়। মামা মামীর বেলাতেও তাই হবে। এই সামান্য ধাক্কাতেই তাঁদের মনোবল ভেঙে যাবে। চাওলা তার ইঙ্গিত দিয়েছে। মামী আমাকে ডেকে পাঠাতে চেয়েছিলেন, এই চাওয়ার পিছনে যে ব্যাকুলতা আছে আমি তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু স্বাতির আপত্তির কারণ আমি বুঝতে পারি নে। চাওলা যে কারণে আমাকে যেতে বারণ করেছে, স্বাতির আপত্তিও হয়তো সেই কারণে হতে পারে। কিন্তু যদি অন্য কোন কারণ থাকে!

আমি একখানা বইয়ের পাতায় মন দেবার চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু মন আমার বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল, কিছুতেই আমি মনোযোগ দিতে পারছিলুম না।

এক সময় বেয়ারা এসে খবর দিল যে অধ্যাপক হাজারিকা দেখা করতে এসেছেন। গতকালের মতো তিনি আজও ঘরের দরজায় এসে পড়েছিলেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ভিতরে আসতে বললুম।

অধ্যাপক নমস্কার করে বললেন: আজ আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

বিরক্ত নয়, উপকার করতে এলেন বলুন।

আপনি উপকার ভাবছেন, আমি ভাবছি বিরক্ত করা। সারাদিন খেটেখুটে এসে এখন একটু আরাম করবেন, তা নয়, এখন আপনাকে অত্যাচার সইতে হবে।

আমি বললুম: আপনি না এলে আমাকে এই জগদ্দল পাথরটা সামলাতে হত, সে যে কত কঠিন কাজ তা বুঝতে পারছেন তো!

বলে মোটা বইখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বইখানা হাতে নিলেন, তারপরে উলটে-পালটে দেখে বললেন: সত্যিই কঠিন কাজ।

হেসে বললুম: তাহলে আসুন, মন খুলে একটু গল্প করা যাক।

বেয়ারা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে কফি আনতে বললুম।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন: কাল বড় বিপদে ফেলেছিলেন, আজ তাই তৈরি হয়ে এসেছি।

কী রকম?

ভদ্রলোক বললেন: কাল বিহু নাচগান সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিলেন, আজ তাই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে এসেছি।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন: কালও পড়েশুনে এসেছিলাম, আপনার প্রকৃতি তো জানা আছে। বলা যায় কী!

বলে ভদ্রলোক হাসলেন। আমিও হাসলুম।

বিহু নাচগান সম্বন্ধে কিছু শোনার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। তাই বললুম: সে কথা উপভোগ করার মতো মুড আজ নেই, আপনি অন্য কথা বলুন।

ভদ্রলোক কিছু লজ্জা পেয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমিও লজ্জা পেলুম। বললুম: অন্য কিছু নয়, আজ একটু ধর্মকথা শোনবার ইচ্ছে।

অধ্যাপক আশ্বস্ত হয়ে বললেন: বিপদের কথা। ধর্ম জিনিসটা ভাল বুঝি নে বলে দূর থেকেই নমস্কার করি। আপনার অভিপ্রায়

আগে জানতে পারলে মহেশ্বরবাবুর কাছে তালিম নিয়ে আসতাম। শঙ্করদেবের জীবনী লেখবার জন্যে তিনি ধর্ম নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছেন।

ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়ার বিপদ আছে। গলা সাধতে সাধতেই শেখবার ইচ্ছা যাবে ফুরিয়ে। তার চেয়ে সরাসরি নেমে পড়ুন। আপনার শ্রোতা একেবারেই অজ্ঞ।

অধ্যাপক হেসে বললেন: বলেছি তো. এখন তা সুবিধের হলেও পরে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

তারপরে তিনি শঙ্করদেবের কথা আরম্ভ করলেন।

গুরুজন কথা চরিত্র নামে একখানি কাব্যে কামতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের কথা জানা যায়। তিনি অতি পরাক্রান্ত ছিলেন এবং গৌড়ের রাজা ধর্মনারায়ণের সঙ্গে একবার প্রবল যুদ্ধ করেন। দুপক্ষেরই অনেক সৈন্য হতাহত হল এবং একদিন রাত্রে দুজনেই একটা স্বপ্ন দেখে সন্ধি করলেন। ধর্মনারায়ণ কামতা রাজ্যের অবস্থার বিষয় জেনে দুর্লভনারায়ণকে সাতজন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করে গেলেন। এঁদের মধ্যেই প্রধান বারোজনকে বারো ভূঞা বলা হত। চণ্ডীবর নামে একজন কায়স্থ সবচেয়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলে তিনি রাজার কাছে শিরোমণি ভূঞা উপাধি পেয়েছিলেন। শঙ্করদেব এই চণ্ডীবর শিরোমণি ভূঞার বংশধর।

চণ্ডীবরের জীবনে অনেক উত্থান পতন হয়েছে, সে সব কথা বুরঞ্জিতে পাওয়া যায়।

বলে অধ্যাপক হাজারিকা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: বেশ তো, বলুন না সেই উত্থান পতনের কথা।

অধ্যাপক বললেন: বুরঞ্জিকাররা মনে করেন যে গৌড়েশ্বর যাঁদের রেখে গিয়েছিলেন সেই বারো ভূঞা এদেশে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, হয়তো ছোটখাট সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু চণ্ডীবর যে খুব ধার্মিক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কায়স্থ হয়েও তিনি

দেবীর পূজক ছিলেন এবং লোকে তাঁকে দেবীদাস বলত। এই সময় কোচ জাতির প্রভাব বাড়ছিল বলে রাজা দুর্লভনারায়ণ বারো ভূঞাকে ভূসম্পত্তি দিয়ে নিজের রাজ্যে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্পত্তি পেয়েই তাঁরা নিজেদের পরিবার আনবার জন্য দেশে ফিরে গেলেন। ধর্মনারায়ণ এঁদের ফিরে আসতে দেখে সবাইকে বন্দী করলেন। চণ্ডীবরও বন্দী হয়েছিলেন, তারপরে এক কাশীবাসী দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করে মুক্তি পান। রাজা তাঁকে পুরস্কার দিয়ে কামরূপে পাঠিয়ে দেন।

চণ্ডীবর কামরূপ পর্যন্ত ফিরতে পারেন নি। পথে গন্ধর্ব রায়-চৌধুরীর রাজ্যে সসম্মানে আটকা পড়েন। এইখানেই তাঁর পুত্র রাজধরের জন্ম। কিছুদিন পরে ভুটিয়াদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তাতে গন্ধর্ব রায় পালিয়ে যান, এবং শিশু রাজধর ভুটিয়াদের হাতে পড়ে। চণ্ডীবর যুদ্ধ করে রাজধরকে উদ্ধার করেন। এই নিয়ে ভুটানরাজের সঙ্গে অনেক দিন গোলমাল চলেছিল। চণ্ডীবর গন্ধর্ব রায়ের রাজ্য ত্যাগ করে যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আবার আক্রান্ত হন। যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে রাজধর হয়েছিলেন শিরোমণি ভূঞা। শঙ্করদেবের পিতামহ ইনি। কুসুম্বর শিরোমণি শঙ্করদেবের পিতা।

এই সময়ে আসামের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। হিউএন চাঙ যখন কামরূপে এসেছিলেন, তখন এ রাজ্যে হিন্দু প্রাধান্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে এখানেও যে বৌদ্ধ প্রভাব খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। শঙ্করাচার্যের প্রভাব এখানে পৌঁছেছিল, এই প্রসঙ্গে দেবেশ্বর নামে একজন শূদ্র রাজার কথাও আমরা জানতে পারি। কিন্তু কামরূপ থেকে বৌদ্ধধর্ম দূর হতে অনেক সময় লেগেছিল, ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো অত শীঘ্র এই রাজ্য বৌদ্ধ প্রভাবমুক্ত হতে পারে নি। একাদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ-প্রাধান্য দেখি। তার প্রমাণ আছে হাজোতে, সেখানে আমরা

যে হয়গ্রীবের মূর্তি দেখি, তা বুদ্ধমূর্তি বলে অনেকেই স্বীকার করেন। যোগিনীতন্ত্র কামরূপের একখানি প্রাচীন ও প্রধান তন্ত্র। এই তন্ত্রেও নাকি বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধধর্মের কথা আছে।

যোগিনীতন্ত্রের কথায় কামরূপে তান্ত্রিক প্রাধান্যের কথাও এসে পড়ে। তন্ত্রাচার এদেশে কীভাবে এসেছিল আমার জানা নেই, তবে তিব্বতেও ঠিক এই জিনিস দেখা গেছে। তিব্বত থেকে তন্ত্রাচার ভারতে এসেছে, না ভারত থেকে গেছে তিব্বতে, সে কথা পণ্ডিতরা বলতে পারেন। কিন্তু এই দুটো ধর্মই যে এক সময় বিকৃত হয়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কামরূপেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব করে এক রকম বিকৃত তন্ত্রাচার সমস্ত কামরূপ রাজ্যে অতি প্রবল হয়ে উঠেছিল, ধর্মের নামে ব্যভিচারে দেশ কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। এই সব কথা আমরা জেনেছি দ্বিজ রামানন্দ রচিত শঙ্করদেবের জীবনী পড়ে। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি অনেক বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। কিছুদিন আগেও নাকি রাতিখোয়া ও ভোগীদলের কথা শোনা যেত। শুনে আশ্চর্য হবেন যে বৈষ্ণব ধর্মেও নাকি এই তন্ত্রাচার ঢুকে পড়েছে। অরীতিয়া বা পূর্ণসেবা নামে একটি ধর্মমত এ রাজ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাদের ক্রিয়াকলাপ হয় খুবই গোপনে। এই ধর্মাবলম্বীরা দাবী করেন যে শঙ্করদেব যে মত প্রচার করেছেন, তারই পূর্ণ মতের নামই পূর্ণসেবা। তাঁরা জাতিভেদ মানেন না, সবাই একত্র বসে মদ্য মাংস পানাহার করেন। উপাসনার সময় একজন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয়, তাঁর নাম ভক্তিমাতা। বামাচারী তান্ত্রিকদের মতো এই ভক্তিমাতাকেই সবাই দেবীজ্ঞানে পূজা করেন।

আমি আশ্চর্য হলুম এই সম্প্রদায়ের কথা শুনে। জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি দেখেছেন এই সম্প্রদায়ের লোককে?

অধ্যাপক স্বীকার করলেন: দেখি নি, শুনেছি এদের কথা।

পূর্ণসেবাচারীরা নাকি কোনও কথা কারও কাছে প্রকাশ করেন না। কাজেই এই ধর্মমতের ভাল মন্দ কিছুই আমাদের জানা নেই।

তারপর তিনি শঙ্করদেবের কথায় আবার ফিরে এলেন। বললেন: ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেবের জন্ম। তাঁর পিতাকে সাধারণ গৃহস্থ বলা যায় না। ভূঞারা তখন ছোট ছোট এলাকায় রাজত্ব করতেন, তাঁরা সমস্ত তান্ত্রিক রাজাই ছিলেন। কাজেই শঙ্করদেবকে রাজার ছেলে বলা চলে। প্রথম জীবনে তিনি ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, এবং সংসারধর্মই পালন করেছিলেন। তিনি কন্দলী নামে এক পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্যটন করে আসেন। উত্তর ভারতের ভক্ত কবীরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতের আচার্য রামানুজের ধর্মমত তাঁর ভাল লেগেছিল। অনেকে তাঁকে অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য বলেন, তিনি নাকি তাঁরই কাছে এক সময় শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। কিন্তু এ কথার প্রমাণ নেই। তিনি বাঙলার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলে অনেকে তাঁকে চৈতন্যদেবের শিষ্যও বলে থাকেন। প্রমাণের অভাবে এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না। তবে তিনি বৈষ্ণব হয়ে যে এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন তা সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

আসামে এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য শঙ্করদেবকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। আহোমরা তাঁর এই কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর জামাতা হরিকে সামান্য অপরাধে হত্যা করে, এবং তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেবকে বন্দী করে। এই মাধবদেব বাণ্ডুকা গ্রামের দীর্ঘলগিরি নামে এক ব্যক্তির পুত্র। শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে গুরুকে প্রাণপণ সাহায্য করেছিলেন। আহোমদের আচরণে দুঃখিত হয়ে শঙ্করদেব আহোম রাজ্য ছেড়ে পাটবাউসী নামে এক স্থানে এসে বাস করতে থাকেন। মাধবদেবও কোন রকমে মুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন।

কিন্তু সেখানেও তাঁরা শান্তিতে থাকতে পারলেন না। অনাচারী

শাক্ত ব্রাহ্মণেরা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নিকটে গিয়ে নালিশ করলেন। রাজা নরনারায়ণ শঙ্করদেবের ভাই রামরায়ের কন্যা কমলাপ্রিয়া আপীকে বিবাহ করেছিলেন বলে জানা যায়। ব্রাহ্মণদের অভিযোগে তিনি কান দিলেন না, তাঁর রাজ্যেও প্রজারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। আহোমরাও পরে বৈষ্ণব হয়েছিল। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে একশো আঠারো বৎসর বয়সে শঙ্করদেব দেহরক্ষা করেছিলেন।

শঙ্করদেবের পরে মাধবদেব দামোদরদেব প্রভৃতি তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা আসামে বৈষ্ণব ধর্মকে তার বর্তমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাধবদেব মহাপুরুষ গুরু নামে পরিচিত ও তাঁর মতবাদ মহাপুরুষীয়া নামে খ্যাত। এঁদের মধ্যে ঠাকুরীয়া নামে একটি শাখা আছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে আর একটি ধর্মমত বামুনীয়া নামে পরিচিত। আসামের ব্রাহ্মণেরা প্রথমে কায়স্থ শঙ্করদেব প্রবর্তিত ধর্মমত গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। মাধবদেবের পর কয়েকজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হয়ে যে ধর্মমত প্রচার করেন, বামুনীয়া নামে তাই পরিচিত হয়েছে।

একখানা বাঙলা বইএ আমি শঙ্করদেবের ধর্মমতের আলোচনা পড়েছিলুম। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি চৈতন্যদেবের পন্থা অবলম্বন করেন নি। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তিনি মানেন নি। সংসারের মায়া মোহ ও ভোগে নিরত থেকেও যে ভগবানের প্রসাদ পাওয়া যায়, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই মতবাদ ভারতের প্রাচীন সংস্কারের মূলে আঘাত করেছিল বলেই জীবনে তিনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন।

শঙ্করদেব নিজেকে কৃষ্ণের দাস ভাবতেন, এই দাস্যভাব তাঁর মনে প্রবল ছিল। প্রচলিত মূর্তিপূজায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি তাই নামঘর ও নামঘোষায় কীর্তন প্রবর্তন করলেন। গ্রামে গ্রামে সত্র প্রতিষ্ঠিত হল, এই সব সত্র ও পাঠবাটীতে তিনি দেবতার বদলে

শ্রীমদ্ভাগবতের পূজার ব্যবস্থা করলেন। অসমীয়া ভাষায় নিজে অনুবাদ করলেন শ্রীমদ্ভাগবত। বেদান্ত মত ও গীতার উপদেশে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই সব মিলিয়ে তিনি একশরণ নামধর্ম প্রচার করলেন। সব 'সমর্পিয়া একমন হইয়া' আত্মনিবেদনের আদর্শ। ভগবান এক, পুরুষ ও প্রকৃতিতে তার দ্বৈত লীলা। মুক্তির জন্য চাই নাম দেব গুরু ও ভক্তি।—

উপরিবা শাস্ত্রর নীতি হইব ক্ষমাবন্ত অতি
সমস্ত প্রাণীক কর দয়া।
সত্য-শৌচ ধর্ম ধরি মনত জপবা হরি
তেবে না বান্ধিবে বিষ্ণুমায়া॥

শাস্ত্রনীতি উপেক্ষা করবে না, ক্ষমাশীল হবে, দয়া করবে সকল প্রাণীকে। সত্য ও ধর্মানুসারে হরির নাম জপ করলে বিষ্ণুমায়া তোমাকে বন্ধন করবে না। এই ধর্মের শরণ নিয়ে লোকে শরণীয়া হয়েছিল।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন: সেই বিকৃত শক্তিসাধনার যুগে এই নূতন চেতনা একটা দেশব্যাপী জাগরণ এনেছিল। শুধু আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তায় নয়, সাহিত্যে সঙ্গীতে নাট্যে এই নূতন ধর্ম সারা দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শঙ্করদেব পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল গভীর, তাঁর রচিত নাটক ও বরগীতেও এই দার্শনিক গভীরতা সুপ্রকট। তিনি সুরকার ছিলেন, তাঁর অনবদ্য ভাষায় লেখা বরগীতে সুরযোজনা করে তিনি মিশ্ররাগিণীও সৃষ্টি করে গেছেন। মাধবদেবও ছিলেন পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর কাব্যে নাটকে ও বরগীতে ভাবের গভীরতার চেয়ে সরলতাই বেশি লক্ষণীয়। তিনিও গায়ক ও কবি ছিলেন, তাঁর রচনা জনসাধারণের প্রাণের কাছে আরও সহজে পৌঁছেছে। এঁদের লেখা বরগীতিগুলি কবীর দাদু ও মীরাবাঈএর রচনার মতো সরল ও মধুর।

অসমীয়া বৈষ্ণব কবিদের রচনায় একটি ভাব আমরা লক্ষ্য করি। ভগবান এখানে মানুষ নন, তাঁকে আমরা মানুষের রূপে উপাসনা করি না। প্রিয়তম দেবতা নন, দেবতাই প্রিয়তম।—

জয় জগ নায়ক মুকুতিদায়ক সায়ক সারঙ্গধারী।
দুষ্ট অরিষ্টক মুষ্টিকমোড়ন চোড়ন বন্ধ মুরারী॥

শঙ্করদেবের এই কবিতা পড়ে জয়দেবের কথাই কি মনে হয় না!

২৫

পরদিন অধ্যাপক হাজারিকা এলেন না, কী একটা কাজের কথা বলে গিয়েছিলেন। সেই কাজে দু এক দিন ব্যস্ত থাকবেন। শনিবার যদি আসতে পারেন তাহলে রবিবার আমাকে তাঁর বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবেন। তাঁর স্ত্রী ভাল গাইতে জানেন, অসমীয়া গান শোনাবেন আমাকে। আমি বলেছিলুম : যে রকম লোভ দেখাচ্ছেন, পরে হয়তো বিপদে পড়তে হবে। গান শুনতে আমি খুব ভালবাসি।

ভদ্রলোক খুশী হয়েছিলেন আমার মন্তব্য শুনে। বলেছিলেন : তবে ঐ কথাই রইল। এই রবিবারটা আপনি আমার জন্যে রাখবেন।

আমি রাজী হয়েছিলুম তাঁর প্রস্তাবে।

অফিসের কাজ শেষ করে হোটেলে ফিরতে কিছু দেরি হয়েছিল। বড় নিঃসঙ্গ বোধ হল। ভাবলুম, আজ লাইব্রেরিতে গিয়ে খানিকক্ষণ বসব।

নিজের দেশে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারা যায় না। কাজের জন্যেই অনেক সময় অভাব হয় সময়ের। কেন এমন হয় তা বুঝি নে। সময়ের হিসেব রাখতে গেলে দেখা যায় যে কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে তারই হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। বিদেশে ঠিক উলটো। সময় যেন কাটতেই চায় না। দেশে যতটুকু কাজ করেছি, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করছি। কাজে আমার নিষ্ঠা দেখে অনেকেই আশ্চর্য হচ্ছে। অনেকের মুখ দেখেই আমি এ কথা বুঝতে পেরেছি। হাবেভাবেও বুঝেছি খানিকটা। তবু আমার সময় ফুরোতে চায় না। অফিসের কাজের পরেও আর একটা কাজের দরকার হচ্ছে। যাদের সংসার আছে, তাদের নানা

ধরনের কাজ। হোটেলের ঘরে বসে আমি কোন কাজ খুঁজে পাই নে। খানিকক্ষণ উসখুস করে আমি বেরবার জন্যে তৈরি হলুম।

ঠিক এই সময়েই একেবারে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এল কাকতি। এ দুদিন তাকে দেখতে পাই নি। তাই সাগ্রহে ডাকলুম: এস এস।

খানিকটা সঙ্কোচ নিয়ে কাকতি এল, বলল: আমি কাল সন্ধ্যাবেলাতেও এসেছিলাম। আপনি ব্যস্ত ছিলেন বলে ফিরে গিয়েছি।

ব্যস্ত আর কী! অধ্যাপক হাজারিকার কাছে আমি আসামের গল্প শুনছিলুম।

উনি অধ্যাপক বুঝি! কটন কলেজের অধ্যাপক?

বললুম: জানি নে। সেকথা আমি জিজ্ঞেস করি নি।

কাকতি বলল: কটন কলেজের না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হবেন। খবর নিলেই জানতে পারব।

আমি বললুম: তাতে আমার দরকার নেই; নামটাও না জানলে আমার চলত। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বাই বড় কথা। পরিচয়টা নয়। অধ্যাপককে আমার ভাল লেগেছে।

কাকতি মাথা নেড়ে বলল: আপনি আবার লেখাপড়া ভালবাসেন কিনা, ও লাইনের লোক আপনার ভাল লাগবেই তো।

আমি বললুম: তারপরে কী খবর বল।

কাকতি বলল: পরশু শনিবার, ভাবছিলাম অফিসের পরে আপনাকে নর্থ গৌহাটিতে নিয়ে যাব।

সেখানেও কিছু দেখবার আছে কি?

পরম উৎসাহে কাকতি বলল: যোগিনীতন্ত্রের মতে কামাখ্যা মণ্ডলে তিনটি তীর্থ আছে—কামাখ্যা উমানন্দ আর অশ্বক্রান্ত। কামাখ্যা আর উমানন্দ দেখা হয়েছে, এবারে অশ্বক্রান্ত। অনেকে অশ্বক্রান্তও বলেন। সেখান থেকে আমরা হাজো ঘুরে আসব।

হাজো নামটি আমার কাছে অপরিচিত ছিল। কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই কাকতি বলল : এই হাজো শুধু হিন্দুদেরই তীর্থ নয়, বৌদ্ধ ও মুসলমানদেরও পবিত্র তীর্থ। প্রতিবারে শীতকালে বৌদ্ধ ভুটিয়ারা দলে দলে আসে পুজো দিতে, আর মুসলমানরা তো হাজোকে বলে পোয়া মক্কা, মক্কায় হজ করার সিকি ফল পাওয়া যায় এখানে হজ করতে এলে। ওরা তো বলে হজ থেকেই হাজো নাম হয়েছে।

হাজো আমি যাই নি, হাজোর কথা আমি কাকতির কাছেই শুনেছিলুম। শনিবার অফিসের ঠিক পরেই সে আমার কাছে চলে এসেছিল। ব্যস্ত ভাবে বলেছিল : আসুন, কেউ আসবার আগেই বেরিয়ে পড়ি।

বেরবার জন্যে আমি তৈরি ছিলুম। বললুম : কেউ আসবে নাকি?

কাকতি বলল : যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই তো সন্ধ্যা হয়। বলা যায় কি, বড়ুয়া সাহেব নিজেই হয়তো এসে পড়তে পারেন।

কেন, খেয়ে ফেলবেন নাকি!

কাকতির অনেক সাহস বেড়েছে দেখলুম। বলল : আমি কেন, সকলেই ভয় পায় তাঁকে। বাগে পেলে কাউকে ছেড়ে দেবেন না।

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য আমি বললুম : খেয়াঘাট পর্যন্ত হেঁটেই যাওয়া যাক, কী বল?

কাকতি আপত্তি করে বলল : না না, এই দুপুর রোদে হাঁটবেন কেন, একখানা রিক্‌শা ধরে নিচ্ছি।

গৌহাটি শহর সম্বন্ধে আমার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছে। শহরের উত্তর দিক জুড়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। এর পরে দক্ষিণে প্রবাহিত হবে যমুনা নামে, আরও দক্ষিণে পদ্মার সঙ্গে তার মিলন। শহরের পশ্চিম প্রান্তে পাণ্ডু, ওপারে

আমিনগাঁও। স্টীমারে যাত্রীপারাপার হয়। ব্রহ্মপুত্রের উপরে রেলের পুল হবার আগে এই দুটি স্টেশনের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পশ্চিম থেকে ট্রেন এসে আমিনগাঁওএ দাঁড়াত, আর আসামের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত পাণ্ডুতে। তখন শুধু স্টীমারেরই ভরসা ছিল। শীতের সময় ব্রহ্মপুত্রের বুকে যখন মস্ত চর পড়ত, তখন কাঠের পুলের উপর দিয়ে পেরতে হত বালির চর, তারপর স্টীমার। এই স্টীমার একেবারে পাণ্ডু স্টেশনের গায়ে এসে লাগত। ছোট স্টেশন, কিন্তু ভাল ওয়েটিং রুম রিটায়ারিং রুম আছে, রিফ্রেশমেণ্ট রুমও ভাল। আসামের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত বলে যাত্রীদের বেশী কষ্ট হত না। তবু এই ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক মনে করা হত না। দেশরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্রহ্মপুত্রের উপর খুব সম্প্রতি পুল তৈরি হয়েছে। তাতে পশ্চিম থেকে ট্রেন আর আমিনগাঁও স্টেশনে আসে না, কিছু দূর আগে থেকেই পশ্চিমে হেলে এই নতুন পুল পার হয়, তারপর পাণ্ডুর দিকে না গিয়ে সরাসরি এসে গৌহাটিতে দাঁড়ায়। এই নতুন ব্যবস্থায় গৌহাটির মান বেড়েছে, আরও বাড়বে। বাঙলাদেশের ফরাক্কায় গঙ্গার উপরে নতুন বাঁধ ও পুল তৈরি হচ্ছে। তখন কলকাতা থেকে ট্রেন ছাড়লে বড় লাইনের গাড়ি সোজা এসে নিউ জলপাইগুড়িতে দাঁড়াবে। গঙ্গার দু ধারেই এখন বড় লাইনের গাড়ি চলছে। নতুন বড় লাইন বসছে আসামের যোগীখোপা পর্যন্ত। যোগীখোপা ব্রহ্মপুত্রের তীরে গোয়ালপাড়ার অপর পারে। অদূর ভবিষ্যতে এই বড় লাইন যে গৌহাটিতে এসে ঢুকবে তাতে সন্দেহ নেই। তখন আমরা কলকাতা থেকে সরাসরি গৌহাটি এসে নামব, মাঝখানে আর খেয়াপার কিংবা গাড়ি বদল করব না।

পাণ্ডু স্টেশন থেকে বেরিয়েই ব্রহ্মপুত্রের উপরে নীলাচল পাহাড়, তারই উপরে কামাখ্যার মন্দির। স্টেশনের পূর্ব দিক এটা। গৌহাটি শহরে যাবার পথ এই পাহাড়কে দক্ষিণে বেষ্টন করে পূর্ব মুখে গেছে। ভরলু নামে একটি ছোট নদী শহরের উপকণ্ঠে

প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। তারপরে গৌহাটির ফ্যান্সি বাজার, কাকতিরা বলে ফাঁসি বাজার। প্রথমটায় এই ফাঁসি শুনে বুঝতে বেশ কষ্ট হয় যে ফ্যান্সিকে ফাঁসি বলছে। দোকানের সাইনবোর্ডে ইংরেজী লেখা দেখে আমি বুঝেছিলুম।

ফ্যান্সি বাজারের পূর্বে পান বাজার। শহরের অভিজাত অঞ্চল এটি। ভাল দোকানপাট হোটেল কলেজ এই অঞ্চলেই। তারপরে হাইকোর্ট আর মিউজিয়ম। উজান বাজার শহরের পূর্ব প্রান্তে। উগ্রতারা ও নবগ্রহের মন্দির এই অঞ্চলে, আর ব্রহ্মপুত্রের উপরে জাহাজ ঘাট। গৌহাটি শহরে খেয়া ঘাট আরও তিনটি আছে। ফ্যান্সি বাজারের কাছে ফেরি ঘাট, পান বাজারে শুক্রেশ্বর ঘাট আর কাছারী ঘাট। নৌকো স্টীমার ও স্টীমলঞ্চ আছে। আমরা একখানা রিক্‌শায় চেপে শুক্রেশ্বর ঘাটে এলুম। তারপর ছোট স্টীমারে চেপে পার হলুম ব্রহ্মপুত্র।

কাকতি বলল: নৌকোয় ব্রহ্মপুত্র পার হতে আপনার ভয় করত। আমাদেরই ভয় করে। বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের যে অবস্থা দেখি, তাতে সারা বছর তার ভয় দূর হয় না।

কাকতি আমাকে হাজোর গল্প শুনিয়েছিল স্টীমারে। হজ্ব থেকে হাজো নাম, এ কথা সবাই মানে না। কোচদের মতো হাজো নামেও একটা জাত ছিল, তাদের বাস ছিল এই অঞ্চলে। কোচরাজ নরনারায়ণ যখন তাঁর রাজ্য দু ভাগে ভাগ করতে বাধ্য হন, তখন এই অংশের নাম হয়েছিল কোচ হাজো। এর থেকেই শহরের নাম হাজো হয়েছে বলে অনেকের অনুমান। এই নাম নিয়ে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পুরাকালে কামাখ্যার ডাকিনীরা অতিরিক্ত উৎপাত আরম্ভ করলে উমানন্দ ভৈরব তাঁদের কামাখ্যা থেকে দূর করে দেন। ডাকিনীরা তখন ব্রহ্মপুত্রের পরপারে হাজো অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। সে সময়ে এক যোগী সেখানে কঠোর তপস্যা করছিলেন। ডাকিনীরা ছলনায় তাঁর যোগ ভঙ্গ করে

যোগী সব বুঝতে পেরে 'হা যোগ, হা যোগ' বলে আক্ষেপ করে সেই স্থান ত্যাগ করেন। সেই হা-যোগ থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে হাজো।

আমিনগাঁও থেকে বারো মাইল পশ্চিমে এই হাজো। বর্ষার সময় ছাড়া আর সব সময়েই মোটর বাস চলাচল করে। হাজোকে শহর বলা চলে না, এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, প্রাচীন ও বিখ্যাত। হাজোর দেবতা হয়গ্রীব মাধবের উল্লেখ যোগিনীতন্ত্রেও আছে।

এই গ্রামের নাম নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি, দেবতা নিয়েও তেমনি। হিন্দুরা বলেন, হয়গ্রীব মাধব হিন্দুর দেবতা। পুরাণে আছে যে হয়গ্রীব বা হয়শিরা নামে এক দৈত্য বেদ অপহরণ করেছিল। তারই বিনাশের জন্য বিষ্ণু হয়েছিলেন হয়গ্রীব মাধব। গ্রীবা তাঁর হয় বা ঘোড়ার মতো নয়, পাথরের মুখ তাঁর প্রশান্ত ও সুন্দর। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের সঙ্গে মিল দেখে বৌদ্ধরা এই মূর্তিকে বুদ্ধ বলেই মনে করেন। তারই জন্যে বৌদ্ধ ভুটিয়ারা আসে দলে দলে। এ দেবতা তাদেরও। এদের মধ্যেই অনেকের বিশ্বাস যে বুদ্ধ নিবার্ণ লাভ করেছিলেন এইখানে, আর মন্দিরে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন আছে।

এই গ্রাম মুসলমানের তীর্থ হয়েছে অন্য কারণে। পীর ঘিয়াস উদ্দীন আউলিয়া এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদ দর্শনে মক্কা দর্শনের এক চতুর্থাংশ পুণ্য হয় বলে মুসলমানদের বিশ্বাস। এই জন্যেই হাজোর নাম পোয়া মক্কা হয়েছে।

হাজোর গল্প শুনতে শুনতে কাকতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: হাজোয় তুমি কত দিন আগে গেছ?

কাকতি বলল: অনেক দিন আগে।

মন্দিরের কথা কিছু মনে আছে?

তা আছে। যত দূর মনে পড়ে আমরা নর্থ গৌহাটি থেকেই বাস ধরেছিলাম, আমিনগাঁও হয়ে সেই বাস হাজো গিয়েছিল। ছোট একটা পাহাড়ের উপরে মন্দির। পাহাড় নয়, তাকে টিলা বলা

উচিত। শ খানেক সিঁড়ি ভেঙে আমরা উপরে উঠেছিলুম। মন্দিরের চূড়ো খুব উঁচু, শ দেড়েক ফুট হবে। আর মন্দিরের গায়ে অনেক কারুকার্য দেখেছিলাম—বিষ্ণুর দশ অবতার লক্ষ্মী ইন্দ্র যম আরও সব দেবদেবীর মূর্তি। প্রথমে নাটমন্দির, তার পাশে দোল-মঞ্চ। নাটনন্দির ও গর্ভমন্দিরের মাঝখানে একটি মস্ত হোমকুণ্ড দেখেছিলাম। ভোগ মণ্ডপ সকলের পিছনে।

আমি বললুম: মন্দিরের ভিতর দেবতার মূর্তির কথা মনে আছে?

কাকতি বলল: সত্যি বলতে কি, সে মূর্তি আমার চোখে বুদ্ধের মূর্তি বলেই মনে হয়েছিল।

আমি বললুম: তাও অসম্ভব নয়, পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা প্রাণীর ধর্ম, কাজেই বুদ্ধমূর্তি নিজেদের দেবতা বলে আত্মসাৎ করাও অসম্ভব নয়।

কাকতি বলল: তাহলে আমাদের পুরাণের গল্পগুলি কি মিথ্যা?

কোন্ গল্প?

কাকতি বলল: আমি সেখানে দুটো গল্প শুনেছি। প্রথমটা হয়াসুরের গল্প, আর দ্বিতীয়টা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন তো উড়িষ্যার রাজা।

এ তাঁরই গল্প।

ব্রহ্মপুত্রের পরপারে পেঁছিতে আমাদের আরও কিছু দেরী ছিল। এই অবসরে আমি কাকতির কাছে গল্প দুটি শুনলুম।

প্রথমটি কালিকাপুরাণের গল্প। যে পাহাড়ের উপরে হয়গ্রীব মাধবের মন্দির তার নাম মনিকুট পর্বত। পুরাকালে এইখানে ছিল ঔর্ব্য ঋষির আশ্রম। ঋষি তাঁর আশ্রমে শান্তিতে তপস্যা করতেন। হঠাৎ পাঁচটি অসুর এসে উপদ্রব শুরু করল, তাদের মধ্যে একজন হল হয়াসুর। কিছু দিন ঋষি এই অসুরদের উৎপাত সহ্য করলেন, তারপর শরণাপন্ন হলেন বিষ্ণুর। ঋষির আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু

তাঁকে অভয় দিলেন। কিন্তু এ কথা টের পেয়ে হয়াসুর পালিয়ে গেল। তাকে খুঁজতে বেরিয়ে বিষ্ণু দেখলেন যে হয়াসুর ব্রহ্মপুত্রের তীরে বিশ্বনাথ শিবের আশ্রয় নিয়েছে। বিষ্ণু সবকটি অসুরকে বধ করলেন। আর নিজে এই মনিকুট পর্বতে হয়গ্রীব মাধব নামে পরিচিত হয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় কাহিনী হল যোগিনীতন্ত্রের। এই কাহিনীতে দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হয়েছে। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এক বিরাট যজ্ঞ করছেন। তিনি তীর্থ স্থাপন করে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। যথাবিধি যজ্ঞ শেষ হবার পর রাতে রাজা স্বপ্ন দেখলেন যে ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়েছেন। রাজাকে তিনি আদেশ করলেন যে প্রত্যুষে এক পরশু হাতে নিয়ে সমুদ্র তীরে গেলে রাজা এক জাতিবর্জিত বৃক্ষ দেখতে পাবেন। সেই বৃক্ষ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করে বিষ্ণুর মূর্তি নির্মাণ করা যাবে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাই করলেন। বৃক্ষের মূলভাগ থেকে জগন্নাথের দারুমূর্তি নির্মিত হল। অন্য খণ্ড-গুলিতে যে সব মূর্তি তৈরি হল তার প্রতিষ্ঠা হল নানা দেশে। এর মধ্যে দুটি মূর্তি স্থাপন করলেন বরুণ, একটি মলয় গিরিতে ও অপরটি মনিকুট পর্বতে। মনিকুট পর্বতের হয়গ্রীব মাধব মূর্তি বরুণের প্রতিষ্ঠা। পুরাকালে দারুমূর্তি ছিল, এখন হয়েছে পাথরের। আর একটি দারুমূর্তি কুবের স্থাপন করেছিলেন উত্তর লক্ষ্মীমপুরে, তার নাম নন্দীশ, ইনি মৎস্যাক্ষ মাধব নামে পরিচিত।

কাকতি বলল : মন্দিরের দ্বারে প্রথমে নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করতে হয়, তারপর মন্দিরের ভেতরে অন্য দেবদেবী। এক দিকে দ্বিতীয় মাধব ও গরুড় অন্য দিকে গোবিন্দ মাধব ও বাসুদেব।

এই মন্দিরটিও কালাপাহাড় ধ্বংস করেছিলেন বলে শোনা যায়। তারপর কোচ বংশের রাজা রঘুদেব মন্দিরটি সংস্কার করে দিয়েছেন। দেবতার নিত্য পূজা ও ভোগের জন্য ইনি অনেক জমি দান করে

গেছেন। মাধব মন্দিরে যে দ্বিতীয় মাধবের মূর্তিটি আছে তাও এই কোচ রাজাদের প্রতিষ্ঠা।

অনেকে এই মন্দির আহোম স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন মনে করেন। তাঁরা একটি শিলালিপির মর্ম উদ্ধার করে বলেছেন যে আহোম রাজা রুদ্রসিংহ এই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন।

আমাদের কাছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বড় নয়, মন্দিরটিই বড়। সেই মন্দির দেখতে আমরা গেলুম না। তার সময় ছিল না। হাজোর মন্দির দেখতে হলে সকালে বেরনো উচিত। কাকতি আমাকে এ কথা আগেই বলেছিল, আমিই রাজী হই নি। অধ্যাপক হাজারিকার কথা আমার মনে ছিল, তিনি আমাকে রবিবারে বেরতে বারণ করেছিলেন। তাঁর কাছে আমি আরও অনেক মূল্যবান কথা জানতে পাব বলে আশা করে আছি। কাকতিকে তাই বলেছিলাম: হাজো থাক, হাজো আমরা অন্য কোন সময় দেখব।

কাকতি আমার কথা তখুনি মেনে নিয়েছিল, বলেছিল: সেই ভাল, হাজোতে আমরা সিল্ক তৈরির কাজও দেখে আসব।

তারপরেই বলেছিল: সিল্কের কাজ দেখতে হলে শোয়ালকুচি দেখতে হয়। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে পলাশ বাড়ি। উত্তর পারে শোয়ালকুচি, গৌহাটি থেকে দূর হবে চোদ্দ পনর মাইল। ঘরে ঘরে তাঁত, সিল্কের কাপড় তৈরি দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন।

আমাদের স্টীমার এবারে ঘাটে লাগছিল। কাকতি বলল: হাজোতে আর একটি জিনিস দেখবার আছে।

আরও কিছু দেখবার আছে শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। বললুম: সত্যি নাকি!

কাকতি উৎসাহ পেয়ে বলল: নিকটের একটি পাহাড়ে যে কেদার মহাদেবের মন্দির আছে তার কথা আমি বলছি না। আমি দুজোড়া পাহাড়ের কথা বলছি। একজোড়ার নাম ধুনি-মুনি, আর একজোড়ার নাম বেহুলা-লখীন্দর। সেখানকার লোকের

বিশ্বাস যে বেহুলা লখীন্দরের ঘটনা এই অঞ্চলেই ঘটেছিল। হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের নিচে একটি পুরনো খাত দেখা যায়, লোকে এটিকে ব্রহ্মপুত্রেরই খাত বলে। বেহুলা কি ব্রহ্মপুত্রেই তার ভেলা ভাসিয়েছিলেন। নেতা ধোপানির পাট তো ধুবড়ির কাছেই।

স্টীমার থেকে নেমে শুনলুম যে অশ্বক্লান্ত এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে। সারা বছর এই দূরত্ব সমান থাকে না। নদীর জলের জন্য ঘাট সরাসরি করে। কাজেই কখনও আধ মাইল কখনও বা এক মাইল পথ হাঁটতে হয়। নদীর ধারে ধারে যেতে হবে অশ্বক্লান্ত বা অশ্বক্রান্ত। এই দুই নামেই এই স্থানটি পরিচিত। আমরা পদব্রজে সেই দিকে অগ্রসর হলুম।

বেহুলা লখীন্দরের গল্প আমার মনে পড়ল। শুধু বাঙলার গ্রামে গ্রামে নয়, এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামেও এই গান আজও পরম শ্রদ্ধায় লোকে শুনছে। বিষহরী মনসার গান, এই গানে বড় হয়ে উঠেছে লখীন্দরের পিতা চাঁদ সওদাগর। চাঁদকে আমি বাঙলার বণিক বলেই জানি। বর্ধমান জেলায় ছিল চম্পাই নগর। সেখানকার এক ভাঙা শিবের মন্দির চাঁদ সদাগরের প্রতিষ্ঠা বলে আজও পরিচিত।

কটাক্ষে গাঙ্গুড়ে নদী পশ্চাৎ করিয়া।
বর্ধমানে সওদাগর উত্তরিল গিয়া॥

দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দী হল চাঁদ সওদাগরের কাল। তিনি সপ্ত ডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্যে বেরতেন। সেই নৌকো সোনা-রূপোয় পূর্ণ করে দেশে ফিরতেন। একবার তাঁর চোদ্দ ডিঙ্গা ডুবল কালীদহে, একে একে ছটি পুত্রও মরল সাপের কামড়ে। সওদাগর সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন, তবু তিনি মনসার পূজা করলেন না। পরম শৈব চাঁদ ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি মনসার পূজা নিজে না করলে দেশে তাঁর পূজা প্রচলিত হবে না। মনসা তাই সর্বপ্রকারে তাঁর

লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করলেন। দু মুঠো অন্নের জন্য চাঁদ কাঠ কেটে আনছেন। সেই কাঠ হনুমানে নিয়ে গেল। চাঁদ ভিক্ষা করে চাল আনলেন, সেই চাল ইঁদুরে খেল। তাঁর শেষ সন্তান লখীন্দরকেও বিয়ের রাতে সাপে কামড়াল। কিন্তু তবু চাঁদ অটল রইলেন তাঁর সংকল্পে, যাঁকে তিনি দেবতা মনে করেন না তাঁর পূজা নিজ হাতে করবেন না।

এর পরেই বেহুলার গল্প, লখীন্দরের নববিবাহিত পত্নী বেহুলা। স্বামীর শব ভেলায় নিয়ে ভাসলেন নদীতে। মনসার আরাধনা করে স্বামীর জীবন ফিরে পেলেন, ফিরে পেলেন তাঁর ভাসুরদের জীবনও, চাঁদের পণ্য বোঝাই চোদ্দ ডিঙ্গা নদীর উপরে আবার ভেসে উঠল। হেরে গেলেন চাঁদ সওদাগর। দুঃখের দিনে যে আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল, সুখের দিনে তা অন্তর্হিত হল। বেহুলার অনুরোধে চাঁদ মনসার পূজা করলেন, দেশে মনসার পূজা প্রচলিত হল।

কোন্ নদীর তীরে চাঁদ সওদাগর বাস করতেন, আর কোন্ নদীতে ভেসেছিলেন বেহুলা, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। বাঙলা বলে চাঁদ আমার, আসাম বলে আমার। চাঁদ সকলের।

হেমন্তের সূর্য তত প্রখর নয়, হাঁটতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল না। তবু কাকতি কিছু সঙ্কোচ বোধ করছিল। বলল: আমি ভেবেছিলাম যে খেয়াঘাট এখন অশ্বক্রান্তের খুব কাছেই হবে।

আমি বললুম: দূরে হবার জন্যে তো ক্ষতি কিছু হয় নি।

কাকতি বলল: অনেকটা পথ আপনাকে হাঁটতে হল।

বললুম: এতটা হাঁটতে না হলে পথ যেত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে, অন্ধকার হবার আগেই আমরা হোটেলের ঘরে পৌঁছে যেতুম। আজ আমরা ব্রহ্মপুত্রের উপরে সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ পাব।

কাকতি স্বীকার করল যে সেও এক অপরূপ দৃশ্য। সূর্য যেন ব্রহ্মপুত্রের জলেই ডুবে যাচ্ছে।

তারপরে তার কাছে আমি অশ্বক্লান্তর গল্প শুনলুম। এই গ্রামের নাম উত্তর-গৌহাটি। পুরাকালে এখানে অশ্বক্রান্ত নামে একটা কুণ্ড ছিল, সেই কুণ্ড এখন ব্রহ্মপুত্রে বিলীন হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রে আছে যে জনার্দন নাগলোক থেকে উত্থিত হয়ে সে কুণ্ডে স্নান করেছিলেন, আর কুণ্ডের নাম দিয়েছিলেন অশ্বক্রান্ত। কিন্তু স্থানীয় লোকের বিশ্বাস অন্য রকম। তাঁরা বলেন যে কৃষ্ণ এখানে দু-তিনবার এসেছিলেন, একবার নরকাসুর বধে আর একবার শোনিতপুরে অনিরুদ্ধকে উদ্ধারের জন্য। তৃতীয়বার এসেছিলেন রুক্মিণী হরণের জন্য। তাঁর ক্লান্ত অশ্ব এইখানেই জলপান করেছিল বলে এই স্থানের নাম হয়েছে অশ্বক্লান্ত।

আমি বললুম: আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে। হয় মানে অশ্ব, হাজোতে হয়গ্রীব মাধব আর উত্তর গৌহাটিতে অশ্বক্লান্ত। দু জায়গাতেই অশ্ব। কাজেই দুটি কাহিনীর একই উৎস বলে মনে হয়।

পরম বিস্ময়ে কাকতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তখন আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেছি।

কাকতি প্রথমে আমাকে অশ্বগয়ায় নিয়ে গেল। বলল: যাত্রীরা এই অশ্বগয়ায় পিতৃপুরুষের জন্যে তর্পণ করেন।

এখানে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে একটি খাড়া পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কাকতি বলল: ঐ পাহাড়ের নাম আড় পর্বত, কর্মনাশাকে আড় করেছে। ঐ পাহাড় না থাকলে এখানকার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম নাশ হত, কর্মনাশার দিকে যাত্রীদের চোখ পড়তই।

সত্যিই বড় অদ্ভুত ঐ পাহাড়টি, আড় পর্বত নাম তার সার্থক হয়েছে।

এর পরে আমরা দুটি মন্দির দেখলুম, নদীর একেবারে ধারে পাহাড়ের নিচের দিকে কূর্মরূপী বিষ্ণুর মন্দির, আর পাহাড়ের উপরে আরও একটি বিষ্ণুর মন্দির, সেখানে তিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করে

আছেন। এই মন্দির গাত্রেও কিছু মূর্তি উৎকীর্ণ আছে, বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি। কাকতি বলল: চিলারায়ের পৌত্র কোচ হাজোর রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা বলে শোনা যায়।

এখানে আরও একটি মন্দিরের কথা জানা গেল। মণি-শৈল নামে একটি পাহাড়ে মণিকর্ণেশ্বর শিবের মন্দির। এই পাহাড়ের নিচে দিয়েও ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হচ্ছে।

ফেরার পথে কাকতি বলল: আপনার বোধহয় খুব কষ্ট হল!

আমি বললুম, কষ্টের কথা বুঝতে পারছি না, আনন্দের কথা বলতে পারি। পরিবেশটি বড় সুন্দর, পাহাড়ের উপরে আরও কিছুক্ষণ কাটাতে পারলে দেবতার মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারতুম।

আমার মনে হল, কামাখ্যার মন্দিরেও আমি দেবতার মাহাত্ম্য অনুভব করি নি। দেবতার চেয়ে মন্দিরের দিকেই আমার দৃষ্টি ছিল বেশি। চোখ খোলা ছিল, কিন্তু মন ছিল অন্য কোন জগতে। মন দিয়ে মাকে দেখতে আমি আর একবার যাব। কিন্তু এবারে আর ট্যাক্সিতে চেপে উপরে উঠব না, এবারে পাহড়ে উঠব পায়ে হেঁটে। অগণিত তীর্থযাত্রী এতকাল যে ভাবে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেছে, আমিও তেমনি করে উঠব। দেবতা তো মন্দিরে আবদ্ধ নেই, তিনি তীর্থযাত্রারও সঙ্গী। পথের দুঃখকষ্ট দুর্গমতায় যাত্রীর মন তিনি অন্তর্মুখী করেন। পথের কষ্টে হয় দেবতার দর্শন।

সন্ধ্যাবেলায় হোটেলে ফিরে শুনলুম যে মিস্টার বড়ুয়া আমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থেকে ফিরে গেছেন, আবার হয়তো আসবেন। এ কথা শুনেই কাকতি আর বসতে রাজী হল না, বলল : না না, আমি আর বসব না, আজ আমি আসি।

বললুম : একটু চা খেয়ে যাও।

কাকতি বলল : চা আপনার কাছে অনেক খেয়েছি, আজ আমাকে যেতে দিন।

আমি বুঝি যে এ তার ভয়। মিস্টার বড়ুয়া আবার আসবেন শুনেই ভয় পেয়েছে। তাই আমি আর তাকে জোর করলুম না।

খানিকক্ষণ পরে মিস্টার বড়ুয়ার বদলে এলেন অধ্যাপক হাজারিকা। আমাকে দেখে খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন : আপনি আছেন তাহলে! ভেবেছিলুম শনিবারের বিকেলে কি আর আপনাকে এখানে পাব!

হেসে বললুম : উত্তর-গৌহাটি থেকে এইমাত্র ফিরলুম।

উত্তর-গৌহাটি গিয়েছিলেন! আপনি নিশ্চয়ই তাহলে খুব ক্লান্ত। বলে বসতে গিয়েও বসলেন না, বললেন : আমি তাহলে আর বসব না, কালকের কথাটা শুধু মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বেলা দশটা নাগাদ আমি এসে আপনাকে গরিবের কুটীরে নিয়ে যাব, একসঙ্গে খাবার ইচ্ছে, কিন্তু পোলাও কালিয়ার বদলে দুটি শাক ভাতের ব্যবস্থা করেছি।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম : অন্য কিছু থাকলে আমারও অসুবিধা হবে।

ভদ্রলোক ফিরতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, বললেন : কী রকম ?

আমি বললুম : বসুন আগে, তারপরে বলছি।

অধ্যাপক কোন আপত্তি না করে বসে পড়লেন। তারপর তাকালেন আমার মুখের দিকে। আমি তাঁর ভাবনা দেখে হেসে বললুম: আমি তো গাছতলার লোক, শাক জুটলে ভাত জোটে না। আপনার কুটীরে শাক আর ভাত ছুটোই জুটবে শুনেই ভয় পেয়েছি।

ভদ্রলোক এবারে নির্মল আনন্দে হেসে উঠলেন।

আমি বললুম: আমাদের চা আসছে, এবারে বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে।

বলতে না বলতেই বেয়ারা এল ছুজনের চা নিয়ে। অধ্যাপক একটু আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম: এতক্ষণ যে ছেলেটি আমার সঙ্গে ছিল, তার জন্যেই আনতে বলেছিলুম। ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেল।

কেন?

সে ভেবেছিল, তার অফিসের 'বস্' আসছে।

ভদ্রলোক আবার হেসে উঠলেন, বললেন: 'বস্'কে এত ভয়!

আমার মতো 'বস্' নয় তো যে দাপট বলে কিছু নেই। গোটা অফিসটা তাঁর ভয়ে কাঁপছে শুনতে পাই।

তাহলে খুব যোগ্য লোক বলতে হবে!

চা ঢেলে আমি এক পেয়ালা অধ্যাপকের দিকে বাড়িয়ে দিলুম, বিস্কুটও দিলুম তার সঙ্গে। বললুম: যোগ্য লোক তো নিঃসন্দেহে।

তারপরে আমাদের অন্য কথা হল। নর্থ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অধ্যাপক হাজারিকা আমাকে আরও অনেক কথা বললেন। ব্রহ্মপুত্র নদী এখানে পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত বলে নদীর উত্তরের উপত্যকা ভূমি নর্থ ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত। গোয়ালপাড়া কামরূপ দরং ও লখীমপুর জেলা এই উপত্যকায় অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে রেলপথ এসেছে গৌহাটিতে, সেই পথে রঙ্গিয়া একটি জংসন স্টেশন। রঙ্গিয়া থেকে তেজপুর ও উত্তর লখীমপুর পর্যন্ত রেলপথ আছে। মোটর চলাচলের ভাল পথও আছে।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন : গৌহাটি আসবার সময় রঙ্গিয়া পৌঁছবার আগেই বরপেটা রোড নামে একটা স্টেশন পেয়েছেন। সেই স্টেশন থেকে বরপেটা শহর মাইল তেরো দক্ষিণে।

বরপেটা কামরূপ জেলার একটি মহকুমা শহর এবং শঙ্করদেব ও মাধবদেব প্রবর্তিত মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। সেখানকার প্রধান সত্রে একটি কীর্তন ঘর আছে, তার পাশে ভোজ-ঘরে কোলিয়া ঠাকুর ও দোলগোবিন্দ নামে দুটি মূর্তি, শঙ্করদেব ও মাধবদেবের পুঁথি চুল ও পদচিহ্ন ভক্তরা সযত্নে রক্ষা করেছেন। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষ্যে সত্রে সত্রে কীর্তনের ব্যবস্থা হয়। এঁদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিবস একটি বড় উৎসবের দিন।

অধ্যাপক একটু থেমে বললেন : বরপেটায় আপনি বিহু উৎসবও দেখতে পাবেন। অনেক বিহু গান আধুনিক রুচিসম্মত নয় বলে হয়তো নিন্দা শুনেছেন, তেমনি অনেক গান যে ভাবে ও ব্যঞ্জনায় অপূর্ব তাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আজ কিছু বলবেন নাকি?

অধ্যাপক সকৌতুকে বললেন : আজ নয়, আজ আপনাকে নর্থ ব্যাঙ্কের কথাই বলি।

আমি তাতেই সম্মত হলুম।

অধ্যাপক বললেন : ইতিহাসের প্রতি আপনার যে একটা সহজ প্রবণতা আছে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। তাই চেষ্টা করে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছি। বরপেটা থেকে আট মাইল উত্তরে বড়নগর নামে একটি জায়গা আছে, বন জঙ্গলের ভিতরে নাকি কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে যে এইখানেই ছিল কোচরাজ বলিনারায়ণ ও পরীক্ষিতের রাজধানী। মহাভারতের পরীক্ষিৎ নন। ইনি কোচ হাজোর পরীক্ষিৎ, বিখ্যাত চিলারায়ের পৌত্র।

আমি বললুম : শুনেছি তাঁর নাম। ওপারের অশ্বক্লান্তেও তাঁর হাত আছে বলে জেনেছি।

হাজোর কথা শুনেছেন ?

আর একবার শুনতে আপত্তি নেই।

অধ্যাপক বললেন : সবাই আমরা একই কথা বলি। কাজেই ও কথার পুনরুক্তি আপনার ভাল লাগবে না। তার চেয়ে রঙ্গিয়ায় এসে তেজপুরের গাড়িতে উঠুন। দুপুরবেলা সাড়ে বারোটায় একটা গাড়ি পাবেন, তেজপুরে পৌঁছবে রাত প্রায় আটটায়। তার চেয়ে রাতে খেয়েদেয়ে সাড়ে দশটার পরের গাড়ি ধরুন, ভোর পাঁচটার পরেই পৌঁছবেন তেজপুরে। এটা এক্সপ্রেস গাড়ি। সব স্টেশনে দাঁড়াবে না। ওধারেও সব দেখে শুনে আবার ফিরতি গাড়িতে চাপবেন রাত দশটার পরে।

আমি বললুম : তেজপুরে কিছু দেখবার আছে ?

অধ্যাপক বললেন : আসামে দেখবার জায়গা গৌহাটির পরেই তেজপুর। অসুররাজ বাণের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তেজপুর তাঁরই রাজধানী ছিল। তখন নাম ছিল শোনিতপুর।

এ কথা আমার জানা ছিল। তবু সৌজন্যের প্রয়োজনে বললুম : তাই নাকি !

অধ্যাপক বললেন : আপনারা আবার অন্য কথা বলেন বলে শুনেছি। আমার এক ঐতিহাসিক বন্ধু বললেন যে বাঙলার দিনাজপুরের কিছু দক্ষিণে পুনর্ভবা নদীর তীরে মাটি খুঁড়ে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই দুর্গ ছিল। তার নাম বাণ গড় বা বাণ নগর। সেখানকার লোকেরা এই দুর্গকেই অসুররাজ বাণের দুর্গ বলে দাবী করে। আরও অনেক প্রাচীন নিদর্শন নাকি দিনাজপুরের রাজ-বাড়িতে রক্ষিত আছে।

আমার যে এ কথা জানা ছিল না তা অকপটে স্বীকার করলুম।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন : এই ধ্বংসাবশেষ থেকে দেড় মাইল দূরে গঙ্গারামপুর। সেখানকার কালদীঘি নামে একটি পুষ্করিণী বাণ মহিষী কালারাণী খনন করেছেন বলে প্রবাদ। বাণের স্ত্রীর নাম কি কালারাণী ছিল ?

বললুম : স্ত্রীর নাম জানি নে। কন্যার নাম জানি উষা। উষাহরণের কাহিনী বোধহয় আপনারাও জানেন ?

অধ্যাপক বললেন : সেই ঘটনা ঘটেছিল তেজপুরে। আমাদের কাছে এ গল্প খুবই প্রিয়।

তারপরে তেজপুরে কী কী দেখবার আছে সেই কথা তিনি বললেন। ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটি সুন্দর শহর। এমন সুন্দর শহর আসামের সমতল ভূমিতে আর নেই। দরঙ্গ জেলার প্রধান শহর এটি, তার জন্যেই শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে।

ভদ্রলোক এবারে ভাবতে লাগলেন। আমি প্রশ্ন করলুম : কী ভাবছেন ?

ভাবছি বিপদের কথা। বই পড়ে বর্ণনা করা যে এমন কঠিন তা ভাবতে পারি নি।

আমি হেসে বললুম : কী রকম ?

অধ্যাপক বললেন : তেজপুরে আমি কোন দিন যাই নি। একবার যাব বলে খোঁজ খবর নিয়েছিলাম আর একখানা সাময়িক পত্রে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম যে তার থেকেই আপনাকে সব বলতে পারব। এখন দেখছি যে অন্যের দেখা জিনিসের বর্ণনা করা খুবই কঠিন।

তাঁর কথা শুনে আমি হাসতে লাগলুম।

ভদ্রলোক বললেন : একটা প্রাচান ধ্বংসাবশেষের কথা পড়েছিলাম দাপরবতিয়া রুইনস্, না ঐ রকমের একটা কিছু নাম। সেটা শহরের কাছে না দূরে, তা মনে নেই। তার ঐতিহাসিক কথাও বেমালুম ভুলে গেছি। তবে এইটুকু মনে আছে যে তার

দরজায় পাথরের কারুকার্য গুপ্ত যুগের স্থাপত্যরীতির মতো। তেজপুরে ও তার আশেপাশে যে সব মন্দির আছে তার নাম আমি ভুলি নি। শিব ও দুর্গার মন্দির। নাম মহাভৈরব ও ভৈরবী দেবালয়। বিশ্বনাথের মন্দির শহর থেকে প্রায় ছাপ্পান্ন মাইল পূর্বে।

বললুম: এই তো, তেজপুর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন: হল না। আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু সে সব কোথায় ও কত দূরে তা বলতে পারব না। নামগুলো শুনেই আপনি ঘাবড়ে যাবেন।

বলুন।

অগ্নিগড় পাহাড় নাগশঙ্কর ভালুকপুঙ্গ আর শোনিতপুরের ধ্বংসাবশেষ।

প্রথম আর শেষটা বুঝতে পারলুম, মাঝখানের দুটো কী জীব?

জানলে আগেই বলতাম। প্রবন্ধ লেখকেরা ভাবেন যে নাম দেখেই আমরা সব বুঝে ফেলব।

আমি বললুম: তাহলে আপনাকে একটা গল্প বলি।

অধ্যাপক সাগ্রহে বললেন: বলুন।

আমাদের এক বন্ধুর গল্প। পুরীতে তিনি রিক্‌শায় চেপে সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখবেন, তার জন্যে এক রিক্‌শাওয়ালাকে ডেকে প্রশ্ন করে করে নামের একটা লিস্ট করে ফেললেন। তারপর দরে বনল না বলে তাকে না নিয়ে অন্য এক রিক্‌শাওয়ালাকে নিলেন। এক বেলাতেই সেই রিক্‌শাওয়ালা লিস্ট অনুযায়ী সমস্ত জায়গাগুলো দেখিয়ে দিল। বন্ধু আমাদের ভারি খুশী, ফিরে এসে গল্পটা আমাদের বললেন। কিছু কিছু আমাদেরও দেখা ছিল, তাঁর বর্ণনা শুনে তো আমরা স্তম্ভিত। উলটোপালটা যা-তা বর্ণনা শুনে বুঝলুম যে সেই রিক্‌শাওয়ালা পথেই এখানে সেখানে রিক্‌শা থামিয়ে তাকে বোকা বুঝিয়ে দিয়েছে।

আমার গল্প শুনে অধ্যাপক হাজারিকা হেসে উঠলেন। তারপরে বললেন: ভ্রমণ-কাহিনীর লেখকেরা এরকমও করেন বলে শুনেছি, আবার ভুল লিখেছেন বললে চটে যান।

আমি হাসলুম তাঁর কথার ধরনে।

ভদ্রলোক বললেন: তেজপুরে অনেকে বুনো জন্তুর স্যাঙ্কচুয়ারি দেখতে যান, তার নাম সোনাই-রুপা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। ব্রহ্মপুত্রের এপারে আপনি কাজিরঙ্গা স্যাঙ্কচুয়ারি দেখবেন নওগাঁ থেকে যোরহাটে যাবার পথে। নদীর এপারে নওগাঁ, ওপারে তেজপুর। তবে নওগাঁ ঠিক ব্রহ্মপুত্রের ধারে নয়, কিছু দক্ষিণে। তেজপুরে ডাকবাংলো আছে, সার্কিট হাউস আছে, কিছু চলনসই হোটেলও আছে। ট্যাক্সি নিয়ে সব কিছু ঘুরে দেখবার কোন অসুবিধা নেই।

অধ্যাপক হাজারিকা ফিরে যাবার পর প্রাচীন শোনিতপুরের কথা আমার মনে পড়ল। অসুররাজ বাণের রাজধানী শোনিতপুরের সঙ্গে উষাহরণের কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। শিবভক্ত বাণের কন্যা উষার রূপের তুলনা নেই।—

উষার রূপের উপমার ঠাই নাই,
যেহি অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে তাকে যাকে চাই।

একদিন উষা হরপার্বতীর বিহার দেখে আনন্দে অভিভূত হয়েছিল। পার্বতীর কাছে এই কথা ব্যক্ত করলে তিনি তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে যে স্বপ্নে যদি সে কোন পুরুষের সঙ্গে বিহার করে তবে সেই পুরুষই তার স্বামী হবে।—

বৈশাখ মাসত আসি তিথি শুক্লা দোয়াদসী
সেহি দিন দেখিবা সপন।
সুন্দর পুরুষে আসি আলিঙ্গিবে হাসি হাসি
তোর স্বামী হৈবে সেহিজন॥

সত্যি সত্যিই উষা একদিন স্বপ্ন দেখল, আর সেই স্বপ্নের কথা বলল তার প্রিয় সখী চিত্রলেখাকে। রাজমন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা ছবি আঁকতে জানে। শিবের কাছে সে বর পেয়েছিল—

সুরাসুর নর যত   আছে বৈছ্য ভুবনত
রূপগুণ জানিবো সবার।
চিত্রতে লিখবো যত   বর্ণভেদ স্বরূপত
যতেক ব্রহ্মাণ্ড চরাচর ॥

অনেক পুরুষের ছবি এঁকে সে উষাকে দেখাল, অবশেষে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের ছবি দেখে উষা বলল, এই সেই পুরুষ।—

মোর প্রাণনাথ এহিজন।
দেখা কেনে মূর্তিমন্ত   ভুবনমোহন কান্ত
কোন নারী ধরিবেক মন।

চিত্রলেখা তখুনি চলল দ্বারকায়। যোগবিদ্যার বলে আকাশ-পথে পেঁীছল ভারতের অপর প্রান্তে, সেখানে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে হল তার সাক্ষাৎ; নারদ তাকে তামসীবিদ্যা শেখালেন। সেই বিদ্যার বলে চিত্রলেখা সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে অনিরুদ্ধকে নিয়ে পালিয়ে এল।

শোনিতপুরে উষার সঙ্গে বিবাহ হল অনিরুদ্ধর, গোপনে গন্ধর্ব মতে। বাণ জানলেন না, চিত্রলেখা ছাড়া আর কেউ এ কথা জানল না। তারপর এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। বাণ এসে দেখলেন অনিরুদ্ধকে। যুদ্ধ করে তাকে বন্দী করলেন। আর অনিরুদ্ধর খবর নারদ জানালেন কৃষ্ণকে। তাঁরা এসে শোনিতপুর আক্রমণ করলেন।

প্রবল যুদ্ধ হল কৃষ্ণের সঙ্গে বাণের, কৃষ্ণের চক্রে সহস্র বাহু বাণ হলেন চতুর্ভুজ। তবু যুদ্ধ চলতে লাগল। শেষে শিব এসে মধ্যস্থ হলেন, বললেন, বাণ আমার ভক্ত, তাকে আপনি রক্ষা করুন।

কৃষ্ণ বললেন, এর পিতা বালি ও তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদও আমার

ভক্ত। এদের বংশে জন্ম বলে বাণ আমার অবধ্য। তার প্রাণহানি আমি করব না।

উষা ও অনিরুদ্ধকে বাণ কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন।

এ গল্প শ্রীমদ্ভাগবতের গল্প, তাই এ ঘটনার উপরে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইটুকু বাদ দিলেই এ গল্প মধুর হত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গল্প আমার মনে পড়ল। কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণের গল্প। বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হয়েছে রাজধানী কুণ্ডিলপুরে। বড় ভাই রুক্মী চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করেছেন। কিন্তু রুক্মিণী মনে মনে কৃষ্ণকে ভালবাসেন। অনন্যোপায় হয়ে সেই কথা কৃষ্ণকে লিখে পাঠালেন। পত্র নিয়ে গেল এক ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণকে পড়ে শোনাল সেই পত্র। কৃষ্ণ এসে বিবাহের দিন রুক্মিণীকে হরণ করলেন।

এই হরণের দৃশ্যটি বড় সুন্দর। পারিবারিক নিয়মে রাজকন্যা অম্বিকার মন্দিরে পূজার্চনা করে ফিরছেন। সখীরা সঙ্গে আছে, আর চারিদিক ঘিরে চলেছে উদ্যতাস্ত্র সৈন্যরা। কিছু দূর পদব্রজে এসে রাজকন্যা রথে উঠবেন। পথের ধারে রাজারা সমবেত হয়েছেন। তাঁর রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ। রাজকন্যাও তাঁর বাম হাতে চোখের উপর থেকে চূর্ণ কুন্তলগুলি সরিয়ে রাজাদের দেখলেন, দেখলেন কৃষ্ণকে। তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারলেন না, চক্ষের নিমেষে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে তাঁর রথে চড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সমবেত রাজারা ক্ষেপে গেলেন। তুমুল যুদ্ধ করলেন বলরামের সঙ্গে। কিন্তু জয়লাভ করতে পারলেন না। মগধরাজ জরাসন্ধ শিশুপালকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করো না ভাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের সুখ দুঃখ, তিনি আমাদের নিয়ে কাঠপুতলির নাচ দেখাচ্ছেন।

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ॥

রুক্মিণী হরণের গল্প আমার কেন মনে এল ভাবতে লাগলুম। সহসা মনে পড়ল কাকতির কথা। অশ্বক্লান্তে সে আমাকে বলেছিল যে রুক্মিণীকে হরণ করে কৃষ্ণ যখন পালাচ্ছিলেন তখন তার অশ্ব এখানে ক্লান্ত হয়ে জল পান করেছিল। অনেকের মতো এই গল্পটাই সে বেশি বিশ্বাস করে।

বিদর্ভ রাজ্য বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বলে আমি জানি, কিন্তু কুণ্ডিলপুরের নাম আমি শুনি নি। প্রয়োজন হলে পণ্ডিতরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন। আমার আনন্দের লোভ, তার জন্য বিতর্কের দরকার দেখি না।

মিস্টার বড়ুয়া রাতে আসেন নি। এলেন সকালবেলায়। ফার্মের গাড়িতে চেপেই এলেন। বললেন: কাল বিকেলে এসে আপনার দেখা পাই নি, শুনলাম বেড়াতে গেছেন।

বললুম: ঠিকই শুনেছেন।

মিস্টার বড়ুয়া আরও কিছু শোনবার জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, তারপর বললেন: কাল রাতেই আর একবার আসব ভেবেছিলাম, তারপরে ভাবলাম সকালেই আসব।

আমি বললুম: সত্যিই আপনি অনেক কষ্ট করলেন। কোন জরুরী কাজ আছে বুঝি?

মিস্টার বড়ুয়া হি-হি করে হেসে বললেন: আমি আপনাকে কাজের কথা বলতে আসব! আপনার কাজের চাপ দেখে ছুটো সুখদুঃখের কথা তো অফিসে বলতেই পারছি না।

আমি বললুম: একেবারে নতুন কিনা, তাই একটু সময় লাগছে।

মিস্টার বড়ুয়া বললেন: আমি আপনাকে বেড়াবার কথা বলতে এসেছিলাম, আজকের ব্যবস্থা একেবারে পাকা করে এসেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: তাই নাকি!

উজ্জ্বল চোখে মিস্টার বড়ুয়া বললেন: ড্রাইভার একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে, চান্দুবি লেকের উপরে ইভার বাড়ি ও জানে, আশে-পাশে আমাদের অফিসের আরও কয়েকটি মেয়ে থাকে। ওরা সবাই আজ আপনার অপেক্ষা করবে।

আমি উদ্বিগ্নভাবে বললুম: আজ আমার একটু অসুবিধে ছিল।

মিস্টার বড়ুয়া বললেন: না না, অসুবিধা কিছুই না। আপনার ব্রেকফাস্ট নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, গাড়িতে চেপে বসবেন, এক দেড়

ঘণ্টাতেই সেখানে পৌঁছে যাবেন। খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা ওরা করবে।

আমি বললুম: অসুবিধা যে আমার। আমাকে আজ অন্যত্র যেতে হবে।

মিস্টার বড়ুয়া এবারে বিরক্ত হলেন, বললেন: কেন, ঐ হতভাগা আজও আসবে বুঝি!

আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর কথা শুনে। কাকতির কথা কি তিনি জানতে পেরেছেন! না অধ্যাপক হাজারিকার কথা বলছেন! ঠিক বুঝতে না পেরে আমি বললুম: তাঁর বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ আছে।

অ্যাঁ!

মিস্টার বড়ুয়া যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন: তার বাড়িতে আপনি নিমন্ত্রণ যাবেন!

বললুম: অনেক কিছু শিখবারও আশা রাখি। প্রফেসর গুণীলোক।

এবারে মিস্টার বড়ুয়া আমার মুখের দিকে বিহ্বল ভাবে তাকালেন। আমি তাঁকে আরও বিচলিত করবার জন্য বললুম: কাল অনেক রাত পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন, আপনি এলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতুম। ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্য দেখে আপনিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

মিস্টার বড়ুয়া কী বলবেন তা ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন: বেশ, তাহলে আমি আজ উঠি।

বেরিয়ে যাবার আগে বললেন: পরের রবিবার কাউকে কথা দেবেন না।

বললুম: নিশ্চয়ই না।

মিস্টার বড়ুয়া চলে যাবার পরে আমি তাঁর কথাই খানিকক্ষণ ভাবলুম। ভদ্রলোকের যে চর আছে তাতে আমার সন্দেহ রইল না। কাকতি যথেষ্ট সাবধান, তবু তার কথা তিনি জেনে ফেলেছেন। হোটেলের ম্যানেজার ও বেয়ারারা কাকতিকে নিয়মিত যাতায়াত

করতে দেখছে। কিন্তু তারা তাকে চেনে কি? না চেনাই সম্ভব। তা হলে তাঁর অন্য কোন চর আছে। কিন্তু সে চর খুব নির্ভরযোগ্য নয় বলেই মনে হল। অধ্যাপকের কথায় তিনি একটু দমে গেছেন দেখলুম, সন্দেহ করেছেন তাঁর পাওয়া সংবাদে। কাকতিকে কি এ কথা আমি জানিয়ে দেব!

কিন্তু আমাকে কিছুই জানাতে হয় নি। কাকতি নিজেই জেনেছিল সব কথা। একটু বেশি রাতে চুপিচুপি আমার কাছে এসে বলেছিল: সর্বনাশ হয়েছে।

তার চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কী হয়েছে?

বড়ুয়া সাহেব সব জেনে ফেলেছেন। তাঁর চর লেগেছে আমার পিছনে।

সব কথা শোনবার জন্যে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কাকতি বলবার জন্যেই এসেছিল, বললও সব। আমাদের অফিসে এক ছোকরাকে বড়ুয়া সাহেব সম্প্রতি ঢুকিয়েছেন। সেই লোকটাই এই চরের কাজ করে বলে সবারই সন্দেহ। কাকতি কাল সন্ধ্যাবেলায় লোকটাকে এই হোটেলের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।

আমি বললুম: তাতে হয়েছে কী?

ভয়ে ভয়ে কাকতি বলল: বিপদের আমার অন্ত থাকবে না।

এবারে আমি আর সঙ্কোচ করলুম না, অফিসের অনেক কথাই জেনে নিলুম কাকতির কাছে। সবাই তাঁকে এত ভয় পায় কেন সে কথাও জেনে নিলুম। মিস্টার বড়ুয়া এ অফিসের কাউকে কনফর্ম করেন নি, সবার চাকরিই কাঁচা, আর সবাইকে তিনি যখন মর্জি তাড়িয়ে দেব বলে ভয় দেখান। দেশ তো এমন কিছু বড়লোকের নয় যে একটা চাকরি গেলে চট করে আর একটা পাওয়া যাবে! হয়তো বেকার হয়েই চিরকাল থাকতে হবে। মিস্টার বড়ুয়া নাকি

কর্তৃপক্ষের কাছে যুক্তি দেখিয়েছেন যে চাকরি পাকা হলে মন দিয়ে কেউ আর কাজ করবে না। এ কথায় হয়তো কিছু সত্য আছে, কিন্তু নীতি হিসাবে তা সমর্থন করা যায় না। চাকরি পাকা হলেই কর্মচারীদের নিশ্চিন্ত মনে ভাল কাজ করা উচিত। কাকতিকে আমি কোন আশ্বাস দিই নি, কিন্তু পরের দিন অফিসের কর্মচারীদের নামের তালিকা চেয়ে নিয়ে নিজের কর্তব্য করেছিলুম, কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল মার্কা করে চিঠি পাঠিয়েছিলুম সদর দপ্তরে। সে চিঠি অফিসের ডাকের সঙ্গে দিই নি, নিজের পকেটে রেখেছিলুম, অফিস থেকে ফেরার পথে নিচে ফেলেছিলুম ডাক বাক্সে।

যাবার সময় কাকতি বলেছিল: দিন কয়েক আমি আপনার কাছে আসব না।

আমি বলেছিলুম: সেই ভাল।

অধ্যাপক হাজারিকা দশটার সময় আমাকে নিতে আসবেন বলেছিলেন। মিস্টার বড়ুয়া মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যাবার পরে আমি তাঁরই অপেক্ষা করতে লাগলুম। এমন করে একা কখনও হোটেলে কাটায় নি, সময় যেন কাটতে চায় না। আমি লেখা আরম্ভ করতে পারতুম, কিন্তু একবার তাতে হাত দিলে এই নতুন দেশ সম্বন্ধে জানবার সময় যাবে ফুরিয়ে। পড়ার মতো লেখারও একটা নেশা আছে, সে নেশা কোন নেশার চেয়ে কম নয়। আমি ইতিহাসের বইখানা নিয়ে তার পাতা ওলটাতে লাগলুম।

হঠাৎ সেই নামটা পেয়ে গেলুম, লাচিত বরফুকনের নাম। মীরজুমলার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় তিনি তাঁর নিজের মামার গলা কেটেছিলেন। কাল কাকতির কাছে সেই গল্প শুনেছিলুম। অশ্বক্রান্ত থেকে ফেরার পথে সে বলেছিল: আমিনগাঁও স্টেশনের কাছে আর একটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে, তার নাম মোমায় কাটা গড়। সেই গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

মোমায় কাটা গড়ের মানে আমি বুঝতে পারি নি, কাকতি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল : মোমা মানে মামা। সেই গড় তৈরির সময় লাচিত বরফুকন তার মামাকে কেটেছিলেন।

তার পরে সংক্ষেপে বলেছিল গল্পটা। মীরজুমলা এসেছে আসাম আক্রমণ করতে। লাচিত বরফুকন একজন সেনাপতি। রাতারাতি একটা গড় তৈরি করবার হুকুম হয়েছে, সেই কাজের ভার পড়েছে তার মামার উপরে। লাচিত বরফুকন গিয়ে দেখলেন যে গড়ের কাজ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি, অলসভাবে সবাই সময় নষ্ট করছে। এই অবহেলার জন্য তাঁর মামা দায়ী বলে লাচিত তাঁর মামার গলা কাটতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেন নি। শোনা যায় যে তিনি বলেছিলেন, মামার চেয়ে দেশ আমার বড়, এই কথা তাঁর আজও অমর হয়ে আছে।

আসাম জয় করবার জন্য মুসলমানরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। শোনা যায় যে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানেরা সতেরো বার আসাম আক্রমণ করে এবং বারে বারেই তারা এখান থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। একবারের দুর্দশার কথা আমরা মিনূহাজ উদ্দীনের তবকৎ-ই-নাসিরিতে পাই। এই মিনূহাজ উদ্দীন ছিলেন বক্তিয়ার খিলজীর সহযোগী, কেউ বলেন, তাঁর পুত্র মুহম্মদ খিলজীর সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ্মণাবতী অধিকারের কয়েক বছর পরে বক্তিয়ার তিব্বত অভিযানে বেরিয়েছিলেন, পথে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল একজন কোচ বা মেছ জাতির সর্দারের সঙ্গে, বক্তিয়ারের হাতে পরাজিত হয়ে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তার নাম হয়েছিল আলি। এই আলিই বক্তিয়ারকে পথ দেখিয়ে তিব্বতে পাঠায়। কামরূপের রাজা তাকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে তিব্বত আক্রমণের সময় এখন নয়, আরও সৈন্য সামন্ত নিয়ে পরের বছর আসবার জন্য অনুরোধ করেন, নিজেও তাঁকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বক্তিয়ার এ কথায় কর্ণপাত না করে তিব্বত আক্রমণে অগ্রসর হয়ে যান, ষোল দিন লাগে তাঁর তিব্বতে পৌঁছতে। কিন্তু সেখানে

নিজের সৈন্যদের মধ্যে গোলমাল বাধার জন্য দেশে ফিরতে তিনি বাধ্য হন। অনেক দুঃখকষ্ট অনাহারে পনর দিন পথ চলবার পরে কামরূপে এসে তাঁরা দেখলেন যে একটি নদীর উপর সেতু নেই। যে সৈন্যদের তিনি এই সেতু রক্ষার কাজে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে পালিয়ে গেছে, আর কামরূপের হিন্দুরা এসে সেতুটি ভেঙে দিয়েছে। নদী পার হতে না পেরে বক্তিয়ার একটি মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে কামরূপের রাজা এলেন তাঁদের বন্দী করতে। ভয় পেয়ে বক্তিয়ার নদী সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করলেন। তার ঘোড়সওয়ার তাতার সৈন্য জলে ডুবে মরল, আর বক্তিয়ার খিলজী কোনরকমে নদীর পরপারে পেঁাছলেন। আলি নামের সেই সর্দার এসে তাকে রক্ষা করে নিয়ে গেল।

এর পরে এসেছিলেন গৌড়ের নবাব সুলতান ঘিয়াস উদ্দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কামরূপ থেকে সদিয়া পর্যন্ত তিনি জয় করে কর আদায় করেন, কিন্তু তারপরে তিনি পরাজিত হন।

এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে গৌড়ের সেনাপতি মালিক উজবেক এলেন কামরূপ জয় করতে। বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের জল বাড়ল, জলে-কাদায় সৈন্যদের নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে তিনি পালিয়ে বাঁচলেন। তারপরেই গৌড়ের নবাব তুগ্রল খাঁ নিজে এলেন যুদ্ধ করতে। কিন্তু কামরূপের রাজার হাতে তিনি বন্দী ও নিহত হলেন। কামরূপের রাজা এ সময়ে কে ছিলেন তা জানা যায় নি।

এই পরাজয়ের পরে প্রায় আড়াইশো বছর মুসলমানরা আর কামরূপ আক্রমণ করতে আসে নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে রাজা নীলাম্বরের সময় কামরূপ অবরোধ করলেন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ। কামরূপ অধিকার করতে তাঁর বারো বৎসর সময় লেগেছিল। হুসেন শাহ কামতাপুরও জয় করেছিলেন, কিন্তু বেশি দিন নিজেদের দখলে রাখতে পারেন নি। কোচবিহারের প্রথম রাজা

বিশ্বসিংহ হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহকে তাড়িয়ে রাজ্য উদ্ধার করেন। নরনারায়ণের সময় এসেছিলেন কালাপাহাড়, আর পরীক্ষিৎ নারায়ণের মৃত্যুর পরে ঢাকার নবাব এসে হাজো অধিকার করেন।

এর পরে মুসলমানেরা ঘন ঘন এসেছে, ছোটখাট যুদ্ধবিগ্রহ করে গোটা কামরূপের উপরেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। গৌহাটি শহরও তাদের হস্তগত হয়। মোমাইতামুলী বড় বড়ুয়া নামে একজন অসমীয়া সেনাপতি কিছু দিনের জন্য গৌহাটি উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

মীরজুমলা কোচবিহার জয় করতে এসেছিলেন ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে। গৌহাটির কাছাকাছি তিনি এসেছিলেন, কিন্তু নিজে পীড়িত হয়ে পড়বার জন্য রাজা জয়ধ্বজ সিংহের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে ফিরে যান। সন্ধি না করে তাঁর উপায় ছিল না, নিজের সৈন্যদলেই বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছিল।

রাজা জয়ধ্বজ সিংহের পরে যখন চক্রধ্বজ সিংহ আসামের রাজা, তখন দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব আসাম জয়ের জন্য রাজা রাম সিংহকে পাঠালেন। চক্রধ্বজ সিংহ বাদশাহকে কর দিতে অস্বীকার করে দূতকে অপমান করেছিলেন, আর গৌহাটি পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন। রাম সিংহ এসে গৌহাটি অধিকার করলেন, তারপর অগ্রসর হলেন উত্তর দিকে। কামরূপের সীমান্তে শাসনকর্তা তখন লাচিত বরফুকন। শাসনকর্তার পদ সৃষ্টি করেছিলেন রাজা স্বর্গনারায়ণ, আর এই পদের নাম রেখেছিলেন বরফুকন। যে মোমাইতামুলী একবার গৌহাটি অধিকার করেছিলেন, লাচিত তাঁরই যোগ্য পুত্র। তিনি রাম সিংহকে বলে পাঠালেন, ছ বছর আগে মীরজুমলা আমাদের হাতে হেরে সন্ধি করে গেছেন, আহোম রাজা আর দিল্লীর বাদশাহের অধীন নন, কর তাঁরা দেবেন না।

লাচিতের কথায় মোগল সেনা এগিয়ে এল। সারা ঘাটে যুদ্ধ হল বীর লাচিতের সঙ্গে। মোগল সেনা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। আহোম রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হল মানহা নদী পর্যন্ত।

লাচিত বরফুকনের পরে শোলা বরফুকন। তাঁর সময়ে মোগল সেনা আবার এল। ভয়ে তিনি যুদ্ধ না করে সন্ধি করলেন। গৌহাটির অধিকার গেল মোগলের হাতে। তাঁর পরে সন্ধিকি ফুকন আবার গৌহাটি উদ্ধার করেছিলেন। পরের বছর নবাব মকুর খাঁকে যুদ্ধে হারিয়ে ইনি কামরূপকে আহোম রাজার অধিকারে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এর পরে মুসলমানরা আর উপদ্রব করে নি। কামরূপ সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ তাদের ছিল না। দিল্লীর বাদশাহ দুর্বল হয়ে গেছে, আর বিদেশী বণিকরা এসে বাঙলায় উপদ্রব শুরু করেছে। তাদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

ইতিহাসের মধ্যে কতক্ষণ আমি ডুবে ছিলুম খেয়াল করি নি। আমার চমক ভাঙল অধ্যাপক হাজারিকার কথায়। ভদ্রলোক আমার ঘরে এসে বললেন : সকালেই অমন মোটা বই নিয়ে বসেছেন!

বইখানা মুড়ে আমি সোজা হয়ে বসলুম। বললুম : আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। বাড়ির হদিসটা কাল জেনে রাখলে আপনাকে আর কষ্ট করতে দিতুম না।

ভদ্রলোক বললেন : একে আপনি কষ্ট বলেন?

বললুম : অপ্রয়োজনীয় কাজ মানেই কষ্ট। এই আসা ও যাওয়ার সময়টা আপনি এর চেয়ে ভালভাবে ব্যয় করতে পারতেন।

ভদ্রলোক বসলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন : জীবনে প্রয়োজনীয় কাজ আমরা কতটুকু করি! আর প্রয়োজনের সংজ্ঞাও সকলের কাছে সমান নয়। যেমন, আমি এই আসাটাকে অপ্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করি নি, অথচ আপনার ঐ মোটা বইখানা পড়াই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

অধ্যাপক হাসতে লাগলেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম : চলুন, এবারে তাহলে দুজনের কাছেই প্রয়োজনীয় মনে হয় এমনি কোন কাজ করি।

বলে বেরিয়ে পড়লুম।

২৭

অধ্যাপক হাজারিকার বাড়িতে এসে তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। দুখানি ঘরের ছোট্ট একখানি বাড়ি, সামনে একফালি বারান্দা, পরিচ্ছন্ন আলোয় সেই বারান্দাটি ভরে আছে। সিঁড়ির দুধারে কয়েকটি ফুলের টবে জিরেনিয়াম আর জারবেরা ফুটে আছে। উপর থেকেও দুটি টব ঝুলছে, তাতে অর্কিড দেখছি। একটিতে ডাঁটা বেরিয়েছে, এবারে ফুল ফুটবে, সুন্দর রঙীন পর্দায় আধখানা জানলা ঢাকা। তারই সামনে দুখানি বেতের চেয়ার পাতা, আর একখানি নিচু টেবিল।

বারান্দায় আমাকে দাঁড়াতে দেখে অধ্যাপক হাজারিকা বললেন: ভেতরে আসুন।

চারিদিক এত পরিচ্ছন্ন যে জুতো পায়ে ঘরে ঢুকতে আমার দ্বিধা এল। কিন্তু সে এক মুহূর্তের, তারপরেই বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলুম। দরজার পর্দা সরিয়ে হাসিমুখে যিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁকে দেখে আমি প্রথমে চমকে উঠেছিলুম, বিস্ময় দূর হতেই আনন্দে মন ভরে গেল। মহিলার নমস্কারের উত্তর দিয়ে আমি ঘরের ভিতরে চলে এলুম।

মেঝেয় একখানি ছোট কার্পেট বিছানো, তার তিন ধার বেতের সোফা সেট, অন্য ধারে দেওয়ালের গায়ে একটা হালকা বুককেসে কিছু বই। সেণ্টার টেবলের উপর একটি ফুলদানিতে একগুচ্ছ অসময়ের মাধবীলতা। এক নজরে আমি আর একটি জিনিস দেখতে পেলুম, সেটি একটি তানপুরা, দেওয়ালের কোনায় দাঁড় করানো আছে।

মহিলা আমার মুখের দিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন, বললেন: বসুন।

পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না, তবু অধ্যাপক তাঁর কর্তব্য করলেন, বললেন : মিসেস মালতী হাজারিকা।

আমি বসবার পরে তাঁরাও বসলেন। তারপরে মিসেস হাজারিকা পরিষ্কার বাঙলায় বললেন : আমাকে দেখে অমন চমকে গিয়েছিলেন কেন ?

হেসে বললুম : খুব চেনা মনে হয়েছিল।

মিসেস হাজারিকাও হেসে বললেন : ঠিক স্বাতির মতো, তাই না!

বলে বুককেস থেকে একখানা বই বার করে আনলেন, মলাট দেওয়া বই, তার কয়েকখানা পাতা উলটে পড়লেন, দরজায় দাঁড়িয়ে কৃশাঙ্গী মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে আছে উত্তরের প্রতীক্ষায়। এমন সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আপনার নায়িকাকে ঠিক চেনা গেল না।

বলেই মিসেস হাজারিকা হেসে উঠলেন।

এ যে আমার কাছে কত বড় বিস্ময়ের কথা, ওঁরা তা বুঝলেন না। বাঙলায় আমি বই লিখেছি, আর সে বই দেখছি একজন অসমীয়া ভদ্রলোকের ঘরে। শুধু দেখা নয়, আমার লেখার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে দেখে পুলকে আমার রোমাঞ্চ হল। আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

অধ্যাপক হাজারিকা আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন। এবারে দেখলুম যে বাঙালা বোঝেন, আর বলতেও পারেন। বললেন : আপনার খুব ভক্ত।

মহিলা এবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : এখন আপনার কাছে বসতে পারব না, বসব হাতের কাজ শেষ করে।

বলে অত্যন্ত সহজ ভাবে উঠে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন : মা এখানে নেই, নওগাঁয়ে দাদার কাছে আছেন। সেদিন আমি তাঁকেই আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দাদার ছোট ছেলেটার অসুখ বলে আসতে পারলেন না। মা থাকলে আমরা নির্ভাবনায় থাকি।

বুঝতে পারলুম যে সংসারের সব কাজকর্ম এখন মিসেস হাজারিকাকেই করতে হচ্ছে।

অধ্যাপক হাজারিকার বয়স আমার মতোই হবে, কিংবা দু এক বছরের বড়। সংসারযাত্রাও সবে শুরু করেছেন বলেই মনে হল। চারিদিকে তার প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। আসবাবগুলি একেবারে নতুন, তার ঢাকনাগুলির রঙ একটুও ফিকে হয় নি। দরজা জানলার পর্দাও এই ঢাকনার মতো একই নক্শার। কতকটা আমাদের শ্রীনিকেতনের মতো নক্শা, আসামের নিজস্ব জিনিস, না মনিপুরের তা বুঝতে পারলুম না। বুককেসের ঠিক উপরের দেওয়ালে একটি মাত্র ছবি, সেটি রবীন্দ্রনাথের একখানি দাঁড়ানো মূর্তি। তারই নিচে বুককেসের কাঠের উপর একটি নিকেলের ফ্রেমে অধ্যাপকের নিজের ছবি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।

ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি যে লক্ষ্য করছিলেন তা বুঝতে পারলুম তাঁর কথা শুনে। বললেন: মালতী শান্তিনিকেতনে পড়েছে কিনা, তাই ওর সংসারেও শান্তিনিকেতনের ছাপ।

আমি বললুম: সবচেয়ে ভাল লেগেছে ঐ তানপুরোটা। মিসেস হাজারিকার ছুটি হলে গান শুনব।

অধ্যাপক খুশী হয়ে বললেন: শুনবেন বৈকি। ভেবেছিলাম দু একজন বন্ধুকেও বলব, কিন্তু মা আসতে পারলেন না বলে আর কাউকে ডাকলুম না।

আমি একাই মিসেস হাজারিকাকে খুব কষ্ট দিলুম।

না না, কষ্ট বলছেন কেন, এ তো আনন্দের কথা। আপনাকে বেশী করে কাছে পাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছি।

তৃষ্ণার মতো সৌজন্যেরও শেষ নেই। আমি তাই অন্য কথা বললুম: আপনার ভাল ভাল কথায় আমি কিন্তু ভুলব না। কাজের কথাটি আমি ঠিক মনে রেখেছি।

অধ্যাপক বললেন: আমারও মনে আছে। আপান বিহুর

সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিলেন। যতটুকু আমি জানি তা আপনাকে বলব, আর এই সময়েই বলব। একটু চা কিংবা কফি খাবেন ?

আমি মাথা নেড়ে বললুম : না।

না কেন ? আপনার কাছে গেলে তো আপনি চা কফি না খাইয়ে ছাড়েন না।

সেটা হোটেল বলে হুকুম করি। তারাও খুশী হয়, আমাদেরও মন্দ লাগে না। বাড়িটাকে হোটেল মনে করলে গৃহিণীদের উপরে অত্যাচার করা হয়।

ঠিক এই সময়েই মিসেস হাজারিকা ছোট একখানা ট্রের উপরে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে এলেন। আমার কথা বোধহয় শুনতে পেয়েছিলেন, বললেন : আপনার তো অন্য কোন নেশা নেই, এটুকু না দিলে আপনার ওপরেই অত্যাচার করা হবে।

মিসেস হাজারিকা টেবলের উপরে ট্রে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিলেন, আমি বললুম : আমার নেশার কথা আপনি জানলেন কোথায় ?

মহিলা হেসে বললেন : আপনার লেখা পড়েই আপনাকে আবিষ্কার করেছি। আপনি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা লেখেন না !

আমি হেসে বললুম : সত্যি কথা বলার সাহস কি সবার আছে ! ভালমানুষ সাজবার জন্যে অনেক সত্যি কথা চেপে যেতে হয়।

হাসতে হাসতে মিসেস হাজারিকা আবার অন্তঃপুরে ফিরে গেলেন।

অধ্যাপক প্রথমে চা ঢেলে আমাকে দিলেন, তারপর শোনালেন বিহুর কথা। বললেন : বহাগ বিহুর একটা নমুনা আপনাকে শোনাই। বহাগ মানে বৈশাখ, বৈশাখ মাসে এই বিহু গান।—

অতি মরমরে মুগারে মুহুরা
অতি মরমরে মাকু।

তাতো কোই মরমরে বোহাগর বিহুতি
নেপাতি কেনে কোই থাকো।

আবৃত্তি শেষ করে আমাকে প্রশ্ন করলেন: বুঝতে পারলেন কিছু ?

বললুম : না।

ভদ্রলোক বললেন: মুগার মুহুরি ও মাকু আমাদের অতি প্রিয়, কিন্তু তার চেয়েও প্রিয় বৈশাখের বিহু। এই বিহু পালন না করে কেমন করে থাকব বল ? আসামের এ অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাঁত আর রেশমি সুতো ও বোনার কাজ। তাই তারা প্রিয় বলতে বোঝে মুগার মুহুরি ও মাকু। বিহু হল সাধারণ লোকের গান, আদিবাসীদের পল্লীগীতির মতো স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে তার জন্ম। একটি নমুনা শুনুন। বলে অধ্যাপক আবৃত্তি করলেন—

ওপরে উরিলে কালিন্দ্রীভোমোরা
ভৈয়ামত পরিলে ছাঁয়া ;
সপোন সামাজিকত ফুরো একেলগে
কোনজনে করিছে দয়া।

একটি কথা প্রথমেই বলে রাখা দরকার। বিহু গীত বেশির ভাগই আদিরসাশ্রিত, এ কালের সভ্য মানুষের কাছে সুরুচির পরিচায়ক নয়। এই মন্তব্য সমস্ত গীতের বেলায় প্রযোজ্য যে নয় তা বলাই বাহুল্য। আমাদের কলেজের এক অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন যে এই বিহু উৎসবে প্রাচীন যজ্ঞের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়—মহাব্রত অতিরাত্র বিষবাহু প্রভৃতি প্রাচীন যজ্ঞ। অশ্বিনী-কুমারের উপাসনা দেখা যায় কাতি বিহুতে, মাঘ বিহুতে অগ্নির উপাসনা। তাঁর যুক্তিতর্কের কথা আমি বলতে পারব না, তার কারণ সে সব মনে রাখার মতো বিদ্যা আমার পেটে নেই।

আমি হেসে বললুম: আমারও তাতে প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক বললেন: যদি বলেন তো আপনাকে এক দিন তাঁর

কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি আরও একটি তত্ত্ব আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন।

কী সেটা ?

প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির ভূমাতার উৎসব। অস্ট্রিকরাই প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠন করে। বিহু উৎসবটি বোধহয় তাদেরই অবদান। এখনও বৈশাখ কার্তিক ও মাঘে বোহাগ বিহু কাতি বিহু ও মাঘ বিহু প্রচুর আনন্দের আমদানি করে। চিন্তা করলে এই উৎসবের একটা গূঢ় অর্থ খুঁজে বার করা যায়। ভূমিকর্ষণ ও শস্যদানকে নরনারীর মিলন ও সন্তানের জন্মদান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বৈশাখের উৎসবে তরুণ ছেলেমেয়েরা এসে একত্র মিলিত হবে, উদার আকাশের নিচে হবে তাদের উদ্দাম নাচ গান। ভূমাতাকে শস্যশালিনী করতে হবে। মাতা রজস্বলা হবেন অম্বুবাচীতে, তারপর আসবে শস্য বপনের সময়। কার্তিকে ভূমাতা শস্যভারে নত হয়েছেন, সেই শস্য সন্তানকে যথানিয়মে গ্রহণ করবার উৎসব হল কাতি বিহু। আর পৌষের শেষে উত্তরায়ণে মাঘ বিহুতে নবান্নের উৎসব। রাতে আগুন জ্বেলে তার চারিদিক ঘিরে আনন্দোৎসব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নাকি এই রকমের দৃশ্য আছে—উপাসকরা সোমপাত্র হাতে হোমকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরছেন মন্ত্রপাঠ করে।

অধ্যাপক হাজারিকা বললেন : এসব শাস্ত্রের কথা। আমাদের ঘরোয়া কথা অন্য রকম। বিহুর উৎসব হয় আশ্বিন পৌষ আর চৈত্র সংক্রান্তিতে, কিন্তু নাম কাতি বিহু মাঘ বিহু ও চত বা বহাগ বিহু। কাতি বিহুর কোন বিশেষ গান বা অনুষ্ঠান নেই বলে নাম কঙালী অর্থাৎ কাঙ্গালী বিহু, মাঘ বিহুতে নবান্ন ভোজনের উৎসব বলে নাম ভোগালী বিহু, তেমনি রঙালী বিহু বহাগ বিহুর নাম। এই বিহুতেই আনন্দ রঙ্গ সবচেয়ে বেশি, আগে মাসাধিককাল চলত, এখনও কয়েক দিন ধরে উদ্‌যাপিত হয়। শুধু এক গ্রামের নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও তরুণ ছেলে মেয়েরা এসে মিলিত হয়। অত্যন্ত সহজ তাদের

মেলামেশা, সরল তাদের গানগুলি, তার নাম বনগীত বা বনঘোষা। দু লাইনের এই সব গান গ্রামবাসীরাই বাঁধে। আবেগমধুর প্রেমের গান। প্রেম যেখানে দৈহিক মিলনে পর্যবসিত, আধুনিক রুচি সেইখানেই ধাক্কা খায়। বিহুনাম নামেও গান আছে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে তরুণেরা একত্র হয়ে যে উৎসবে মাতে তাকে বলে চেরি। এতে তরুণী বা বৃদ্ধরাও কখনও যোগ দেয়। উৎসবের পরে তারা গ্রামবাসীদের বাড়ি গিয়ে গান শোনায়—ধর্ম সংগীত বিহুনাম ও বনগীত। গ্রামবাসীরা সাধ্যমত তাদের অর্থাদি দেয়, প্রতিদানে তারা নববর্ষে গৃহস্থের কল্যাণ কামনা করে।

বিহু শুধু গান নয়, বিহু নাচও আছে। কখনও গ্রামে কোন গাছের তলায় বা খোলা জায়গায়, কখনও গ্রামের বাহিরে অরণ্যময় পরিবেশে এক বা একাধিক গ্রামের ছেলে মেয়েরা এসে মিলিত হয় নানারকমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। বিহু ঢোল হয় প্রধান যন্ত্র, তার সঙ্গে বাঁশি শিঙা মন্দিরা। বাঁশিকে বলে গগনা, পেঁপা শিঙার নাম, আর মন্দিরার নাম পাতিতাল। তাল দেবার জন্যে আড় বাঁশে তৈরি আর একটি যন্ত্র আছে, তাকে বলে টকা। গানের তাল দ্রুত বলে একঘেয়ে লাগে, সময় সংক্ষিপ্ত বলে নাচের বৈচিত্র্য নেই। ভাল লাগে ছেলেমেয়েদের সজীব রূপ দেখে।

বলে অধ্যাপক আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

আমি বললুম: বুঝেছি, কিন্তু নাচটা চোখের সামনে ভেসে উঠল না।

কথায় কি তা সম্ভব! তাহলে নেচেই দেখাতে হয়।

এ তো উত্তম প্রস্তাব।

কিন্তু নাচবে কে! তার চেয়ে একটু বোঝাবারই চেষ্টা করি। জনা আষ্টেক ছেলেমেয়ে নিন, তারা নাচবে। হয় তারা বৃত্তাকারে ঘুরে ফিরে নাচবে, নয় আগে পেছনে হেলেদুলে নাচবে। হাতের মুদ্রা দেখে মনে হবে যেন বসন্তের বাতাস দোল দিয়েছে গাছের পাতায়।

আমি বললুম : খুব ভাল বুঝেছি, সাধারণ লোকনৃত্যেরই মতো ভঙ্গি।

অধ্যাপক বললেন : ঠিক তাই। গান ও বাজনার সঙ্গে এগিয়ে এস আর পিছিয়ে যাও, কিংবা ঘুরে ঘুরে নাচ। পায়ের সঙ্গে হাতও দোলাতে হবে নানা ভঙ্গিতে।

বিহু আসামের জাতীয় উৎসবের মতো প্রিয়। রাজ্যের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে সমান ভাবে আদৃত। নওগাঁ শিবসাগর তেজপুর ও লখীমপুরে এখনও বিহু খুব জনপ্রিয়। উপজাতিদের মধ্যেও এই উৎসব ছড়িয়ে পড়ছে—মিরি মিকির ও বড়ো কাছারিদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, নেফার কিছু উপজাতি এমনকি জয়পুরের নাগাদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন অসমীয়া ভাষায় তেমনি মিরি বড়ো প্রভৃতি উপজাতীয়ের ভাষাতেও বনগীতি রচিত হয়েছে।

উৎসবের আগে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিষ্কারে লেগে যাবে, ঘরের অঙ্গন থেকে নদীর ধার পর্যন্ত বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে দেখবে। তারপর বাজবে বিহু ঢোল, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবে সেই শব্দ, নদীর ধার থেকে অরণ্যে পর্বতে, রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবে।

অধ্যাপক বললেন : একবার না দেখলে এই বিহুর সম্বন্ধে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ হবে না। এরকমের উৎসব ভারতের আর কোথায় আছে আমি জানি না।

আমিও জানি না।

তারপর অধ্যাপক হাজারিকা আমাকে অন্যান্য লোকসংগীত ও লোকনৃত্য সম্বন্ধেও কিছু বললেন। বিহুর পরেই বিয়ানাম। সামাজিক বিবাহে জোরন দিয়ার নাম, পানীতুলা ও বিয়াসময়ত নাম। জোরন দিয়ার নাম মানে গায়ে হলুদের গান।

আমি বললুম : একটা নমুনা শোনান না।

অধ্যাপক বললেন : বিপদে ফেললেন।

তারপরেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রথমটায় আমি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নি, তারপরে বুঝলুম। মালতী হাজারিকা তাঁর শাড়ির আঁচল সামনের দিকে টেনে অধ্যাপককে অনুসরণ করে ঘরে এলেন। সহাস্যে বললেন : কী বিপদ হয়েছে ?

বললুম : একটা জোরন দিয়ার নাম শুনতে চেয়েছি।

মালতী হেসে বললেন : নিজের বিয়ের কথাই উনি ভুলে গিয়েছেন, উনি শোনাবেন জোরন দিয়ার গান !

বলে গুনগুন করে গাইলেন :

ওলাই আহা সখী প্রভা রাজ্যের মহাদৈ।
শুভক্ষণে যাত্রা করি জোরন দিয়া গৈ ॥
খারু লোবা মণি লোবা কুন্তত সাতে সরি।
তেল সিন্দুর ফণী কাকৈ লোবা সরাই ভরি ॥

মালতী থামতেই আমি বললুম : শুধু গায়ে হলুদের কথা নয় বিয়ের কথাও আপনার কাছে শুনব।

মালতী বললেন : আর একটুখানি অপেক্ষা করুন, আমার আর বেশি দেরী নেই।

বলেই অন্তর্হিত হলেন।

অধ্যাপক প্রচুর উৎসাহে বললেন : বিয়ের ব্যাপারে আর এক রকমের গান আছে, তার নাম জোরানাম বা খিচাগীত। বরকন্যার আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে রঙ্গ তামাশা বলে যেমন ভাবে তেমনি ভাষাতেও হালকা। এই খিচাগানে বিয়ের পুরুতঠাকুরও পরিত্রাণ পান না।

শুধু মানুষের বিয়ে নয় ব্যাঙের বিয়েরও গান আছে, তার নাম ভেকুলী বিয়ার নাম। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে এই উৎসব পালন করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে। মশা নিবারণের জন্যেও আছে গান—কামরূপে মহো-হো ও পশ্চিম অঞ্চলে মহ খেদোয়া গীত। অল্প বয়সের ছেলেরা শীতের প্রারম্ভে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মা শীতলার গানের নাম আইনাম। লক্ষ্মী ও সুবচনীর গানও আছে। বৈষ্ণবদের গোঁসাই নাম, জুনা নামের গাথা দেহ বিচারয় গীত ও বারমাস্যার কথাও অধ্যাপক বললেন। বাঙলার গ্রামেও এই রকমের লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে।

এক সময় অধ্যাপক বললেন: আপনার জন্যে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। যা আমার বিষয় নয়, যা জানবার চেষ্টাও কোন দিন করি নি তাও আপনার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে হয়েছে। বিহু নাচের কথা জানতে গিয়ে আরও কিছু লোকনৃত্যের কথা জেনে ফেলেছি।

আমি বললুম: ভালই তো হয়েছে, বলুন না কিছু।

অধ্যাপক বললেন: মনসা পূজায় দেবনারী বা দেওধনীর নাচ। এই নাচের জন্য কোন মেয়েকে সারা জীবন কুমারী থাকতে হয়। নিজে হাতে পালিত একটি পায়রা কেটে তার রক্ত পান করে নাচ আরম্ভ হবে। এলোকেশী দেওধনীর সঙ্গে আরও আটজন বৃত্তাকারে নাচবে। নাচের সঙ্গে ঢাক বাজবে আর মন্দিরা। বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে দেওধনি লুটিয়ে পড়বে, কোন দিন দেবতার ভর হবে তার ওপরে, তখন সে অনেক অলৌকিক কথা বলবে। এই নাচকে বলে ভর নৃত্য।

পশ্চিম আসামে আছে ভাটিয়া ও বহুয়া নামের হাসি তামাশার নাচ গান। বহুয়া মানে বিদূষক। মাঝে মাঝে এই নাচ গান শালীনতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় বলে শুনেছি। ঢুলিয়াদের নানা রকম সার্কাসি নৃত্য আছে, তাকে লোকনৃত্য বলা বোধহয় উচিত হবে না। ওজা-পানি সম্বন্ধে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। শুনেছি, ওটা বৈষ্ণবদের ক্লাসিকাল ব্যাপার। বৈষ্ণব নাটককে বলে ভাওনা, এরই সঙ্গে নাচ। ছোঁ আর মুখাও নাকি ব্যবহার করা হয়।

ছুটি নতুন শব্দ শুনে আমি বললুম: সে আবার কী?

অধ্যাপক নিজের ভাষা ব্যবহার করেছিলন বলে লজ্জিত হলেন,

ইংরেজী মানে বললেন : মুখা মানে মুখোশ। আর ছোঁ মানে দেহের পূর্ণ আচ্ছাদন।

আমি বললুম : তারপর ?

অধ্যাপক বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, বললেন : এর বেশি আমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। তার দরকারও নেই।

বলে মালতী হাজারিকা এসে উপস্থিত হলেন। শাড়ি পরেছেন বাঙালী মেয়ের মতো, আর সদ্যস্নাত কেশদাম পিঠের উপর এলিয়ে দিয়েছেন। এক মুখ হাসি নিয়ে আমাকে বললেন : আসুন।

অধ্যাপক বললেন : চেয়ার টেবিল আমাদের নেই, খেতে কষ্ট হবে না তো !

উত্তর দিলেন মালতী, বললেন : কষ্ট হলেও আর উপায় নেই।

আমি বললুম : আমাকে কি বিদেশী বলে মনে হচ্ছে !

আমার উত্তরে অধ্যাপক খানিকটা আশ্বস্ত হলেন।

সংসারের কাজকর্ম চুকিয়ে মালতী হাজারিকা আমাদের কাছে এসে বসলেন। বললেন : এইবারে আমার ছুটি।

আমি বললুম : আপনার ছুটি এইবারে শেষ হল। এখন আমি আপনাকে কাজ দেব।

এতক্ষণ কি আমার কোন কাজ ছিল না ?

সে আপনার সংসারের কাজ। এমন ব্যস্ত থাকতে হবে জানলে আমিই আপনাদের টেনে নিয়ে যেতুম। আমার সংসারে আমাকে খেটে খেতে হয় না।

আপনি তো একটা হোটেলে আছেন শুনলুম।

ঐ রকম সংসারই আমি পছন্দ করি। একটা অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য যুদ্ধ করতে হয় না।

বাধা দিয়ে অধ্যাপক হাজারিকা বললেন : কাকে অপ্রয়োজনীয় কাজ বলছেন! একটু আগে আমরা যে কাজ করলাম তারই জন্যে তো তুনিয়া চলছে। পেটের দাবী ফুরিয়ে গেলে যে পৃথিবীটাই থেমে যাবে।

তর্কের শেষ নেই। তাই প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য মালতীকে আমি বললাম : পথে আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে আমি আপনাকে বাঙালী ছাড়া অন্য কোন দেশের মেয়ে বলে ভাবতে পারতুম না।

মালতী হেসে বললেন : খাঁটি অসমীয়া বলে চিনতে আপনার একটুও ভুল হত না।

কেন ?

আজ আপনার সম্মানের জন্যে শাড়ি পরেছি। তা না হলে আমরা মেখলা চাদর পরি।

মেয়েদের এ পোশাক আমি দেখেছি। মেখলা মানে সায়ার মতো

একটা পোশাক, ঘাগরা বা গাউনের মতো খাটো নয়, একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা নানা বর্ণে বিচিত্র ও সুন্দর একটা পোশাক। চাদরটি পাঞ্জাবীদের দোপাট্টার মতো ছোট ও পাতলা নয়, কতকটা শাড়ির মতো কোমর জড়িয়ে বুকের উপরে উঠেছে। প্রথমটায় শাড়ি বলেই মনে হয়, তার পরে বোঝা যায় তফাৎটা। কাজেই স্বীকার করতে হল যে নারী বিচিত্ররূপিণী, তাকে চিনতে পারি এ অহংকার পুরুষের বোকামি।

অধ্যাপক সহাস্যে বললেন: এইবারে একটা সত্য কথা বলেছেন। এই জ্ঞানের অভাবে আমি সারাক্ষণ ঠকছি।

আমি বললুম: ঠকছেন না জিতছেন সে আলোচনা করব না, আমি আপনাদের বিয়ের গল্প শুনব বলে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

অধ্যাপক তাঁর স্ত্রীকে বললেন: বল এইবারে।

মালতী অমনি তাঁর স্বামীকে বলল: তুমি বল।

আমি বললুম: দুজনেই বলুন।

কে বলবেন এই নিয়ে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক হল, তারপর ঠিক হল যে মালতী তাঁর এক বান্ধবীর বিয়ের গল্প বলবেন, নিজেরটা তাঁর ভাল মনে নেই, তার কারণ তিনি তখন চোখ বুজে ছিলেন।

অধ্যাপক টিপ্পনী কেটে বললেন: বিয়েটা ওঁর অজ্ঞাতসারেই হয়েছিল।

আমি বললুম: কথাটা মিথ্যা নয়, বিয়ের সময় মেয়েরা কেউ ভয়ে কেউ দুঃখে কেউ বা আনন্দে একটু বেসামাল থাকেন। ওটা স্বাভাবিক, ওটা না হলেই মেয়েদের মেয়ে বলে মনে হবে না।

মালতী বললেন: আনন্দে বলবেন না, বলুন আতঙ্কে।

তারপরে মালতী হাজারিকা আমাদের যে বিবাহের কথা বললেন তা অসমীয়া বিবাহ পদ্ধতি বলে দাবী করলেন না। বললেন: বৈদিক বিবাহ হিন্দুদের বোধহয় একই রকম, যা তফাৎ তা হল

স্ত্রী-আচার। এই স্ত্রী-আচার এক এক জায়গায় এক এক রকম, একই জায়গাতেও আবার পরিবার ভেদে প্রভেদ আছে।

অনেক দিন আগে আসাম ও বঙ্গদেশে বিবাহ পদ্ধতি নামে একখানি বই আমি দেখেছিলুম। বিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী তার লেখক। শুনেছিলুম যে এই ভদ্রলোক আসাম ও বাঙলা দেশে অনেক ঘুরে বহু তথ্য সংগ্রহ করে এই বই লিখেছিলেন। অনেক বিখ্যাত পরিবারের বিবাহ পদ্ধতি এতে লিপিবদ্ধ আছে। মালতী তাঁর এক বন্ধুর বিবাহের কথা বললেন।

পঞ্জিকা দেখেই বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, কন্যাজোড়াও-এর দিনও। কন্যাজোড়াওকে বাঙলায় বলে পাকা দেখা, এতে সোনার আংটি দেওয়া হয় বলে অনেকে আংটি পিন্ধোয়া বলে। জোড়ন পিন্ধোয়া নামে আর একটি উৎসব আছে। বিয়ের দুদিন আগে বরের বাড়ি থেকে তত্ত্ব আসে, তেল-সিঁদুর বস্ত্রালঙ্কার খাদ্যদ্রব্য মাছ আর মাটির ঘট। জোড়ন পিন্ধোয়ায় কনে এইগুলি ব্যবহার করে।

বর কনেকে স্নান করানো বিবাহের একটা বিশেষ অঙ্গ। বিয়ের দিন স্থির হলেই উঠোনে একটি কলাগাছ পোঁতা হয়, তারই নিচে কলাপাতা বিছিয়ে স্নান। জোড়ন পিন্ধোয়ার পরে পানীতুলা, বিয়ের আগে বাড়ির মেয়েরা যাবে নিকটবর্তী কোন নদী বা পুকুরে জল আনতে। সেই জলে বর-কনে তাদের নিজেদের বাড়িতে স্নান করবে। ঠিক এর পরেই হবে মুরত চাউল দিয়া। স্নানের পরে বর কনেকে তাদের পিঁড়ি থেকে নামতে দেওয়া হবে না। পাঁচ-সাত জন এসে তাদের মাথায় আতপ চাল ছড়িয়ে দেবে। তারই সঙ্গে মুরত চাউল দিয়া নাম গান করবে। এই অনুষ্ঠানটি হয় বর কন্যার শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনায়। তারপর বর বা কনের মা বা অন্য কোন মহিলা মাথায় একটি ঘট নিয়ে নোয়নি ঘরে যাবে, সেই ঘরে হবে তাদের সাজসজ্জা। তার আগে মাছ-হলদি মাখিয়ে স্নান। স্নান করে তারা আলাকাট বস্ত্র মানে নতুন কাপড় পরবে।

আর একটি অনুষ্ঠান এদেশে বিশেষ প্রচলিত। বিবাহের আগের রাতে উপবাসী কনের সামনে কুলা-বুঢ়ীর নাচ। কোন বালক বা বালিকা পিঠে একখানা কুলো বেঁধে কুলা-বুঢ়ী সাজবে, তারপরে কুঁজো হয়ে কনের সামনে খানিকক্ষণ নাচবে। একবার এগিয়ে আসবে, আর একবার যাবে পিছিয়ে। এই হালকা নাচের নামই কুলা-বুঢ়ীর নাচ।

এর পরে বিবাহ: সেজেগুজে বর আসবে কনের বাড়ি। বরযাত্রীদলের সঙ্গে বরকে ঘিরে গান গাইতে গাইতে একদল মেয়েও আসবে। বর এলে কন্যাকর্তা যাবেন এগিয়ে, সঙ্গে পুরোহিত আর ধূপদীপ গন্ধপুষ্প মাল্য বস্ত্র ও তাম্বুল। বরকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করে অভ্যর্থনা করতে হবে। তারপরে বর বিবাহ-বাসরে বসলে দু-পক্ষের মেয়েরা জোড়ানাম গাইবে।

তারপরে অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ। কন্যার পিতা বর-কন্যার মাথার চুল একসঙ্গে হাত দিয়ে ধরে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। এই ভাবেই কন্যার গোত্র ছেদন্ করে বরের গোত্রে তাকে আনা হয়।

পরদিন প্রভাতে বর কন্যাকে নিয়ে নিজের বাড়ি ফেরে। এই যাত্রার সময় আর একটি অনুষ্ঠান আছে, তার নাম দুয়ার ধরি উলিয়াই দিয়া। কনের মা দরজা আগলে দাঁড়াবেন, তাঁর এক হাতে ধূপ আর এক হাতে দীপ। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এগিয়ে আসবে বর কনে। তারা এক দিকে মাথা নুইয়ে অন্য হাতের তলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। মেয়েরা উলু দেয়, শাঁখ বাজায় আর গান গায় সুর করে। মেয়ে বোধহয় মায়ের গলা জড়িয়ে কাঁদবার সুযোগ বেশি পায় না।

বরের বাড়িতেও অনেক অনুষ্ঠান আছে। তার মধ্যে প্রথম হল আগ চাউল দিয়া। কনেকে নিয়ে বর আসতেই বরের মা এসে দুজনকে একখানা মাদুর বা কার্পেটের উপরে বসাবেন। আগ চাউল দিয়া অনুষ্ঠানটি হলেই বিবাহ বৈধ হল। তারপরে ভোজ হবে আত্মীয় কুটুম্বদের। বর সবার সঙ্গে খাবে, তারপরে কনে খাবে বরের পাতে।

রাতে ফুলশয্যাও আছে, তার নাম তোলনি বিয়া। এখানেও গান। নামতি আইরা গাইবে ফুলশয্যা নাম।

এতক্ষণ আমি একটি কথাও বলি নি। এইবারে বললুম: ফুলশয্যার পরেই তো বিয়ে শেষ। এইবারে একটি ফুলশয্যা নাম গেয়ে শোনান।

এ ব্যাপারে মালতী বেশ সপ্রতিভ, হেসে বললেন: এ সব গান একা হয় না, পাঁচজনে মিলে গাইতে হয়।

বলে গুনগুন করে গাইলেন:

শ্যামে হারিলে দিবে মুরলী বাজন,
রাইএ হারিলে দিবে ছুরতী যৈবন।
দশ দশ বলিয়া পাশা ঢালিল পাটিতে,
শ্যামে হারিল পাশা রাইএর সাক্ষাতে।
শ্যামেও হারিল পাশা রাইও হারিল,
হারিয়া আনন্দ মনে মন্দিরে চলিল।

মালতী থামলে আমি বললুম: ভারি সুন্দর গান।

অধ্যাপক বললেন: গানখানি সুন্দর, না গানখানি গাওয়া হল সুন্দর, আপনার মন্তব্যে তা বোঝা গেল না।

আমি হেসে বললুম: গানখানি ভাল গাওয়া না হলে তা সুন্দর মনে হত না।

মালতী বললেন: গান আমি কখন গাইলুম! আমি তো কবিতা শোনালাম।

এমনি করে একটু নাচও শোনান না। বিয়েতে কোন নাচ নেই?

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বললেন: কুলোখানা আনব? দেখাবে কুলোবুড়ীর নাচ?

মালতী তার স্বামীর দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বললেন: কুলোবুড়ীর নাচ তুমি দেখাও। আমি ওঁকে বউনাচের কথা বলি। দক্ষিণ আসামের কথা, ওই অঞ্চলে প্রধানত বাঙলাভাষীদেরই বাস।

বাড়িতে নতুন বউ এলে এই নাচ হবে। দুদিকে আটদশ জন মেয়ে ঢোল কাঁসি সানাই নিয়ে দাঁড়াবে, তারা প্রথমে নাচবে ধামাইল গানের সঙ্গে। ধামাইল গান বোধহয় আপনি জানেন না?

বললুম: না।

রামকৃষ্ণলীলার গান। নাচের সঙ্গে মেয়েরা নিজেরাই গান গায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: নতুন বউ কী করে?

মালতী বললেন: নতুন বউ না নাচলে বউনাচ কেন বলবে!

সত্যিই তো। ভারি কষ্ট বেচারি বউয়ের, শ্বশুরবাড়ি আসতে না আসতেই সবাই মিলে তাকে নাচাবে!

মালতী আমার মন্তব্য শুনে হেসে ফেললেন, বললেন: বেচারি নতুন বউয়ের চেয়ে অন্য বউ মেয়েদেরই কষ্ট বেশি, তাদের পরিশ্রম করে নাচতে হয়। একটুখানি হাত দোলালেই বেচারি বউয়ের ছুটি। তবে তার জন্যে তাকে সাজসজ্জা করতে হয়—নাকে নথ কানে কানবালা সিঁথিতে মোর, হাতে মণিবন্ধ আর পায়ে রূপোর নূপুর। মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে বড়দের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য দেবে, তার পরে আর একখানি ধামাইল গান শুরু হলে বাজনার তালে তালে একটুখানি হাত দোলাবে। বউ যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছে, এমনি ধীর মৃদু তার পদক্ষেপ, তা না হলে প্রথম দিনেই শালীনতার অভাব ঘটবে যে!

গম্ভীর ভাবে বললুম: বটেই তো, নাচতেও হবে, অথচ কেউ নাচুনি ভাববে না।

আমার কথা শুনে অধ্যাপক হাসলেন, বললেন: লোকনৃত্য সম্বন্ধে যদি কিছু জানবার থাকে তো এঁর কাছে জেনে নিন।

মালতী বললেন: নাচ আপনার ভাল লাগে বুঝি?

বললুম: সবই আমার ভাল লাগে।

মালতী হেসে বললেন: এ আপনার সৌজন্যের কথা। আজ যে আপনার ওপর আমরা অত্যাচার করছি এ নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগছে না!

তাহলে আপনারা আমার ওপর অত্যাচার করছেন, না আমি আপনাদের আক্রমণ করেছি, আগে তারই বিচার হওয়া দরকার।

অধ্যাপক গম্ভীর হয়ে বললেন: তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল।

আমি সহাস্যে মালতীকে অনুরোধ করলুম: বলুন এইবারে।

মালতী বললেন: বড়ো কাছারীদের নাচ দেখেছেন?

বললুম: না।

দেখবেন, ভাল লাগবে আপনার। এত রকমের নাচ আর কোন জাতের মধ্যে প্রচলিত নেই। কিছু দিন পরে তাদের প্রধান পার্বণ খেরাই। সাধারণত নবেম্বর মাসে এই উৎসব হয়। এ ছাড়াও আছে অনেক উৎসব অনুষ্ঠান—ঋতু উৎসব আর ধর্মের অনুষ্ঠান। শিব ও পার্বতী হলেন প্রধান দেবতা, তাঁদের অনেক নাম। সাধারণত তাঁরা বুঢ়াবুঢ়ী নামেই পরিচিত। অন্য নামগুলি আপনি মনে রাখতে পারবেন না। মনসা পূজা উপলক্ষেও পশ্চিমাঞ্চলের বড়োদের মধ্যে এক রকমের নাচ গান প্রচলিত আছে।

একটু থেমে মালতী বললেন: কাছারীদের মধ্যে এত রকমের নাচ আছে যে বলতে শুরু করলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন।

নাচের নামগুলিও বড় অদ্ভুত—গরাই-দবনাই-নাই ঘোড়ার উপরে যুদ্ধের নাচ, নেউলাই-গেলে-নাই নকুল নৃত্য, শাখলাও-লি হল তরোয়াল নৃত্য, মেয়েরা নাচে তরোয়াল হাতে, আর খাইজামা-ফনাই পুরুষদের তরোয়াল নাচ। যে নাচে সীমানা নিয়ে লড়াই তার নাম সান-গলাও বনাই। কোক্‌রাঝার নামে একটা জায়গার নাম শুনেছেন?

বলে মালতী আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: শুনেছি।

শুনেছেন!

মালতীর চেয়েও বেশি আশ্চর্য হলেন অধ্যাপক। বললেন: আশ্চর্য! কী প্রসঙ্গে আপনারা এ জায়গার নাম শুনলেন!

আমি হেসে বললুম: যে গাড়িতে গৌহাটি আসছিলুম সেই গাড়িতেই একজন কোক্‌রাঝারের যাত্রী ছিলেন, তিনি ফকিরা গ্রাম জংসনে নেমে ছিলেন, বলেছিলেন যে ধুবড়ী যাবার পথে ঐ স্টেশনটা পড়বে।

অধ্যাপক খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন: বেশ মনে রেখেছেন তো নামটা।

বললুম: ভদ্রলোক একদিন এখানে এসে পড়তে পারেন। তাঁর কাছে একবার যাবার জন্যে নিমন্ত্রণও করেছেন।

মালতী বললেন: সুবিধে হলে একবার নিশ্চয়ই যাবেন সেখানে। বড়ো কাছারীদের খেরাই পার্বণের সময়েই যাবেন। নতুন অভিজ্ঞতা হবে। খেরাই সারারাত্রির অনুষ্ঠান। অনেক রকমের নাচ দেখতে পাবেন—দাও-থাই-লঙ-নাই, খাক্রি-সিপ-নাই, বরাই-মসা-নাই, ইত্যাদি।

আমি বললুম: এসব নাচের কথা কি সংক্ষেপে বলবেন?

মালতী হেসে বললেন: মনে রাখতে পারবেন কি?

মনে রাখার ভার মনের উপরেই ছেড়ে দিয়েছি। কী মনে রাখবে আর কী রাখবে না, তা মনই ঠিক করে নেয়।

বেশ বলেছেন।

বলে মালতী আমাকে খুব সংক্ষেপে এই সব নাচের কথা বললেন। দাও-থাই-লঙ-নাই নাচে এগার জন মেয়ে তিন সারিতে দাঁড়াবে চার তিন চার, হাতে তাদের এক একটি ভাণ্ড। প্রথমে সারিবদ্ধ ভাবেই নাচবে, তারপর নাচবে বৃত্তাকারে। খাক্রি-সিপ-নাই মানে ছাতা ঘুরনো নাচ। কিন্তু সত্যি সত্যি কারও হাতে ছাতা থাকে না। যে মহিলারা নাচে, তাদের এক হাতে থাকে ঢাল আর অন্য হাতে একখানি বেতের থালা। হাতে তরোয়াল নিয়ে যে নাচ তার নাম বরাই-মসা-নাই।

মালতী বললেন: ভাববেন না যে এইখানেই খেরাই শেষ হয়ে গেল। পুরোহিত পুজো করেন, তাঁর পুজো শেষ হলে তিনি মাঠের ফসলের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। তার উত্তর দেয় দেওধনি। তারই উপরে ভর হয় দেবতার। এই উৎসবে আর একজন লোক আছেন। তাঁর নাম মাইনাও, তিনি ধান ক্ষেতের রক্ষক। সবশেষে তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়।

এদের নাচে বাদ্যযন্ত্র অনেক বেশি। ঢোল আছে, তার নাম খাম, করতাল আর দু রকমের বাঁশি, নাম চিফুং আর গণ্ডিনা, বীণা আর সারেঙ্গীর মতো বিঙ্গি ও বের্জা। মেয়েরাও সব ঝকঝকে পোশাকে নাচবে। ভাল লাগবে আপনার, কোথা দিয়ে রাত কেটে যাবে টেরই পাবেন না।

আমি বললুম: আমার যতদূর মনে পড়ে এরা একবার দিল্লীতেও নাচতে গিয়েছিল।

খুশী হয়ে মালতী বলল: ঠিক বলেছেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে লোকনৃত্যের যে প্রতিযোগিতা হয় তাতে এরা দুটো নাচ নেচেছিল—বাগরুম্বা ও মাইগাইনাই। বাগরুম্বা একটি সুন্দর প্রাণবন্ত নাচ, বড়ো মেয়েরা খোলা আকাশের নিচে নাচে। মাইগাইনাইতে পুরুষ ও মেয়ে দু দলই নাচে ফসল কাটার নাচ। পুরুষদের হাতে কাস্তে, আর মেয়েদের কলস। নাচ দেখিয়ে দিল্লীবাসীকে তারা খুশী করেছিল।

অধ্যাপক হেসে বললেন: নাচের কথা শুনে নিজেদেরই নাচতে ইচ্ছে করছে।

আমি বললুম: মন্দ কি, হোক না একটু নাচ।

মালতী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনারা দুজনে একটু নাচুন, আমি একটু চা করে আনি।

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

বিদায় দেবার সময় মালতী হাজারিকা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আসাম সম্বন্ধে কিছু লিখবেন না ?

হেসে বললুম : একজন প্রাচীন পণ্ডিত লেখক আমাকে বলেছিলেন যে কোন দেশ ভাল লাগলে তবেই সে সম্বন্ধে কিছু লিখবেন।

মালতী তখনই বললেন : আসাম বুঝি আপনার ভাল লাগে নি !

বললুম : কতটুকু দেখেছি আসামের ! শুধু গৌহাটি আর শিলঙ নিয়েই তো আসাম নয়, আর সমতলবাসী মানুষের কথা জেনেই লেখা যায় না আসামের কথা। আসামের ঐশ্বর্য আমি কতটুকু দেখেছি বলুন।

অধ্যাপক বললেন : তাহলে কি আপনি মনে করেন যে এ দেশেও কোনও ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবেন ! কিন্তু আমাদের কবি ভোলানাথ দাস কী বলেছেন জানেন ?

বলে একটি কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করে শোনালেন।—

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত
আসাম কেবল আজিও ঘৃণিত।…
নাই বিদ্যাগুণ শিল্পে অনিপুণ
নামমাত্র কৃষি বাণিজ্য নাই
নাই উদারতা নাই সহিষ্ণুতা
নাহিক মমতা পরোপকারিতা।…
আছে অহিফেন চিরদরিদ্রতা।…
ছি ছি অসমীয়া, উঠা উঠা উঠা
চিরনিদ্রা নড়ি মেলা চক্ষু দুটা।

মালতী বললেন : তাহলে আর এক মিনিট বসুন, আমি আপনাকে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার একটা রসরচনার খানিকটা পড়ে শোনাই।

বলে তাঁর বুককেস থেকে একখানা বই বার করে খানিকটা পড়ে শোনালেন। রচনার শিরোনামা অসমীয়া জাতি ডাঙর জাতি। লেখক লিখছেন :

আমার নাই কি ? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে, ব্রহ্মপুত্র আছে, দীঘৌ আছে, অসমীয়া শেক্সপীয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব রম আছে, অসমীয়া মার্টিন লুথার আছে। অসমীয়ার কলকারখানা বা নাই ? কুঁহিয়ার পেরা কলর পরা এন্দুর মরা কললৈকে, বাড়ীয়ে ধাপে অসমীয়ার কলর অন্ত নাই। বিলাতত টেমচ্ আমার দীঘৌ, বিলাতত জাহাজ আমার খেলনাও…

মোমাই তামুলী বরবরুয়া, নরকাসুর ভগদত্ত, নরনারায়ণ রজা… অনন্ত কান্দলী, মণিরাম দেবান, শঙ্কর দেব…

এই এটাইবোর অসমীয়া তেন্তে 'আউর ক্যা ম্যাংতা হেয়' অসমত পকা ঘর নাই—

সেই বারে পাহরে যে অসমত ভূঁইকপ আছে। আকৌ কয় অসমীয়ার টকা নাই—

অসমীয়া মানুহ মৌন মূর্খ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিন্ত চর্চা বঢ়াই অনর্থর গুটি সিঁচিলব কারণ অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।

পড়া বন্ধ করে মালতী বইখানা মুড়ে রাখলেন। আমি হাসতে গিয়ে হাসতে পারলুম না। স্বামী-স্ত্রীর কারও মুখে এতটুকু কৌতুক নেই, বিষণ্ণ দৃষ্টি বেদনায় ছলছল করছে। আমি এই বেদনা বুঝি। এ তো শুধু আসাম ও অসমীয়াদের কথা নয়, এ সারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কথা। কী ছিল তাই নিয়েই আমাদের গর্ব, কী আছে আর কী নেই তা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না, কী হতে পারে তা নিয়েও নেই আমাদের মাথাব্যথা। দেশকে যারা ভালবাসে তাদের চোখে তো জল আসবেই, তাদের মন যে সারাক্ষণ কাঁদে।

অধ্যাপক সেদিন আমাকে আর কিছু বলেন নি, একটা রিকৃশা

ডেকে আমাকে তার উপর তুলে দিয়েছিলেন। পরে একদিন নিজেদের কথা বলেছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর বড় বৈজ্ঞানিক হবার ইচ্ছা ছিল, এমন কিছু আবিষ্কার করবেন যে সারা বিশ্ব আশ্চর্য হয়ে যাবে, গৌরব হবে তাঁর দেশের। মালতী এই কথা কার কাছে শুনেছিলেন তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁর এই উচ্চাশার জন্যেই যে মালতী তাঁকে বিয়ে করেছেন তা তিনি ভাল করেই জানেন। মালতী তাঁর দারিদ্র্যের কথা জানতেন, আর লুকিয়ে একটা চাকরির চেষ্টাও করছেন। স্বামীকে বিদেশ থেকে ঘুরিয়ে আনবার জন্যে মালতীর যত্নের যেন শেষ নেই।

তারপরে বললেন: লুকিয়ে লুকিয়ে বোধহয় কিছু লেখে, আর কোথাও পাঠায়। ছাপা হয় কিনা জানি নে।

আমি বললুম: একটু গোয়েন্দাগিরি করলেই জানতে পারবেন।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: আপনার টেবিলে দু-তিনখানা সাময়িকপত্র দেখেছি। সংঘমিত্রা নামে একজন সব কাগজেই লিখেছেন। একটু চেষ্টা করলেই এই ছদ্মনামের মানুষটিকে আবিষ্কার করতে পারবেন।

অধ্যাপকের চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

বললুম: ভয় পাবেন না, এ খুব কঠিন কাজ নয়। লেখাগুলো যত্ন করে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

তারপরে আমি বলেছিলুম: আপনারা আমার অনেক যত্ন করেছেন, উপকারও করেছেন অনেক। সেইজন্যেই আমার সন্দেহের কথাটি বললুম। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা কিনা, তাইতেই সন্দেহ হয়েছে। নিজের স্ত্রীকে আরও গভীরভাবে আবিষ্কার করুন।

এঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেদিন আমি হোটেলে ফিরি নি। ব্রহ্মপুত্রের তীরে গিয়ে বসেছিলুম। এক দিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে, আর অন্য দিক থেকে অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। হেমন্তের বাতাসে লেগেছে হিমের ছোঁয়া।

আমি ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকালুম। জলে কোন আবর্ত নেই, শান্ত জলস্রোত গভীর ভাবে বইছে। অন্ধকার সেখানে ঘন হয় নি, অস্পষ্ট আলোয় আমি স্রোতের গতি দেখতে পাচ্ছি। মানুষের জীবনের স্রোতও এমনি। মনে হয় বইছে না, অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু তা হয় না, জীবনের স্রোত কোন দিন থামে না, সময়ের গতির মতন বয় সারাক্ষণ। দূর থেকে যা দেখা যায় না, কাছে এলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক হাজারিকা ও মালতীর কথা আমার মনে পড়ছিল। মালতীকে বড় চেনা চেনা মনে হয়েছে। এমনি করে কে আমাকে কোথায় খাইয়েছিল তাই ভাবছিলুম। অনেকক্ষণ পরে সেই কথা মনে পড়ল। কাশ্মীরে স্বাতি আমাদের খাইয়েছিল নিজের হাতে রেঁধে। হাউসবোটের ভিতরে বসে আমরা খেয়েছিলুম। মামা মামী আমি আর স্বাতি। স্বাতির সে রান্না আমার অপূর্ব লেগেছিল, তার চেয়েও ভাল লেগেছিল তার আনন্দ।

অমন করে আর বোধহয় আমরা বেড়াতে পারব না। মামা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এমন বেয়াড়া অসুখ যে শরীরের চেয়ে মনটা বেশি কাবু করে। সুস্থ হয়ে উঠেও নিজেকে অসুস্থ মনে হয়, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তাও যায় কমে। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি স্বাতির ব্যবহারে। নিজে থেকে সে কোন খবর দেয় নি, আমার চিঠিরও দেয় নি উত্তর। কিন্তু তার নীরব থাকার কোন কারণ দেখি না। চিঠির উত্তর দেওয়া একটা সাধারণ সৌজন্য, উত্তর না দিলে শুধু অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। স্বাতি কি আমাকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছে!

আজও তাকে আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। প্রথম দিন আমি তাকে দেখেছিলুম একটা ট্রেনের কামরায়, দরজার হাতল ধরে সে দাঁড়িয়ে ছিল। আর আমি ছিলুম প্ল্যাটফর্মের জনতার মধ্যে। আজও আমি সেই জনতার মধ্যেই আছি, উপরে দাঁড়িয়ে সে এই বিক্ষুব্ধ জনতা দেখছে। দেশের এই জনতার কোমর ভাঙা, অনাহারে

দারিদ্র্যে রোগে তাদের কোমর ভেঙেছে। আর কি তারা কোন দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে!

গাড়ির ভিতরে দাঁড়িয়ে দরজার হাতল ধরে যারা প্ল্যাটফর্মের জনতা দেখছে, তারা বলবে, কেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না! এই হাতলটাই ধর না!

কিন্তু ওই হাতলটা যে বড় ছোট, কজনে ওই হাতল ধরে দাঁড়াতে পারে! আর টিকিট কই ওই ঝকঝকে হাতলটা ধরবার! উর্দিপরা প্রহরী এসে গলা ধরে নামিয়ে দেবে যে! তার চেয়ে আমাদের প্ল্যাটফর্মই ভাল, এখানে আমাদের গলায় হাত কেউ দেবে না।

সেদিন তো আমি নিজেকে সক্ষম ভেবেছিলুম, তাই লাফিয়ে উঠেছিলুম স্বাতিদের কামরায়। একেবারে ফাঁকা কামরা, মাত্র চারজন মানুষ বসেছে সেখানে। কিন্তু আমি বেশিক্ষণ বসতে পারলুম না, আমি নেমে এলুম সেই গাড়ি থেকে। আমাদের জন্যে অন্য গাড়ি আছে, সেখানে আমরা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে চলি। সেখানে নিজেকে ছোট মনে হয় না, মনে আরাম পাই অনেক।

স্বাতিরা আমাকে বারে বারে কাছে টেনেছে, বারে বারে আমি দূরে সরে এসেছি। ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় আছে আমার মনে। এই ভয় না গেলে আমি সহজ ভাবে মিশতে পারব না।

অনেক পুরনো একটি ঘটনা আমার মনে পড়ল। খুব শৈশবে একবার এক জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে বসেছিলুম। বাবার পাশেই আমার আসন পড়েছিল, অন্য সবার চেয়ে খানিকটা তফাতে। জমিদার বাড়ির পুরুত ঠাকুরের হঠাৎ অসুখ করেছিল বলে বাবা পুজো করেছিলেন, আর সেই জন্যেই তাঁর ঠাঁই হয়েছিল তফাতে। আমাদের মুখোমুখি যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের একজনকে নিয়ে গোলমালটা বেধেছিল। এক ভদ্রলোককে দেখে দু পাশের দুজন একটু বিব্রত বোধ করেছিলেন। তা বুঝতে পেরে ভদ্রলোক পঙ্‌ক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাবা তাঁকে তাঁর নিজের পাশে বসতে

বলেছিলেন। কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন জমিদার মশাই নিজে। বলেছিলেন, না না ওখানে নয়, এই দিকে আসুন। বলে অন্য ধারে তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক খেতে বসেন নি, কোন কথা না বলে ফিরে গিয়েছিলেন।

বাড়ি ফিরে বাবাকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। যিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর মলিন জামা কাপড় দেখে আমি ভেবেছিলুম যে গরিব বলে জমিদার বাড়িতে তাঁর আদর হল না। কিন্তু আমরাও তো বড়লোক নই, আমাদের কেন আদর করে খাওয়ালেন! বাবা বলেছিলেন, এ দুঃখ বড় হয়ে বুঝবে।

বড় হবার দরকার হয় নি, কিছু দিন পরেই বুঝেছিলুম। স্কুলের ছেলেদের মধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওই ভদ্রলোকের ছেলে একটি শূদ্রের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, আর ভদ্রলোক তাঁর ছেলের বউকে বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন। সমাজের নিয়মে তাঁর জাত গেছে।

বাড়ি ফিরে বাবাকে যখন এই কথা বলেছিলুম, তখন তিনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিলেন এ সমাজ বেশি দিন বাঁচবে না, দেশে নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছে।

সেই নতুন সমাজের কথা বাবা আমাকে বলেন নি, কিন্তু আমি তার রূপ দেখতে পেয়েছি। এ সমাজের অন্য রকম বর্ণভেদ। জন্মের বিচারে নয়, জ্ঞানের বিচারেও নয়, অর্থে ও প্রতিপত্তিতে মানুষ এখন আভিজাত্য অর্জন করে। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে এ যুগের বংশগৌরব। এই নতুন সমাজের কয়েকজন ব্রাহ্মণ দেশের সমস্ত মানুষকে অস্পৃশ্য আখ্যা দিয়েছে।

সহসা আমি চমকে উঠলুম। এ তো আমার কথা নয়, চাওলা আমাকে দিল্লীতে এ কথা বলেছিল। আমি তার প্রতিবাদ করেছিলুম, কিন্তু সে আমার কথা মানে নি। আজ ভারতের বৃহত্তম নদী ব্রহ্মপুত্রের তীরে একা বসে চাওলার কথাই আমার মনে পড়ল। আমি নিজেই তো আজও অস্পৃশ্য, চাওলার কথা অস্বীকার করব কোন্ যুক্তিতে!

১০

কলকাতা ও দিল্লীর দপ্তর থেকে চিঠিপত্র এখন আমার নামেই আসছে। অনেক রকমের হুকুম পাচ্ছি। বেশির ভাগ হুকুমই হচ্ছে নানা রকমের সংবাদ সরবরাহ আর্থিক আয়ব্যয় ও উন্নয়নমূলক। সোমবারের ডাকেও এই রকমের একটি হুকুম পেলুম—যোরহাট ও ডিব্রুগড় অফিসের কিছু সংবাদ চাই, এবং খুব তাড়াতাড়ি চাই। কালিম্পঙে একটি নূতন অফিস শীঘ্র খোলা হচ্ছে, এই সংবাদ তার আগেই চাই। একই ডাকে কলকাতা অফিসের আর একখানি চিঠি ছিল, তাতে আগের চিঠির সূত্র ধরে জানানো হয়েছে যে কালিম্পঙের অফিস অনতিবিলম্বে খোলা হবে এবং এই উপলক্ষে আমাকেও যোগ দিতে হতে পারে।

মিস্টার বড়ুয়া সব শুনে বললেন: আপনি প্লেনে ডিব্রুগড় চলে যান, সেখান থেকে যোরহাট হয়ে ফিরবেন। যোরহাট থেকে গৌহাটির প্লেন আছে। আমি কালকের প্লেনে আপনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

উড়োজাহাজে সময় কম লাগবে ঠিকই, কিন্তু কেন জানি না মিস্টার বড়ুয়ার পরামর্শ আমার পছন্দ হল না। মনে হল যে তিনি আমাকে যা বলবেন তার উলটোটিই আমার করা উচিত। বললুম: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আমি আর একটু চিন্তা করে দেখি।

মিস্টার বড়ুয়া একটু ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলেন।

আমার ঘরে তখন আমার স্টেনোগ্রাফার ছাড়া আর কেউ ছিল না। প্রথমে একটি খাসি মেয়ে আমার কাজ করতে এসেছিল। নতুন কাজ শিখেছে মেয়েটি, কিছু টুকতে পারত না, আর কিছু ভুল করত ছাপতে। জিজ্ঞাসা করে আমি জেনেছিলুম যে তার নতুন চাকরি, মিস্টার বড়ুয়া তাকে সম্প্রতি নিয়েছেন, আর অফিসের পুরনো স্টেনোগ্রাফার এখন টাইপিস্টের কাজ করছে। আমি তাকে ছুটি

দিয়ে পুরনো স্টেনোগ্রাফারকেই ডেকে নিয়েছিলুম। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়, নাম মিস্টার শর্মা, ধীর স্থির এবং স্বল্পভাষী। মিস্টার বড়ুয়া চলে যাবার পরে ভদ্রলোক আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে মনে হল কিছু বলতে চান। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কিছু বলবেন ?

শর্মা বললেন : যদি কিছু মনে না করেন তো আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।

আমি আগ্রহ দেখিয়ে বললুম : বলুন না।

ভদ্রলোক একটু সঙ্কোচ করলেন, তারপরে বললেন : দেওয়ালের ওই ম্যাপে আসাম রাজ্য যত বড় মনে হয় ঠিক তত বড় নয়। ট্রেনে গেলে ডিব্রুগড় সাড়ে তিনশো মাইল হতে পারে। কিন্তু মোটরে তিনশো মাইলের বেশি নয়। পথে যখন কাজ আছে তখন গাড়িতে যাওয়াই ভাল। তাতে আরও একটু সুবিধা আছে, এ রাজ্যের সম্বন্ধে আপনার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে। নতুন কোন অফিস খোলার প্রসঙ্গ উঠলে নিজের মতামত আপনি ব্যক্ত করতে পারবেন।

এত কথা ভদ্রলোক কোন দিন বলেন নি। প্রথমটায় কথাই বলতেন না, দিন কয়েক থেকে বলছেন। আমি লক্ষ্য করেছি যে এই অফিসের কর্মীদের পাকা করার সুপারিশ পাঠাবার পর থেকেই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দুএকটা কথা কইছেন। সে সব বাজে কথা নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার কথাই। আমি বললুম : মোটরে গেলে আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবেন ?

আমি !

ভদ্রলোক ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন : পারব।

আমি বললুম : যদি আপনার অসুবিধা না হয় তা হলে আজই আমরা বেরিয়ে পড়ি।

শর্মা বললেন : আজ বিকেলেই বেরতে চান !

সেই তো ভাল। পথে কোন ডাকবাংলো বা রেস্টহাউসে রাত কাটানো যাবে।

শর্মা সংক্ষেপে বললেন : বেশ, ড্রাইভারকেও আমি এই কথা জানিয়ে আসছি।

বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে মিস্টার বড়ুয়া এসে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি মোটরে যাওয়া স্থির করলেন ?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

মিস্টার বড়ুয়া ভাল মন্দ কিছুই বললেন না, শুধু পরামর্শ দিলেন : আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান। ইভাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললুম : থাক তাকে, আমি শর্মাকে সঙ্গে যেতে বলেছি।

মিস্টার বড়ুয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলুম যে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরেই ইভা এল, বলল : আপনি আমাকে ডাক-ছিলেন ?

বললুম : না।

ইভা একটু ইতস্তত করে বলল : মিস্টার বড়ুয়া আমাকে আপনার সঙ্গে টুরে যেতে বলছেন।

আমি বললুম : তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, শর্মা আমার সঙ্গে যাবে।

ইভা তবু দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে আমি বললুম : মিস্টার বড়ুয়াকে আমি এ কথা জানিয়ে দিয়েছি।

এবারে সে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেল।

বিকেল তিনটের একটু আগেই আমি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লুম। হোটেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে চা খেয়ে নিলুম। তারপর শর্মাকে তুলে নিলুম তার বাড়ি থেকে। শর্মা বললেন : আপনার চাপরাশিকেও আমি বলে রেখেছিলাম।

বললুম : দুখানা কাগজ বইবার জন্যে একজন লোক নিতে আমার লজ্জা করে।

শর্মা বললেন : অন্য কাজও সে করতে পারত।

বললুম : আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যেও আমি লজ্জিত।

ভদ্রলোক বললেন : আমার কোন অসুবিধে নেই। ছেলেরা বড় হয়েছে, সংসারের ভাবনা তাই কম। আর সময় পেলে শিবসাগরে আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব।

খুব ভাল। শিবসাগরে আমরা একটা রাত কাটাব।

শর্মা বললেন : আজ আমরা যোরহাটে পৌঁছতে পারব না, ভাবছি কাজিরঙ্গার টুরিস্ট লজেই রাত কাটানো যাবে। খুব ভাল ব্যবস্থা বলে শুনেছি।

খুব সুন্দর প্রশস্ত পথ ধরে আমরা চলেছি। এটি আসামের ন্যাশনাল হাইওয়ে। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাতেই আসামের ঘনবসতি, এই রাজ্যের প্রায় সমস্ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও শহর এই নদীর দুই তীরে ক্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছে। উত্তরেও এই রকমের রাজপথ তেজপুরের উপর দিয়ে লখীমপুর পৌঁছেছে। আমরা দক্ষিণের উপত্যকা দিয়ে চলেছি। প্রথমে নওগাঁ, তারপরে কাজিরঙ্গা। কাজিরঙ্গায় কোন রেলের স্টেশন নেই। গৌহাটি থেকে যে রেলপথ তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় গেছে, তা খানিকটা পূবমুখো গিয়ে দক্ষিণে লামডিং নেমেছে, সেখান থেকে উত্তরে উঠেছে ডিমাপুর বা মনিপুর রোড স্টেশন হয়ে। তারপর উত্তর-পূর্ব মুখে গেছে। নওগাঁ যোরহাট ও শিবসাগর এই তিনটি শহরই তিনটি শাখা লাইনের উপরে। তিনসুকিয়াগামী মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নেমে এই সব শহরে যেতে হয়। তাতে সময় নষ্ট হয় অনেক। এ সব কথা আমি পরে বুঝেছিলুম, আর শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলুম তাঁর পরামর্শের জন্যে।

সূর্যাস্ত হতে তখনও দেরি ছিল। চারিদিকের দৃশ্য দেখতে

দেখতে আমরা এগোলুম। শর্মা তাঁর নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন: গৌহাটি থেকে নওগাঁ পঁচাত্তর মাইল, সন্ধ্যা ছটাতেই আমরা পৌঁছে যাব। নওগাঁয় দেরি না করলে কাজিরঙ্গার টুরিস্ট লজে পৌঁছব রাত আটটার মধ্যে। গৌহাটি থেকে একশো পঁয়ত্রিশ মাইল পথ।

দু পাশে ছোট ছোট গ্রাম আর বড় বড় মাঠ পেরিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটছে। গ্রামের পুরুষদের কখনও মাঠে দেখতে পাচ্ছি, কখনও দেখছি জলের ধারেও মাছ ধরছে। গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েদেরও দেখতে পাচ্ছি, পরিচ্ছন্ন উঠোনে কেউ ধান ভানছে, কেউ বা সুতো কাটছে আর কাপড় বুনছে। দেখতে দেখতেই সন্ধ্যার ছায়া নামল, তারপরে অন্ধকার হল চারিদিক। মোটরের হেডলাইট জ্বেলে আমরা ছুটে চললুম।

নওগাঁ জেলার প্রধান শহর হল নওগাঁ। কিন্তু গৌহাটির খুব কাছে বলে ব্যবসায় বাণিজ্যে তেমন উন্নতি করতে পারে নি। নওগাঁয় পৌঁছেই আমার এই কথাটি মনে হল। শর্মা বললেন: এইখানে একটু চা খেয়ে নিলে ভাল হত, কাজিরঙ্গায় খেতে হয়তো দেরি হবে।

ড্রাইভার বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। তাই সোজা এসে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়াল। চা খাবার জন্যে আমরা নেমে পড়লুম।

দূর পাল্লার মোটর চালকদের আমি লক্ষ্য করেছি। গাড়ি থামলেই তারা মোটরের পরিচর্যা করে আগে, তারপরে ভাবে নিজেদের কথা। আমি তাকেও বললুম আমাদের সঙ্গে কিছু খেয়ে নিতে।

এই শহরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ভাল আছে। শুধু ডাকবাংলো আর সার্কিট হাউস নয়, হোটেলও আছে কয়েকটি। ব্রডওয়ে নামে একটি হোটেল দেখলুম সার্কিট হাউসের খুব কাছে।

চা খেতে খেতে আমি বললুম : এ শহরে দেখবার কিছু নেই ?

শর্মা এক কথায় উত্তর দিলেন : না।

তারপরেই বললেন : আপনার কথা আমরা শুনেছি।

আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর এই কথা শুনে। বললুম : কী শুনেছেন ?

আপনার লেখাপড়ার শখের কথা। আপনি যে কয়েকখানা বই লিখেছেন তাও শুনেছি।

কার কাছে শুনলেন ?

শর্মা এ কথার উত্তর এড়িয়ে গেলেন, বললেন : সবাই বলাবলি করছে। আমার বাড়ি লোয়ার আসামে, তাই আপার আসাম সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি নে। যতটুকু জানি তা বলব।

শর্মা তাঁর কথা রেখেছিলেন, পথে যেতে যেতে অনেক কথা বলেছিলেন।

এখন আর অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পথও মনে হচ্ছে অরণ্যের মাঝখান দিয়ে চলেছে।

শর্মা বললেন : নওগাঁ থেকে মাইল কয়েক দূরে শঙ্করদেবের জন্মভূমি বটদ্রব, লোকে বরদুয়া বলে। শঙ্করদেবের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন !

বললুম : শুনেছি।

সময় থাকলে আজ আপনাকে বরদুয়ায় একবার নামতে বলতাম। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের একটি তীর্থস্থান। মন্দির আছে একটি, আর নামঘর। গ্রামে গ্রামে এই রকমের নামঘর আছে। শুধু প্রার্থনার জন্য নয়, গ্রামের জীবনযাত্রায় এই নামঘর একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা অত্যন্ত দ্রুত যাচ্ছিলুম। মাইল তিরিশেক দূরে শিলঘাট নামে একটা জায়গাও পেরিয়ে গেলুম। গভীর অরণ্যময় পরিবেশে

কিছুই চেনা যাচ্ছে না। এক সময় শর্মা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন : আমরা কি ডবকা ছাড়িয়ে এসেছি ?

ড্রাইভার মাথা নেড়ে বলল : হ্যাঁ।

শর্মা বললেন : ঐখানে বুনো হাতী ধরবার ব্যবস্থা হয়। তাকে আমরা খেদা বলি। খেদার গল্প কি আপনি শুনেছেন ?

বললুম : মাইসোরে এক ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলুম।

প্রায় হাজার দুই জংলী লোক নাকি এই কাজের জন্যেই ভর্তি করা হয়। সরকারী লোকের সঙ্গে তারাও কাজ করে। শেখাতে কিছুই হয় না, কেন না প্রতিবারেই তারা এই কাজ করছে। কোমরে কাড়ানাকাড়া টিন ক্যানেস্তারা বেঁধে তারা এগিয়ে যায়, সেই সব পিটিয়ে আর মুখে বীভৎস আওয়াজ করে তারা বুনো হাতীকে তাড়া করে। ভয়ে হাতীরা পালাবার চেষ্টা করে। তার জন্যে একটিমাত্র পথ। সেই পথে গিয়ে তারা খোঁয়াড়ে আটকা পড়ে। খোঁয়াড়ের চারিদিকে খাল কাটা, আর তার একটি গেট। একবার ঢুকলে আর বেরবার পথ নেই। লক্ষ্য রাখতে হয় ওদের দলপতির উপর, সে বেচারা কাবু হলেই আর সবাই কাবু। তাকে অনুসরণ করে সবাই এক দিকে যাবে।

তারপরে পোষা হাতার কাজ। বুনো হাতীর গলায় দড়ি পরানো একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। মাহুতগুলো অদ্ভুত কুশলী। পুরনো পোষমানা হাতীর পিঠে চড়ে এক একটাকে ভুলিয়ে আনে ছোট খোঁয়াড়ে, আর দড়ি পরায়। তারপরের কাজ হল তাকে চরিয়ে চরিয়ে পোষ মানানো।

শর্মা বললেন : দিনের আলো থাকলে আপার আসামের রূপ আপনি দেখতে পেতেন। মস্ত বড় বড় চায়ের বাগান আর রিজার্ভ ফরেস্ট। এই যে বন জঙ্গল দেখছি এ হয়তো কাজিরঙ্গারই বন। এক পাশে মাথানিচু মিকির পাহাড়, আর অন্য পাশে কাজিরঙ্গা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। এই দুয়ের মাঝখান দিয়ে এই পথ।

মোটরের আলোয় আমরা সামনেটাই শুধু দেখতে পাচ্ছি, দুপাশের দৃশ্য অন্ধকারেই মিলিয়ে আছে।

আমি বললুম : মিকির নামে একটি পার্বত্য জাতির নাম শুনেছি, তারা কি পর্বতের অধিবাসী?

শর্মা বললেন : শুধু পর্বত নয়, সমস্ত নওগাঁ জেলায় তারা ছড়িয়ে আছে। ভারি শান্ত প্রকৃতির পরিশ্রমী জাত, কিন্তু কতগুলো অদ্ভুত আচার বিচার আছে বলে শুনেছি।

শর্মার কাছে এদের কথা কিছু জানতে পেলুম, কিন্তু সে সব এ যুগের কথা বলে মনে হল না। এরা নাকি গরুকে অপবিত্র মনে করে বলে গরুর দুধ স্পর্শ করে না। আগে কোদাল দিয়েই চাষবাস করত, এখন লাঙল ধরেছে। ঝুম চাষও এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বাপ-মায়ে এদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয় না, ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সে ব্যবস্থা করে। কোন ছেলে তার বিবাহ করার সামর্থ্য থাকলে প্রথমে কোন মেয়ের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় লাগে। তার সম্মতি পেলে তার বাপকে ধেনো মদ খাইয়ে খুশী করে। বিবাহ হলে দু বছর তাকে কনের বাড়িতে বাস করতে হয়। সঙ্গতি থাকলে পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারে, কিন্তু দরিদ্র বেশি বলে তারা বিবাহই করে না।

মানুষের মৃত্যু এদের সমাজে একটা উৎসব। তাদের ধারণা যে মৃতের আত্মা অনেক সময়েই ভূত হয়। তাই মৃতদেহ পোড়াবার পরে সেই প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পশুবলি দিয়ে কয়েক দিন ধরে মহা সমারোহে নাচগান পানাহার চলতে থাকে। মৃত্যু এদের কাছে তাই শোকের নয়, একটা আনন্দের ব্যাপার।

এদের সমাজে দেবতার চেয়ে ভূতপ্রেতের খাতির বেশি। এদের প্রধান দেবতার নাম অরনেম কোঠে, অনেকে বলে হাজাই। বছরে একদিন সমস্ত গ্রামবাসী মিলিত হয়ে তাঁর পূজা করে, অনেক সময় তিনবারও করে। কিন্তু ভূত এদের অনেক, গৃহভূতও আছে, তাদের

নাম পেং ও মুফরাং। প্রত্যেক গৃহস্থকে মাসে দুবার এই গৃহভূতের পূজা করতে হয়। যারা বুদ্ধিমান তারা নাকি নতুন নতুন ভূতও আবিষ্কার করে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি দেখেছেন এদের ?

শর্মা বললেন : অনেক দেখেছি। পথে ঘাটে হাটে বাজারে কুলির কাজ করতে দেখেছি।

এদের আচার ব্যবহার ?

তা দেখি নি। যা বললাম আপনাকে, তা সবই শোনা কথা। একদিন হয়তো সবটাই সত্য ছিল, এখন আর নয়। শিক্ষার প্রসারে তো মানুষের কুসংস্কার দূর হচ্ছে।

রাত আটটার কিছু পরেই আমরা কাজিরঙ্গার টুরিস্ট লজে পেঁছিলুম। মস্ত বড় দোতলা বাড়ি, অনেক ঘর, দিব্বি সাজানো, ভাল ব্যবস্থা। শুনলুম নিজেদের যন্ত্রে বিজলীর বাতি জ্বলছে, কিন্তু দিনের বেলায় পাখা চলে না। শর্মা তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। শুধু থাকবারই নয়, খাবার ব্যবস্থাও হল। ফিরে এসে ভদ্রলোক আমাকে আর একটি ব্যবস্থার কথাও বললেন। সেটি যে আরও আকর্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্যে সময় ব্যয় করতে মন আমার সায় দিল না। নিজেদের ঘরে মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রামের আয়োজন করতেই শর্মা বললেন : আপনার অনুমতি না নিয়ে আর একটি ব্যবস্থা করেছি।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন : কাজিরঙ্গার টুরিস্ট লজে রাত কাটিয়ে ভোর-বেলায় চলে গেলে পরে আপসোস করতে হত।

আমি বললুম : আপনি কি গণ্ডার দেখার ব্যবস্থা করেছেন ?

শর্মা বললেন : গোটা ভারতবর্ষে এখন এক জাতের শ দুই গণ্ডার

আছে, তার মধ্যে শ দেড়েক এইখানে। আশেপাশের উঁচু ঘাসের জঙ্গলে তারা ঘুরে বেড়ায়। আরও অনেক জন্তু জানোয়ার আছে—হাতী বুনো মোষ বুনো শুয়োর আর নানা জাতের হরিণ। পাখিও অনেক রকম দেখতে পাবেন। তার মধ্যে দু জাতের পাখির ইংরেজী নাম আমি শুনেছি—ফ্লোরিকান আর গ্রেট ইণ্ডিয়ান হর্নবিল, বাঙলায় কী বলে আমি জানি নে।

আমি বললুম: কিন্তু এসব দেখবার সময় আমাদের কোথায়?

শর্মা বললেন: শখ থাকলে সময়ের অভাব হবে না। খুব ভোরে দেখতে হয়। গাড়ি করে আমরা অবজারভেসন টাওয়ারে চলে যাব। হাতী পাওয়া যায়, হাতীর পিঠে চড়ে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেই সব দেখতে পাওয়া যাবে। ফিরে এসে চা খেয়ে আমরা যোরহাট রওনা হব। তাড়াতাড়ি করলে বেলা দশটাতেই পৌঁছতে পারব। তার আগে তো অফিস খুলবে না। আমাদের অফিসে কাজ।

এরপরে আর আপত্তি করা চলে না। আর সত্যিকারের আপত্তি তো নেই, কর্তব্যনিষ্ঠায় শখকে পরিহার করতে হচ্ছিল। বললুম: দেরি না হয়ে যায়, সেইটেই দেখবেন।

শর্মা বললেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেরি কিছুতেই হবে না।

পরদিন সত্যিই আমাদের দেরি হল না। শর্মা খুব ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। টুরিস্ট লজের বেয়ারা আমাদের ভোরবেলাতেই জাগিয়ে দিল। চা না খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। হাতীতে চড়বার জন্যে পয়সা দিতে হয়। উঁচু ঘাসের মাঠের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা তিনেক ঘুরিয়ে আনে। আমরা বললুম: বেশিক্ষণ আমরা ঘুরব না, গণ্ডার দেখা হলেই ফিরে আসব।

হাতীর পিঠে চড়বার কায়দাটি এখানে অন্য রকম। হাতী এখানে পা মুড়ে বসল না, তার কোমরে বাঁধা দড়ি ধরেও আমরা

উঠলুম না। হাতী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর তার পিঠে মই লাগিয়ে আমরা উঠলুম।

তারপর সেই বিস্তীর্ণ মাঠ। বড় বড় ঘাসে সব কিছু ঢাকা আছে। গণ্ডার খুঁজে বার করতে আমাদের সময় লাগল না। অনেকটা দূরে তিনটি গণ্ডার এক সঙ্গে দেখতে পেলুম। একটি গণ্ডার মুখ তুলে তাকিয়েছিল। আর দুটি মুখ গুঁজে কিছু খাচ্ছিল মনে হল।

হেমন্তের প্রত্যুষে হাওয়া বইছে শিরশির করে। ভাল করে রোদ তখনও ওঠে নি, খোলা আকাশের নিচে এই পরিবেশটি আমার খুব ভাল লাগল। ইচ্ছা করছিল না তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনেই আমাদের ফিরতে হল।

চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম। শর্মা বললেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সকাল দশটাতেই আপনাকে যোরহাটে পৌঁছে দেব। এখান থেকে মাত্র ষাট মাইল পথ।

আমি বললুম: দেরি হলেও কোন ক্ষতি হয়েছে মনে করব না। আজকের সকালটি সত্যিই ভাল লেগেছে।

খুশী হয়ে শর্মা বললেন: এই রকমের স্যাঙ্কচুয়ারি আসামে চারটি আছে। ব্রহ্মপুত্রের এপারে এই একটি, আর তিনটি নদীর ওপারে। কামরূপ জেলায় মানস স্যাঙ্কচুরারি, আর সোনাই রূপা স্যাঙ্কচুয়ারি দরং জেলায়। আমরা যে কাজিরঙ্গা দেখলাম তার আয়তন একশো ছেষট্টি মাইল শুনে এলাম। এটি দেখবারই সুবিধা সবচেয়ে বেশি। মানস স্যাঙ্কচুয়ারি মানস নদীর তীরে একেবারে ভুটান পাহাড়ের নিচে। বরপেটা রোড স্টেশনে নেমে যেতে হয়। কিন্তু সারা বছর যাওয়া যায় না। সেখানে হাতী গণ্ডার আর বুনো মোষ তো আছেই। বাইসন বাঘ ভালুক বুনো শুয়োরও আছে। শম্বর ও হরিণ নানা জাতের। সোনাই রূপা স্যাঙ্কচুয়ারি অনেক ছোট। কাজিরঙ্গার প্রায় অর্ধেক, কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা আছে। রাঙ্গাপাড়া স্টেশন থেকে দশ মাইল। আর তেজপুর থেকে বিশ ত্রিশ মাইল। সারা বছর মোটর চলে, আবার সব রকম জন্তু জানোয়ারও দেখতে পাবেন।

এই তিনটির নাম আমি আগে শুনেছিলুম, কিন্তু শর্মা যে চতুর্থ স্যাঙ্কচুয়ারির নাম করলেন সে নাম আমি শুনি নি। উত্তর লখীমপুরের কাছে একটি ছোট এলাকা, মাত্র উনিশ বর্গ মাইল, নাম পভা বা মিলরয় বাফেলো স্যাঙ্কচুয়ারি। এখানে শুধু বুনো মহিষ দেখতে পাওয়া যায়।

আমি বললুম: এত খবর আপনি পেলেন কোথায়?

শর্মা গর্বিত ভাবে বললেন: আপনার জন্যে কাল রাতে এসব সংগ্রহ করেছি।

আমি বললুম: এ সব তো মনে থাকবে না। দুদিন পরেই ভুলে যাব।

শর্মা বললেন: ক্ষতি নেই, গৌহাটির টুরিস্ট অফিসে সরকারী কাগজপত্র পাওয়া যাবে। আমি আপনাকে এনে দেব।

মাইল কুড়ি এগিয়ে একটা মোড় পেয়েছিলুম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সেটা ডিমাপুরে যাবার পথ। ডিমাপুর রেল স্টেশনের নাম মনিপুর রোড। এখান থেকে মোটরের পথ গেছে কোহিমার উপর দিয়ে মনিপুর রাজ্যে রাজধানী ইম্ফলে। মনিপুর রাজ্যে যাবার একটিই পথ। অন্য পথ শিলচর থেকে, তা উড়োজাহাজের। একটি সংকীর্ণ মোটরের পথও নাকি তৈরি হচ্ছে শুনলুম।

শর্মা বললেন: এখন এ পথে ইম্ফলে যাওয়া নিরাপদ নয়। সুবিধা পেলেই নাগারা আক্রমণ করে।

তবে যাতায়াত চলছে কী ভাবে?

হপ্তায় দু তিন দিন কনভয় চলে, সমস্ত গাড়ি বাস ট্রাক এক সঙ্গে অগ্রসর হয়। সকালে যাত্রা করে সন্ধ্যার সময় ইম্ফলে পৌঁছয়। ও রাস্তায় একা যাওয়া খুবই বিপজ্জনক।

আমার মনিপুর দেখবার শখের কথা শর্মাকে বললুম না, তার বদলে বললুম: নাগারা কবে শান্ত হবে জানি নে।

আরও মাইল পঁচিশেক এগিয়ে ডেরগাঁও নামে একটা জায়গা আমরা পেলুম। শর্মা বললেন: এইখানে আসামের পুলিস ট্রেনিং কলেজ।

ন্যাশনাল হাইওয়েকে কেউ আসাম ট্রাঙ্ক রোড বলেন, কেউ বলেন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ডেরগাঁও থেকেও গোলাঘাট হয়ে ডিমাপুর

যাওয়া যায়। আর এইটেই সদর রাস্তা। যোরহাট এখান থেকে বেশি দূর নয়। খুব অল্প সময়েই আমরা পৌঁছে গেলুম।

জেলার নাম শিবসাগর, আর প্রধান শহরের নাম যোরহাট, শিবসাগর শহর জেলার সদর নয়। আপার আসামের একটি প্রধান শহর যোরহাট। শর্মা বললেন: ডিব্রুগড়ের পরেই এই শহরের স্থান।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার একবার পিছন ফিরে তাকাল। আমি তার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিলুম। বললুম: সোজা অফিসেই যাব।

শর্মা বললেন: কোনও হোটেলে একটু বিশ্রাম করে গেলে হত না?

আমি বললুম: তার কি দরকার আছে!

দরকারের কথা নয়, আরামের কথা। একটু বিশ্রাম করে গেলে ভাল লাগত।

আমি বললুম: আপনার যদি দরকার না থাকে তাহলে সোজা অফিসেই চলে যাই। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারলে শিবসাগরে পৌঁছে বিশ্রাম নেব।

শর্মা বললেন: তাহলে তো খুবই ভাল হয়। কাল এ রকম সময় আমরা ডিব্রুগড় পৌঁছতে পারব।

সত্যি নাকি!

শিবসাগর থেকে ডিব্রুগড় মাত্র বাহান্ন মাইল। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরলে ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছে যাব।

অফিসে আমরা বিশৃঙ্খলা দেখতে পেলুম। সময় মতো কেউই আসেন না, ম্যানেজার নিজেই এলেন সকলের পরে। কাগজপত্রও ভাল নয়, যে সংবাদের জন্য আমরা এসেছিলুম তা সংগ্রহ করতে অনেক সময় লাগল। কর্মীরা মনে হল দিনগত পাপক্ষয় করছেন। ম্যানেজার আমাকে রাতে তাঁর বাড়িতে খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমি রাজী হতে পারলুম না। কাল সকালে আমাকে

ডিব্রুগড় পৌঁছতেই হবে, এই যুক্তিতে তাঁকে নিরস্ত করলুম। তিনি খেয়ে এসেছেন বলে দুপুরবেলায় তাঁর বাড়িতে আয়োজন আর সম্ভব নয়। আমিও রাজী হতে পারতুম না। তাই আমরা এক ফাঁকে একটা হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলুম। শর্মা বললেন: ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বলছিলেন, আপনাকে হোটেলেই খাওয়াবেন, আমি বললাম, সেটা ভাল দেখায় না, বরং পরের বার বাড়িতে খাওয়াবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কী বললেন তিনি?

ভয় পেয়েছেন খুব। আমাকে বললেন, একটা খবর দিয়ে এলাম না কেন! আগে তো কখনও এরকম হয় নি।

শর্মা নিজেই মন্তব্য করলেন: এ রকম হয় নি বলেই তো কাজ-কর্মের এই অবস্থা।

শর্মার আগ্রহে বেলা তিনটের পরেই আমরা যোরহাটের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লুম। গাড়িতে বসে ভদ্রলোক বললেন: এ শহরে কিছু দেখবার নেই, তবু একটু ঘুরে যাওয়া যাক।

গৌহাটি বা ডিব্রুগড় যেমন ব্রহ্মপুত্রের একেবারে তীরে, যোরহাট বা শিবসাগরের অবস্থান ঠিক তেমন নয়। পাকা সড়ক ধরে মাইল কয়েক দূরে যেতে হয়। রেললাইনের বেলাতেও তাই। গৌহাটি তিনসুকিয়া লাইন খানিকটা দূর দিয়ে গেছে, নওগাঁয়ের মতো যোরহাট ও শিবসাগরও শাখা লাইনে। তিনসুকিয়া থেকে ডিব্রুগড়ও শাখা লাইনে, কিন্তু আসাম মেল বারৌনি থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত যাতায়াত করে।

যোরহাটে একটি ছোট বিমান বন্দর আছে, আর নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উপরে আছে কোকিলামুখী আর নিয়ামতি নামে দুটি বন্দর। শহরে কয়েকটা ভাল স্কুল কলেজ ছাড়া আর বেশি কিছু দেখলুম না। একটি কৃষি কলেজ কোর্ট কাছারী আর একটি ন্যাশনাল স্পোর্টস স্টেডিয়াম। এ শহরের এই অংশটি বেশ ছবির মতো।

শর্মা বললেন: কাছে একটা চা-শিল্পের এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন আছে, আর মাইল বারো দূরে টিটাবর নামে একটা জায়গায় সরকারী বেসিক ট্রেনিং কলেজ আর সেরিকালচারাল ফার্ম আছে রেশম শিল্পের উন্নতির জন্যে। কিন্তু আপনাকে আমি তাড়াতাড়ি বেরতে বলেছি অন্য কারণে। সূর্যাস্তের আগেই আমাদের শিবসাগরে পৌঁছতে হবে।

আমি বললুম: কোন কাজ আছে বুঝি?

শর্মা হেসে বললেন: আপনার জন্যেই। আহোম রাজাদের রাজধানী ছিল শিবসাগরে, তখন এই শহরের নাম ছিল রঙ্গপুর। শিবসাগর পৌঁছবার আগে ও পরে দুধারেই রাজাদের অনেক কীর্তির চিহ্ন দেখতে পাবেন। সে সব আপনার ভাল লাগবে।

আমিও হেসে বললুম: আপনি যখন কাজ করেন তখন মনে হয় না যে এ সব কথা আপনার মাথায় থাকে।

শর্মা গম্ভীর হয়ে বললেন: কাজের সময় কাজ ভুললে তো চলে না! কনফিডেন্সিয়াল চিঠি ছাপলে তার কার্বন পেপারটিও ছিঁড়ে ফেলতে হয়। আজকাল অফিসের যা অবস্থা তাতে কাউকে বিশ্বাস নেই।

আমি এই কথায় বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। শর্মা বললেন: সত্যি কথাই বলছি। আমাদের গৌহাটি অফিসে এই কার্বন পেপার সংগ্রহ করতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের কার্বন নয়, বাক্সের কার্বন। ওপরে কনফিডেন্সিয়াল ছাপ থাকলেই তা চুরি যায় দেখেছি। শেষে একদিন চোরকে ধরে ফেললাম, তারপরেই আমার শাস্তি হল, টাইপিস্টের কাজ করতে হবে। পাকা চাকরি না হলে হয়তো চাকরিটাই যেত।

শর্মার কথায় আমার নতুন অভিজ্ঞতা হল। অভিজ্ঞতার শেষ নেই। যে ভাবে অনেক কিছু জানে সে-ই ভুল করে, কিছু জানি

না ভাবাই নিরাপদ। তাহলে চোখ কান খুলে রাখতে হয়। চোখ-কান খোলা থাকলে বিপদে পড়বার ভয় কম। মনে মনে আমি আরও সতর্ক হয়ে চলবার সঙ্কল্প করলুম।

কিন্তু শর্মাকে আমি অন্য কথা বললুম। জিজ্ঞাসা করলুম: আহোম রাজাদের ইতিহাস আপনার জানা আছে?

আমার প্রশ্ন শুনে শর্মা ভয় পেলেন। বললেন: ইতিহাস আমি ছেলেবেলা থেকেই ভয় পাই।

আমি বললুম না যে ইতিহাস আমাদের দেশেরই কথা। তাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। গৌহাটিতে আহোমদের সম্বন্ধে আমি কিছু পড়েছিলুম, সে পড়া সম্পূর্ণ নয়। আহোমরা আসামে প্রায় ছশো বছর রাজত্ব করেছেন, তার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হতে পারে না। আসাম শব্দটির জন্ম হয়েছে আহোম থেকে। আসামের সভ্যতার ইতিহাসে আহোমদের দান নিতান্ত কম নয়।

এরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুকাফা নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পাটকাই অঞ্চল দিয়ে উত্তর পূর্ব আসামে এসে প্রবেশ করে। মঙ্গোলীয় জাতির নানা শাখা এই পথে অনেকবার এদেশে এসেছে। হোয়াং হো নদীর দক্ষিণ উপত্যকা থেকে এসেছে একদল। এরা ভোট বর্মী, এদের সঙ্গে বোধহয় প্যারিওইয়ন জাতির সম্বন্ধ ছিল, তারা মঙ্গোলীয়। কালক্রমে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এরা মিলে গিয়েছিল। গারো জাতির মধ্যে একটি গল্প আছে যে তাদের পূর্বপুরুষরা তিব্বত থেকে আসামে এসেছে।

আহোমরা কিন্তু এভাবে এসে দেশের লোকের সঙ্গে মিলে যায় নি। তারা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। গত শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত তারা সগৌরবে রাজত্ব করেছে। পুরাকালে এঁরা সোমদেও নামে দেবতার উপাসক ছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে এঁরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রের বংশে তাঁদের জন্ম বলে দাবী করেন। শুনে আশ্চর্য

হতে হয় যে জন্মের পরে তাঁরা হিন্দু নাম পেতেন, আর রাজা হবার সময় নিতেন আহোম নাম। সে সময় অনেক খরচপত্র করতে হত বলে পরবর্তী রাজারা আর আহোম নাম নিতেন না।

আহোম রাজাদের প্রথম পুরুষ সুকাফা এসে চুটিয়া ও বরাহী জাতিকে দমন করে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এঁর পরে বারোজন রাজার তেমন কোন কীর্তির কথা জানা যায় না। চতুর্থ রাজা সুখাংফা কামতারাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, দুর্লভনারায়ণ তখন কামতার রাজা। কিছু দিন শত্রুতা চলবার পরে এই দুই রাজায় সন্ধি হয়, সুখাংফা কামতা রাজকন্যা রজনীকে বিবাহ করে বন্ধুতা স্থাপন করেন। এঁর পৌত্র সুদাংফা আবার কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। এবারেও সন্ধি হয়, এবং কামতারাজ নিজের কন্যা ভাজনীর বিবাহ দেন সুদাংফার সঙ্গে। এর পরে আহোম রাজারা উপজাতিদের দমনেই নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন।

সুহুংমুং এই বংশের চতুর্দশ রাজা ও সর্ববিষয়ে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭ থেকে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। শোনা যায় যে তিনিই প্রথম হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নিজের নাম নেন স্বর্গনারায়ণ। তাঁর রাজত্বকালেই শঙ্করদেবের বৈষ্ণব মত প্রাধান্য লাভ করে, এবং আহোম জাতির উপরেই হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এ জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় নন। তিনি একজন শক্তিশালী রাজা বলে সম্মানিত। তিনি শুধু চুটিয়া কাছাড়ী ও নাগাদেরই দমন করেন নি, মুসলমান আক্রমণও প্রতিরোধ করেন। তাঁর রাজত্বকালে মুসলমানরা বারে বারে এসেছে এবং প্রতিবারেই পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে। মুসলমানদের কামান বন্দুক ছিল। কিন্তু আহোমরা বারুদের ব্যবহার জানত না। তবু তারা মুসলমানদের ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই পরাজয়ের পর একশো তিরিশ বছর তারা আর আসাম আক্রমণ করতে আসে নি।

তারপরে মোগল বাদশাহ শাহজাহানের সময় থেকে আবার বিবাদ

আরম্ভ হয়। আহোমরাই এগিয়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের সময় এসেছিলেন মীরজুমলা। সেই পরাক্রান্ত সেনাপতির অসাফল্যের কথাও ইতিহাসে পড়েছি। আসামের রাজা তখন সুপংমুং বা চক্রধ্বজ সিংহ। এঁর পরে তাঁর দুই ভাই রাজা হয়েছিলেন। তাঁদের পরবর্তী চারজন রাজা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন নি।

এঁদের পরে রাজত্ব করেছেন লরা রাজা গদাধর সিংহ রুদ্র সিংহ শিব সিংহ প্রমত্ত সিংহ ও রাজেশ্বর সিংহ। শিবসাগরে এখন আমরা আহোম রাজাদের যে কীর্তি দেখি তা এই রাজাদেরই কীর্তি। এঁদের রাজত্বকাল ১৬৭৯ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ইতিহাসে আমি এই আহোম রাজাদের যে বংশাবলী দেখেছি, তাতে একটি জিনিস আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। চক্রধ্বজের পরে সাতজন রাজার রাজত্বকাল মোট এগার বছর। লরা রাজাও মাত্র দু বছর রাজত্ব করেছিলেন, এবং একজন রাজা পঁয়তাল্লিশ দিন ও অন্য একজন মাত্র কুড়ি দিন রাজত্ব করেন। চক্রধ্বজের দুই ভাই দু বছর পরে পরে মারা যান, তারপর তিন বংশের মধ্যে রাজা হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। এ যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড চলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। লরা রাজার পরে গদাধর সিংহই প্রথম রাজা, যিনি চোদ্দ বছর রাজত্ব করেন।

রাজেশ্বর সিংহের পরে চন্দ্রকান্ত সিংহ চতুর্থ রাজা, তাঁর সময় থেকেই, আসাম রাজ্যে বিশৃঙ্খলার আরম্ভ। তিনি রাজা হয়েছিলেন গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে। রাজার তিনজন সভাসদ গোহাঁই ও দুজন মন্ত্রী বরবড়ুয়া ও বরফুকন বংশানুক্রমে এই পদে বহাল ছিলেন। এঁরাই নিজেদের ক্ষমতা অপব্যয় করে রাজ্যে অরাজকতা এনেছিলেন। রাজ্যের প্রকৃত শাসক তখন বুড়া গোহাঁই পূর্ণানন্দ, তাঁকে শায়েস্তা করবার জন্যে গৌহাটির বরফুকন বদনচন্দ্র ব্রহ্মদেশের রাজা বোদীপয়কে আমন্ত্রণ করলেন। ব্রহ্মরাজ এক মুহূর্ত বিলম্ব

করলেন না, নিজের সৈন্য পাঠিয়ে আহোম রাজধানী অধিকার করে নিলেন। যোরহাটে ছিল তখন আসামের রাজধানী। রাজা চন্দ্রকান্ত বর্মীদের সঙ্গে সন্ধি করে নিজের সিংহাসন রক্ষা করলেন। যুদ্ধে পূর্ণানন্দ নিহত হয়েছিলেন, আর বদনচন্দ্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরে তিনিও নিহত হন। পূর্ণানন্দের পুত্র রুচিনাথ রাজা চন্দ্রকান্তকে তাড়িয়ে রাজ্য দখল করেও বেশি দিন রক্ষা করতে পারেন নি। বদনচন্দ্রের বন্ধুদের নিমন্ত্রণে বর্মীবাহিনী আবার এসে চন্দ্রকান্তকে রাজা করেন।

তারপরে আরম্ভ হয়েছিল বর্মী অত্যাচার। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়েই চন্দ্রকান্তকে রাজ্য ছেড়ে বৃটিশ এলাকায় পালাতে হল। রাজ্য পুনরাধিকারের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু বর্মীদের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হন। এঁর পরে যোগেশ্বর সিংহ রাজা হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আহোমরা আর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে পারেন নি।

বেলা পড়ে আসছিল, কিন্তু অন্ধকার নামতে ছিল দেরী। নিঃশব্দে আমরা পথ অতিক্রম করে চলেছিলুম। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে শর্মাও আর কোন কথা বলছিলেন না।

এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আমরা কি শিবসাগরে পৌঁছে গেলুম?

শর্মা বললেন: শিবসাগরে পৌঁছবার আগে আমরা দু তিন জায়গায় দাঁড়াব। তলাতল ঘর রঙঘর ও জয়সাগরে। এগুলো দেখে আমরা শহরে ঢুকব।

এই জন্যেই যে শর্মা যোরহাট থেকে বেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন তা বুঝতে পেরেছিলুম। পথে ভদ্রলোক একবার বলেও ছিলেন এই কথা, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলুম। তাই লজ্জিত ভাবে বললুম: নতুন জায়গা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।

শর্মাও লজ্জিত ভাবে বললেন: যোরহাটের কাছে একটি

দেখবার মতো জায়গা ছিল। সেকথা আপনাকে বলতে আমি বেমালুম ভুলে গেছি।

আমি কৌতূহল নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

শর্মা বললেন: ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে মাজুনি নামে একটা দ্বীপ আছে। এই নদীতে এত বড় দ্বীপ আর কোথাও নেই। যোরহাট থেকে নিয়ামতি ঘাট যেতে হয়, সেখান থেকে নৌকোয় করে কমলা-বাড়ি। তারপরেই মাজুনি দ্বীপ।

কিছু দেখবার আছে দ্বীপে?

অনেকগুলি সত্র আছে। এইসব সত্রে যাঁরা বাস করেন তাঁদের সৌজন্য ও আতিথেয়তা দেখে যাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে যায়।

আমি শুনেছি যে বাঙলা দেশে নবদ্বীপের নিকটে যে মায়াপুর, সেও গঙ্গার মাঝখানে একটি দ্বীপ। সে দ্বীপেও অনেকগুলি মঠ ও মন্দির আছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্যে সেই দ্বীপটি তীর্থে পরিণত হয়েছে।

সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপের কথাও আমার মনে পড়ল। সে বেটদ্বারকা। ওখা বন্দর থেকে মাইল তিনেক যেতে হয় নৌকোয় চেপে। পাল-তোলা নৌকো হাওয়ায় ভেসে যায় এই তিন মাইল পথ। আমরা গিয়েছিলুম, অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের। সে অভিজ্ঞতার কথা চিরদিন মনে থাকবে।

আমাদের গাড়ির গতি কমে আসছিল। বুঝতে পারলুম যে এইবারে কোন দ্রষ্টব্য স্থানের কাছে এসে থামবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দেখে নিতে হবে। আকাশের আলো আরও কমেছে, হঠাৎ এক সময় অন্ধকার নেমে পড়বে। তার আগেই আমাদের সব দেখে নিয়ে শিবসাগর শহরে পৌঁছতে হবে।

শিবসাগরের পুরনো নাম রঙ্গপুর, এ বাঙলার রঙ্গপুর নয়, আসামের রঙ্গপুর। এই রঙ্গঘর দেখে আমার পুরনো রঙ্গপুর নাম মনে পড়েছিল।

৩২

খুব তাড়াতাড়ি করে আমরা দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে নিলুম। রাজা রুদ্র সিংহের তৈরি তলাতল ঘর একটি ভূগর্ভস্থ সেনানিবাস। তার তিনটি তলাই মাটির নিচে। সবচেয়ে নিচের তলাটি নাকি সুড়ঙ্গ পথে দিখৌ নদীর সঙ্গে যুক্ত।

রঙঘর নামে একটি দ্বিতল অট্টালিকা রাজা প্রমত্ত সিংহের তৈরি। ইংরেজীতে এটিকে রঙঘর প্যাভিলিয়ন বলা হয়। নামটি সার্থক। আহোম রাজারা এই প্যাভিলিয়নের উপরে বসে হাতীর যুদ্ধ ও এই ধরনের খেলা দেখতেন।

জয়সাগর দীঘি ও তার তীরের মন্দিরটি রাজা রুদ্র সিংহের তৈরি। নিকটে আরও একটি দীঘি আছে, তার নাম গৌরী সাগর। এ সমস্ত জায়গাই খুব কাছাকাছি।

শিবসাগর শহরে পৌঁছবার আগে শর্মা আমাকে জয়মতীর কাহিনী শোনালেন। বললেন: আমার স্মরণশক্তি বড় কম, তা না হলে আপনাকে একটি গল্প বলতাম। থিয়েটার দেখেছি, রেডিওতে শুনেছি, তবু গল্পটা ভাল মনে নেই।

আমি বললুম: গল্প গল্পই, ভুল হলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু ইতিহাসের গল্প কিনা, তাই ভয় করে।

তার পরে গল্পটা সংক্ষেপে বললেন।

সিংহাসনে বসে লরা রাজা দেখলেন যে তাঁর সিংহাসন নিয়ে কয়েকটি বংশের রাজকুমারদের মধ্যে নানা রকমের ষড়যন্ত্র চলেছে। তাঁর আগে দুজন রাজা মারা পড়েছেন পঁয়তাল্লিশ দিন ও কুড়ি দিন রাজত্বের পর। আরও অনেক রাজকুমার তরোয়ালে শান দিচ্ছেন। তাঁর এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, হয় তাদের খুন কর, নয় কিছু ক্ষতি করে দাও। দেহে ক্ষত থাকলে তো আর রাজা হতে পারবে না। রাজা বললেন, ঠিক বলেছ।

কিন্তু তার পরেই দেখলেন যে রাজকুমার গদাধর সিংহকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজ খোঁজ রব উঠল, কিন্তু তাঁর কোন পাত্তাই নেই। তাঁর দুই ছেলে লাই আর লেচাই আছে মামার বাড়িতে, তারা কোন খবর জানে না। গদাধরের বউ জয়মতীকে সবাই পাকড়ালো, গদাধরের খবর বলতেই হবে। লরা রাজার চক্রান্তের কথা জয়মতী শুনেছিলেন, আর তিনিই স্বামীকে বলেছিলেন নিরুদ্দেশ হতে। সে কথা তো আর বলা যায় না, জয়মতী কিছুই বললেন না। সন্দেহ করে তাঁকে একটা মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়া হল, তারপর একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চলল। জয়মতী তবু কিছু বললেন না।

এদিকে গদাধর সিংহ পালিয়ে গিয়ে নাগাদের সঙ্গে লুকিয়ে আছেন। সেখানে এক নাগার মুখে রাজার নারী নির্যাতনের কথা শুনে ব্যাপারটা দেখতে এলেন। জয়মতী তখন মৃত্যুশয্যায়, স্বামীকে চিনতে পেরেও বললেন পালিয়ে যেতে।

গদাধর সিংহ এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। নাগাদের সাহায্যে জয় করেছিলেন আহোম সিংহাসন। তাঁর ছেলেরাই তাঁদের সতী মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করেছে জয়সাগর ও জয়মতী ডোল। এখনও প্রতি বৎসর এই জয়সাগরের তীরে সতী জয়মতীর নামে উৎসব হয়।

রাজা গদাধর সিংহের কথা আমি ইতিহাসে পড়েছি। তিনি দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। রাজ্যের মন্ত্রীরাই নাকি লরা রাজাকে তাড়িয়ে গদাধর সিংহকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর হিন্দুনাম ছিল বটে, কিন্তু তিনি হিন্দু ছিলেন না, ঘৃণা করতেন হিন্দু ও হিন্দু-ধর্মকে, ব্রাহ্মণদের তিনি দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গোমাংস ও ভেক তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল, এবং মদে তিনি ডুবে থাকতেন। জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হল মুসলমান বিজয়। মুসলমানরা আক্রমণ করেছিল, তিনি তাদের পরাস্ত করে কামরূপ অধিকার

করেছিলেন। পুনরায় গৌহাটিতে রাজধানী স্থাপন করে একজন বরফুকনের হাতে দিয়েছিলেন শাসনের ভার। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্র সিংহ ছিলেন পরম ধার্মিক ও হিন্দু। ব্রাহ্মণকে ইনি ভূমিদান করেছেন ও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবমন্দির। গদাধর সিংহ বলতেন যে আহোম বংশের পতনের কারণ হবে হিন্দুধর্ম, কিন্তু রুদ্র সিংহ এ কথা মানেন নি। তাঁর নীরব প্রতিবাদ আজও এই অঞ্চলের মন্দিরে মন্দিরে ধ্বনিত হচ্ছে।

শর্মার নির্দেশে ড্রাইভার আমাদের ডাকবাংলোয় এনে উপস্থিত করল। আমি হোটেলের কথা বলেছিলুম, কিন্তু শর্মার ধারণা যে খানসামা থাকলে ডাকবাংলোই ভাল। ছোট শহরের হোটেল তেমন পরিচ্ছন্ন হয় না। শর্মা চায়ের ব্যবস্থা করলেন, আর ডিনার বললেন একজনের। আমি বললুম ঃ আপনাদের কী হবে ?

শর্মা বললেন : আমার তো আত্মীয় আছেন, রাতে আমি সেখানেই থাকব, সকালবেলায় আসব আপনার কাছে। ড্রাইভারেরও হয়তো পরিচিত কেউ আছে, না থাকলে কোন হোটেলে খেয়ে নেবে।

চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। শর্মা বললেন : শিবসাগর আর শিবডোল আজ সন্ধ্যাবেলাতেই দেখে নিন, কাল দেখতে গেলে হয়তো দেরি হয়ে যাবে। যাবার পথে আরও তো দেখবার জিনিস আছে।

আকাশে তখন আলো নেই, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারিদিক। তাই দেখে আমি বললুম : এখন কি আর দেখবার সময় আছে !

শর্মা বললেন : শিবসাগরের তীরে শিবডোল দেখবেন, অন্ধকারে কোন অসুবিধা হবে না।

সত্যিই তাই। শহরটি যেন এই শিবসাগর আর শিবডোল নিয়ে গড়ে উঠেছে। শিবডোল মানে শিবের মন্দির। ডোল কথাটি বোধহয় দেউল থেকে এসেছে। শিবসাগরের তীরেই এই মন্দির।

এই বিশাল জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে এর সাগর নাম সার্থক হয়েছে, দীঘি পুষ্করিণী সরোবর বললে হয়তো মানাত না। মন্দিরটিও খুব বড়, শর্মা বললেন: এত বড় হিন্দু মন্দির আসামে আর নেই।

মন্দিরের ভিতরে আমরা শিবের দর্শন পেলুম। অন্যান্য শিবের মন্দিরে যেমন এখানেও তেমনি। শিবরাত্রির সময়েই সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। তখন যাত্রী আসে নানা দেশ থেকে, লোকে লোকারণ্য হয় শিবসাগর।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আর কিছু দেখবার আছে?

শর্মা বললেন: আর যা আছে তা আমরা কাল দেখব।

শহরের মধ্য দিয়ে তুবার যাতায়াতেই মোটামুটি একটা ধারণা আমার হয়ে গেল। শিবসাগর তো আর শিবসাগর জেলার সদর নয়, এর চেয়ে বেশি জাঁকজমক আশা করলে অন্যায় হবে। শর্মা এক জায়গায় নেমে গেলেন, বললেন: কাল সকাল সাতটার মধ্যেই আমি এসে যাব।

ডাকবাংলোয় ফিরে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল। আজ সারাদিন শর্মা আমার সঙ্গে ছিলেন, কালও ছিলেন একসঙ্গে। এই তুদিনেই তাঁকে বড় আপন মনে হচ্ছে। কামরূপের মানুষ শর্মা বাঙলা বলেন অসমীয়া ঢঙে, বেশ লাগে তাঁর কথাগুলো। একা বসে আমি তাঁর কথাই ভাবছিলুম। এমন সময় খানসামা এল ডিনারের সময় জানতে। আমি তাকে আটটার কথা বলে দিলুম।

এর পরে আমার মন চলে গেল অতীতের কথায়। শুনেছি যে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ বাঙলা দেশ থেকে সঙ্গীতজ্ঞ এনেছিলেন শিবসাগরে, তাঁরা এখানে বাঙলা গান বাজনার প্রচলন করেন, এখানে নামডাং নদী কোথায় আছে জানি নে, তার উপরে তিনি একটা বৃহৎ ও সুদৃঢ় সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সেই পুলের উপর

দিয়ে গাড়ি ঘোড়া হাতী চলাচল করত। তিনি চেয়েছিলেন যে পবিত্র গঙ্গা তাঁর রাজ্যে প্রবাহিত হবে, তাই তিনি গঙ্গা পর্যন্ত ভূভাগ জয় করবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু গৌহাটিতে পেঁাছে তিনি রোগে আক্রান্ত হলেন, সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হল।

রুদ্র সিংহের পুত্রের নাম শিব সিংহ। ইনিও ছিলেন পিতার মতো ধার্মিক। দেবসেবায় অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেছেন, এবং গৌরী সাগর ও শিব সাগর নামে জলাশয় দুটি তাঁরই দুই রাণী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমত্ত সিংহ রাজেশ্বর সিংহ ও লক্ষ্মী সিংহ তাঁর ভ্রাতা, এঁরাও একে একে রাজা হয়েছিলেন। রাজেশ্বর সিংহের পুরাতন প্রাসাদ পছন্দ হয় নি। প্রথমে তিনি একটি তিনতলা প্রাসাদ তৈরি করলেন, তার নাম গরগাঁও। সেখানেও তাঁর বেশি দিন ভাল লাগল না। তখন কেরেঙঘর নামে সাততলা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। এঁরা সকলেই ধার্মিক ছিলেন ও নানা স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ হয়েছিল লক্ষ্মী সিংহের পুত্র গৌরীসিংহের আমলে। ইংরেজের সাহায্যে তিনি বিদ্রোহ দমন করেন। তিনিই তাঁর রাজ্যের রাজধানী রঙ্গপুর থেকে যোরহাটে স্থানান্তরিত করেছিলেন। যোরহাটেই তাঁর মৃত্যু হয়। এঁদের পরে দুজন রাজা হয়েছিলেন গৌরী সিংহ ও কমলেশ্বর সিংহ, তারপরেই চন্দ্রকান্ত সিংহ, যাঁর সময়ে ব্রহ্মরাজ এসেছিলেন আসামে আধিপত্য করতে।

অন্য ধারে কাছাড়ের বিতাড়িত রাজা গোবিন্দচন্দ্রও ব্রহ্মরাজের সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁকেও সাহায্য করতে এল বর্মীরা। ইংরেজ এসব ভাল চোখে দেখছিলেন না, তাঁরাও নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করে এই সব গোলযোগের মধ্যে ঢুকে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল এবং ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পরের বছরই আসাম অধিকার করে নিলেন। শুনেছি ইংরেজবাহিনী যুদ্ধজাহাজে করে রেঙ্গুনে গিয়ে রেঙ্গুন অধিকার করেছিল। তারপরেই বিখ্যাত ইয়ান্দাবোর সন্ধি

হয়। আর তখন থেকেই আসাম এসেছিল ইংরেজের হাতে। আমরা স্বাধীন হয়েছি অল্পদিন।

শর্মা তাঁর কথামতো সকাল সাতটার আগেই এসে উপস্থিত হলেন। তখনও আমার চা খাওয়া হয় নি। তাড়া দিয়ে তিনিই তাড়াতাড়ি চা আনালেন। আমি বললুম : কাল আপনার কষ্ট হয় নি তো?

কষ্ট! অনেক দিন এমন আনন্দ পাই নি।

সত্যি নাকি!

শর্মার দৃষ্টি খানিকটা ভিজে দেখাল, বললেন : চাকরি অনেক দিন করছি, কিন্তু চাকরিতে যে আনন্দ আছে এত দিনে তা জানলাম।

আমি বললুম : কাজ নিজের মনে হলেই তাতে আনন্দ, পরের কাজকে আমরা গোলামি ভাবি বলে আমাদের দুঃখের শেষ নেই।

রাজেশ্বর সিংহের সাততলা প্রাসাদ কেরেঙঘর শিবসাগর থেকে ছয় মাইল দূরে, কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে নয়। মাটির উপরে তিনটি তলা খুবই স্পষ্ট, চারতলাও হতে পারে, বাকি তিনটে তলা মাটির নিচে কিনা বোঝা যায় না। সময় মতো ডিব্রুগড়ে পৌঁছবার চেষ্টাতে আমরা একটুও সময় নষ্ট করলুম না।

শিবসাগর থেকে আঠারো মাইল পূর্বে আহোম রাজাদের প্রথম রাজধানী চরাইদেও। এখানেও অনেক সরোবর ও মন্দির আছে। আহোম রাজাদের কুলদেবতা আছেন এইখানে, রাজা ও রাজ-পরিবারের অনেক সমাধিও আছে। কিন্তু আমি এ সব দেখতে রাজী হলুম না, বললুম : এবারে সোজা চলুন ডিব্রুগড়ে।

জয়সাগরে একটি মাছের ফার্ম আছে, টুরিস্টদের জন্যে নৌকা-বিহারের ব্যবস্থা হচ্ছে। কো-অপারেটিভ কলেজ ও শিবসাগর পলিটেকনিক শহরের দ্রষ্টব্য স্থান। পরের বারে শর্মা আমাকে এসবও দেখতে বললেন।

এ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চায়ের বাগান। শুনেছিলুম যে আসামের প্রধান শিল্প হল চা। সমগ্র ভারতে যে চা উৎপন্ন হয় তার দুই তৃতীয়াংশ চা আসামের। এই রাজ্যের সাতশো সতেরটি চা বাগান থেকে প্রায় চল্লিশ কোটি পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। তার জন্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক বাগানে ও কারখানায় কাজ করে। চা রপ্তানীর জন্যে বাক্স তৈরির কারখানাও গড়ে উঠেছে।

পথ চলতে চলতে শর্মা বললেন: মিরিদের আপনি দেখেন নি?

বললুম: না।

শর্মা বললেন: এই উপজাতির বাস এই অঞ্চলে। শিবসাগরের সমতলভূমিতেও আছে, আবার পার্বত্য অঞ্চলেও আছে। দীর্ঘ দেহের বলিষ্ঠ লোক এরা, স্বচ্ছন্দে পাহাড়ে চলাচল করে। কৃষি ও ব্যবসা দুই-ই জানে। সমতলের জিনিস পাহাড়ে নিয়ে যায়, আর পাহাড়ের উৎপন্ন দ্রব্য আনে সমতলভূমিতে। আবর জাতির লোকেরা এদের দাস বলে, আর এরা তা স্বীকার করে না। এরা বলে, পাখিদের অনুসরণ করে এরা তিব্বত থেকে এ দেশে এসেছে।

শর্মা মিরিদের সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বললেন: গ্রামে এরা উঁচু মাচার উপর ঘর করে। মাচার নিচে এদের শুয়োর ছাগল মুর্গি থাকে, আর উপরে থাকে নিজেরা। আগে গোমাংস খেত, এখন আর খায় না, এখন এদের আচার বিচার হিন্দুদের মতোই। এরা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মার আদর্শরূপে পুজো করে নেকিরি ও নেকিরানের। ভক্তি করে সূর্য স্বর্গ ও পৃথিবীকে। কিন্তু শবদাহ করে না, মৃতদেহ কবর দেয়।

এর পরে শর্মা চুপ করলেন। আমি বললুম: এদের বিবাহের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

শর্মা বললেন: যা শুনেছি তা সত্যি কিনা জানি নে।

আমি বললুম: আপনি শোনা কথাই বলুন।

শর্মা একটু ইতস্তত করে বললেন: বাল্যকালেই এদের বিবাহ

স্থির হয়, কিন্তু সংসার করার সামর্থ্য না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ হয় না। দরিদ্ররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও অনেক সময় বিয়ে করতে পারে না। আবার যাদের সঙ্গতি আছে তারা একাধিক বিয়ে করে। এই সামাজিক অসাম্যের জন্যে নাকি স্ত্রীলোকেরও বহুবিবাহ স্বীকৃত হয়েছে। একাধিক পুরুষ একজন মেয়েকে বিয়ে করে, কিন্তু এই স্ত্রীরা নাকি সর্বতোভাবে স্বামীপরায়ণ।

শর্মা খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললেন: আর একটি কথাও শুনেছি।

বলেই থেমে গেলেন।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: বলুন।

শর্মা লজ্জিত ভাবে বললেন: থাক সে কথা।

থাকবে কেন, বলুন আপনি।

শর্মা অনেক সঙ্কোচ করে বললেন: সত্যি কিনা জানি না, এরা সৎমাকে বিবাহ করতে পারে। বাপের বহুবিবাহ থাকলে তাঁর অবর্তমানে সামাজিক নিয়মে ছেলেরা সৎমাকে বিবাহ করতে পারে।

আমি বললুম: গারোদের সম্বন্ধেও আমি এই কথা শুনেছি। হয়তো কোন সময় প্রচলন ছিল বলেই এই কথা শুনেছেন।

শিবসাগর থেকে ডিব্রুগড়ের দূরত্ব বাহান্ন মাইল। বেলা দশটার আগেই আমরা ডিব্রুগড়ে পৌঁছে গেলুম।

শর্মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আজকের রাতটা ডিব্রুগড়েই থাকবেন, না কাজ মিটে গেলে আজই ফিরবেন ভাবছেন ?

শিবসাগরে শর্মার আত্মীয়ের কথা আমার মনে পড়ল। বললুম : এখানে রাত কাটাবার দরকার কী! শিবসাগরেই আমরা ফিরে যেতে পারি।

শর্মা খুশী হয়ে বললেন : তাহলে তো খুবই ভাল হয়, কাল সন্ধ্যাবেলাতেই আমরা গৌহাটি পৌঁছতে পারব।

বলে ড্রাইভারকে তাদের নিজেদের ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ড্রাইভারের উত্তর শুনে আমাকে বললেন : খুব পারবে। আড়াইশো মাইল পথ ওর কাছে কিছুই নয়। দুবার শিলঙ যাতায়াত করেছে, এ তো সমতল রাস্তা।

তারপরে ডিব্রুগড়ের উপকণ্ঠে পৌঁছে আমাকে বললেন : শুধু শুধু হোটেলে কেন পয়সা দিই, সোজা অফিসেই যাওয়া যাক।

এ অফিসের কাজকর্ম একটু অন্য ধরনের দেখলুম। দশটার আগেই কয়েকজন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, শর্মা তাঁদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে আনলেন। ম্যানেজার এক একদিন দশটার আগেই এসে উপস্থিত হন, আবার এক একদিন খুব দেরি করেও নাকি আসেন। কিন্তু কর্মচারীরা দেরীতে এলেই বিপদ। শর্মা চুপিচুপি বললেন, এ অফিসের কাজকর্ম একটু ভাল করে দেখতে হবে, দরকার হলে দু দিন থেকে যাওয়া ভাল।

আমি বললুম : ভাল ভাবে কাজ শেষ না করে আমরা ফিরব না।

এর অল্পক্ষণ পরেই ম্যানেজার হুড়মুড় করে এসে উপস্থিত হলেন। আমার পরিচয় পেয়ে এমন খুশী হয়ে উঠলেন যে আমারই

লজ্জা হল। বললেন: কী সৌভাগ্য আমার! আজ এক পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল, আপনার জন্যেই বোধহয় সে কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করতে পেরেছি।

বলেই চায়ের ব্যবস্থার জন্যে হাঁকডাক করতে লাগলেন।

দুপুরেও ভদ্রলোক আমাদের ছাড়লেন না, বাড়িতে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী আমাদের পরিবেশন করে খাওয়ালেন। তিনি রাতের ব্যবস্থাও করেছিলেন, কিন্তু আমরা কিছুতেই মানলুম না। জোর করেই আমরা শিবসাগরের দিকে বেরিয়ে পড়লুম।

শর্মা বললেন: লোক খুব ঘড়েল বলে মনে হল। কাগজে পত্রে যা দেখা গেল আসলে তা হচ্ছে কিনা সন্দেহ রয়ে গেল।

আমি বললুম: তা হলে আর ভাবনা ছিল কী!

বলে আমি সমস্ত জিনিসটা তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক শুনে দু চোখ বিস্ফারিত করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি বললুম: দুটো অফিসের কাজকর্মে বিশেষ তফাৎ নেই। একটা অফিস তা মেনে নিচ্ছে, আর একটা অফিস তা না মেনে চোখে ধুলো দিচ্ছে। অফিসের একটা ছোকরা যে ম্যানেজারকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এল তা লক্ষ্য করেছেন তো! ছোকরার নাম হল গগৈ। তার প্রমোশনের জন্যেও সুপারিশ গেছে।

শর্মার বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। তাই দেখে আমি হেসে বললুম: আপনার চোখের সামনে দিয়েই সেই ছোকরা সাইকেল নিয়ে নেমে গেছে। তারপরে ম্যানেজার এসেছে সাইকেলে চেপে। আর সেই ছোকরা অনেকক্ষণ পরে হেঁটে ফিরেছে। কিন্তু থাক সে কথা। আকাশে এখনও আলো আছে। শহরটা একটু ঘুরে দেখা যাক।

শর্মার বিস্ময় লজ্জায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। বললেন: শহর দেখার কথা আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।

বলেই ড্রাইভারকে সেই নির্দেশ দিলেন। ড্রাইভার বোধহয়

পেট্রল পাম্পের দিকে যাচ্ছিল। সেখানে আর ঢুকল না। সোজা চলল শহর দেখাতে।

এই শহরে কোন মন্দির বা পুরাকীর্তি দেখলুম না। দেখলুম একটা সাধারণ শহর, বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই অনেকটা উন্নত হয়ে উঠেছে। লখীমপুর জেলার সদর বলে আরও প্রাধান্য পেয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের তীরেই শহরটি বাড়ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে শহরের একটি অংশ ব্রহ্মপুত্র গ্রাস করেছে। ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় শুধু এ শহরের নয় আসামের অনেক গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ একটা দুঃখ ও আতঙ্কের ব্যাপার। শুনলুম যে ডিব্রুগড় শহরকে নদীর হাত থেকে রক্ষার জন্য আসাম সরকার অনেক অর্থব্যয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। শহর এখন অন্য ধারে বাড়ছে। সেই দিকেই বারবাড়ি নামে একটা জায়গায় আসাম মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহরের নতুন অংশটি সুন্দর হয়েছে ছবির মতো।

এখানে থাকবার জন্যে সার্কিট হাউস আর ডাকবাংলো আছে। বাজারে কয়েকটা হোটেলও দেখেছি, আর দেখেছি অজস্র সাইকেল রিকৃশা আর কয়েকখানা ট্যাক্সি। এখানকার বাণিজ্যের ব্যাপারটাও অনুমান করতে পেরেছি। শুধু চা নয়, তেল আর কয়লাও আছে। এই তিনটিই প্রধান।

মোটরে তেল নেবার সময় শর্মা বললেন: এই তেল আসে ডিগবয় থেকে। ডিগবয় এখান থেকে ষাট মাইল দূরে। মাঝপথে তিনসুকিয়া।

তারপরে ডিগবয়ের কথা আমাকে সংক্ষেপে বললেন। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আসাম অয়েল কোম্পানী এসে ডিগবয়ে তৈল শোধনাগার স্থাপন করেছিল, তারপরে বার্মা অয়েল কোম্পানী এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এখন এই শহরে ও আশেপাশে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার লোক বসবাস করে, তার মধ্যে সাড়ে সাত হাজার লোক এই তেলের কারখানার সঙ্গেই যুক্ত। নতুন তেলের সন্ধান

এখনও চলছে এবং নাহারকাটিয়াতে পাওয়া গেছে নতুন তেলের সন্ধান। হুনমাটিতেও একটি নতুন শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে শুনেছি ডিগবয় থেকে এগার কোটি সাতষট্টি লক্ষ গ্যালন পেট্রল পাওয়া গেছে।

ডিগবয়ের কাছে লিডো ও মার্গারিটায় আছে কয়লার খনি। মিকির পাহাড়েও আছে। আর কাঠ। লিডো মার্গারিটা অঞ্চলে গেলে এই কাঠ রপ্তানির ব্যবস্থা না দেখে ফেরা উচিত নয়। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে হাতীর দরকার। হাতীদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে এই দুরূহ কাজ মানুষকে করতে হয় না। ক্রেনেরও দরকার নেই। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায়।

আসামের এই উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। পরে আমি একখানি মানচিত্র সংগ্রহ করে সব কিছু জেনে নিয়েছিলুম।

তিনসুকিয়া থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে দুটো ভাগ হয়েছে। এক ভাগ দক্ষিণ পূর্বে ডিগবয় মার্গারিটা লিডোর উপর দিয়ে ব্রহ্মদেশের সীমান্তের দিকে গেছে। এই সীমান্ত খুবই কাছে। অন্য ভাগ উত্তর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে সদিয়ার উপর দিয়ে নেফায় পৌঁছেছে। চীনের সীমান্ত অতি নিকটে। নেফার বিরাট এলাকা আসামের সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। কিন্তু সে সমস্তই ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে।

টাইমটেবল থেকে আমি রেলে যাতায়াতের ব্যবস্থাও দেখে নিয়েছিলুম। ডিব্রুগড় টাউন স্টেশন থেকে লিডো পর্যন্ত তিনখানা ট্রেন যাতায়াত করে। সময় লাগে ঘণ্টা পাঁচেক। ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেলা সাড়ে এগারটায় আর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন ছাড়ে। সেই ট্রেন তিনসুকিয়া জংসন মাকুম জংসন হয়ে ডিগবয়

মার্গারিটার উপর দিয়ে লিডো যায়। লিডো থেকে লেখাপানি নামে আর একটি স্টেশন পর্যন্ত শাট্‌ল্ ট্রেন যাতায়াত করে।

সদিয়ার দিকে যাবার ট্রেন অন্য। তিনসুকিয়া থেকে মাকুম জংসন হয়ে সেই ট্রেন ডাঙ্গরি নামে একটি স্টেশনে যায়। দুখানা ট্রেন ছাড়ে সকাল আটটার পরে আর বেলা প্রায় পৌনে তিনটের পরে। ডাঙ্গরি পৌঁছতে দু ঘণ্টার কম সময় লাগে। এই ডাঙ্গরি পর্যন্ত আছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, তারপরেই ব্রহ্মপুত্রের তীরে সইখোয়া ঘাট। এখান থেকে নদী পেরিয়ে সদিয়া।

শর্মার কাছে আমি সদিয়ার গল্পও শুনলুম। একদা সদিয়া উত্তর পূর্ব আসামের একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। উনিশশো পঞ্চাশের ভূমিকম্পে ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরিবর্তনে সদিয়ার দুর্দিন এল। আহোমরা আসামে এসে এইখানেই প্রথম ঘাঁটি করেছিল। অনেক দিন পর্যন্ত এইখানে আহোম সর্দারদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর তাদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকলে ইংরেজরা এসে সদিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। তারপরে এই শহরের উন্নতি হয়েছিল বাণিজ্যে, চীনের সঙ্গেও নাকি বাণিজ্য চলত।

সদিয়ার নাম আমি আর একটি প্রসঙ্গে শুনেছিলুম। এই শহর থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে একটি রমণীয় তীর্থস্থান আছে, তার নাম পরশুরাম কুণ্ড। এই তীর্থে স্নান করে পরশুরামের মাতৃহত্যার পাপক্ষয় হয়েছিল। সেই স্থানের সৌন্দর্য নাকি অপরূপ। যে ব্রাহ্মণ একুশবার ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন, সেই পরশুরামের স্মৃতির সঙ্গে এই স্থান জড়িত হয়ে আছে। স্থানীয় লোকে এই অঞ্চলকে প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্য বলে দাবী করে, এইখানেই ছিল রাজা ভীষ্মকের রাজধানী ভীষ্মক নগর, রুক্মিণী হরণ হয়েছিল এইখান থেকে। তাম্রেশ্বরী দেবীর ভাঙা মন্দির সেখানে আজও আছে। পুরাণে যে সৌমার পীঠের উল্লেখ আছে, সদিয়া তারই অন্তর্গত। এখন সদিয়া নেফার অন্তর্গত লোহিত ডিভিসনে পড়েছে। পরশুরাম কুণ্ড দেখতে হলে তেজপুরস্থিত

নেফার লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিসনের পলিটিকাল অফিসারের নিকট অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়।

পরশুরাম কুণ্ডে একটি ছোট ধর্মশালা আছে। টিমাই ঘাটেও আছে আর একটি ধর্মশালা। যাত্রীরা এসে এই সব ধর্মশালায় আশ্রয় নেন। কেউ তীর্থের টানে আসেন, কেউ আসেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে। শিবসাগরের পথে শর্মাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি দেখেছেন পরশুরাম কুণ্ড?

শর্মা বললেন: না। তবে শুনেছি যে সে স্থান বড় মনোরম। এমন মনোরম স্থান এ অঞ্চলে আর নেই।

মনোরম না হলে পরশুরাম সেখানে আসবেন কেন!

নেফার কথা আমি শিলঙে কমলাকান্তবাবুর কাছে শুনেছিলুম।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত নর্থ-ঈষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিকে সংক্ষেপে নেফা বলা হয়। সরকারী নামের চারিটি আভক্ষর নিয়ে এই ডাকনামটি এখন সর্বসাধারণে বেশি পরিচিত। নেফার এলাকা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বর্গমাইল। আগে ছটি বিভাগ ছিল, এখন তার একটি বিভাগকে নাগাল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বিধিমতে আসামেরই অংশ, কিন্তু পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। রাষ্ট্রপতির নামে আসামের রাজ্যপালই এ অঞ্চল শাসন করেন।

নেফার ডিভিসনগুলি সম্বন্ধে আমি একটা মোটামুটি ধারণা করে নিয়েছি। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে চারটি এবং দুটি দক্ষিণে। ভুটান ও তিব্বত সীমান্তে কামেং ডিভিসন, এই অঞ্চলেই চীনারা হামলা করেছিল। সদিয়ার উত্তরে লোহিত ডিভিসন, আর এই দুই ডিভিসনের মাঝে সুবনসির ও সিয়াং ডিভিসন। তেজপুর থেকে কামেং ডিভিসনের বমডিলা যাবার পথ, উত্তর লখীমপুর থেকে সুবনসির ডিভিসনের হাপোলি, আর ডিব্রুগড়ের পরপারে সিয়াং ডিভিসনের দরিং ও পানজিন। তিরাপ আর তুয়েনসাং ডিভিসন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে। উত্তরে তিরাপ, পথ এসেছে মার্গারিটা থেকে তিন চার মাইল ; আর দক্ষিণে তুয়েনসাং, নাগাল্যাণ্ডের সংলগ্ন ছিল বলে এখন নাগাল্যাণ্ডেরই অন্তর্গত হয়েছে।

এই বিস্তীর্ণ এলাকায় নৃবিজ্ঞানীদের মতে পঞ্চান্নটি উপজাতি আছে, তাদের মধ্যে পঁচিশটি উপজাতিকে একেবারে স্বতন্ত্র জাতি বলা উচিত। লোকচক্ষুর আড়ালে তারা অনেক দিন বসবাস করেছে। কেউ বলেন, খ্রীষ্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে এরা তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ থেকে এসেছে, আমাদের পুরাণ ও মহাভারতের

মতে এই অঞ্চলেই ছিল কিরাত জাতির বাস। তপস্যারত অর্জুনকে মহাদেব এদেশেই দেখা দিয়েছিলেন কিরাত রূপে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের রাজা এই কিরাত সৈন্য নিয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন।

আহোম রাজাদের সময় এরা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। সমতলবাসী প্রজাদের উপর এদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাজা উদয়াদিত্য এদের সায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে বারণ করে বলেছিলেন যে সে অসম্ভব কাজ। হাতী যেমন ইঁদুরের গর্তে ঢুকতে পারে না, তেমনি এই উপজাতিদের শায়েস্তা করার চিন্তাও পাগলামি। রাজার সৈন্যসামন্ত এদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তীকালে এদের দমন করবার জন্যে আহোম রাজারা ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইংরেজ তাদের সঙ্গে বন্ধুতা করেছে। উপহার পাঠিয়েছে, মিশনারি পাঠিয়েছে, শান্তভাবে বসবাসের শিক্ষা দিয়েছে। সমতলবাসীর সঙ্গে এরা যে শত্রুতাই করত এমন কথা নয়, বন্ধুভাবে বাণিজ্যও করত। এরা চাষবাস করতে জানে, হাতের কাজ জানে নানা রকম, ব্যবসাও বোঝে। পার্বত্য এলাকায় এরা স্বাবলম্বী জীবন যাপন করত বলেই এদের কথা সাধারণের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

এদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়েছে স্বাধীন ভারতে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এদের জন্যে মাত্র দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, এখন এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা একশো তের। তিনটি হাই স্কুল ও তেরটি মিড্‌ল স্কুলও হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঞ্চলের উন্নতির জন্যে আট কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পথঘাট নির্মাণে খরচ হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। দেশরক্ষার প্রয়োজনেও এ অঞ্চলের আরও উন্নতি হবে।

কমলাকান্তবাবু আমাকে নেফার উপজাতিদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। কামেং বিভাগের মনপা শেরদুকপেন আকাদের কথা,

সুবনসিরি বিভাগের আপাতানি দফলা ও মিরিদের কথা, সিয়াং বিভাগের আবর গোষ্ঠীর পদং মিনিয়ং ও গালঙদের কথা, লোহিত বিভাগের মিশমি খামতি সিংফোদের কথা। তিরাপের তাংসা ও নাগাদের কথাও বলেছিলেন। সরকারের অনুমতি নিয়ে এই অঞ্চলে তিনি কিছু ভ্রমণও করেছেন। বলেছিলেন: সিহাবুদ্দীনের কথা মনে আছে তো?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম: সিহাবুদ্দীন আবার কে?

নাম শোনেন নি সিহাবুদ্দীনের, কী আশ্চর্য!

তাঁর কথায় আমি লজ্জা পাই নি, বলেছিলুম: কোথায় কার কাছে শুনব!

তিনি বলেছিলেন: কেন, ইতিহাস পড়েন নি?

আপনি কি কোন পাঠান নবাবের কথা বলছেন!

আরে রাম রাম!

বলে প্রথমে আমার অজ্ঞতাকে ধিক্কার দিলেন, তারপরে বললেন: সিহাবুদ্দীন হলেন ঐতিহাসিক, ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি মীরজুমলার সঙ্গে আসাম আক্রমণে এসেছিলেন। নেফার মিরি-মিশমি মেয়েদের দেখে তিনি কী বলেছিলেন জানেন? বলেছিলেন যে তারা সমতলের অসমীয়া মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম: সত্যি নাকি!

ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠে বলেছিলেন: সত্যি নাকি মানে! অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

তারপরেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ঘুরে যা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি, তাই দেখলেন নেফার পাহাড়ে উঠে। উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিশ্রেণী, অরণ্যময় পার্বত্যভূমিতে কলস্বনা নদী ও নির্ঝরিণী, সবুজ পাইন আর লাল রডড্রেনডন, কুটীর ও কৃষিক্ষেত্রে অপরূপ নেফা তার

অধিবাসীদের মতোই পরম রমণীয়। কমলাকান্তবাবু বলেছিলেন : কাদের কথা বলব ?

আমি বলেছিলুম : সকলের কথাই বলুন।

চা শেষ করে আমরা কফি আনিয়েছিলুম, আর কমলাকান্তবাবু একটার পরে আর একটা সিগারেট শেষ করেছিলেন। নেফার মানুষদের কথা তবু তিনি শেষ করতে পারেন নি।

আমাদের মোটর ছুটেছে শিবসাগরের দিকে। পথঘাট এখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুপাশে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। মোটরের হেডলাইট যতটুকু আলো করেছে, ততটুকুই এখন আমাদের জগৎ। শর্মা নীরবে বসেছিল, আমিও নীরবে কমলাকান্তবাবুর কথা ভাবছিলুম। মনে পড়ছিল নেফার আশ্চর্য মানুষদের কথা।

সিয়াং বিভাগের গালংদের কথাই আমার সকলের আগে মনে পড়ল। একদা স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয় ভ্রমণের সময় যা দেখেছিলেন কমলাকান্তবাবু তাই দেখলেন গালংদের গ্রামে। একটি স্ত্রীর অনেকগুলি স্বামী। স্বামীজী এটি একটি কুপ্রথা বলে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। সে কথা শুনে তারা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'তুমি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে মানুষকে স্বার্থপরতা শেখাতে চাও! এটি আমার উপভোগ্য, অন্যের নয়—এরূপ ভাবা কি অন্যায় নহে?' স্বামীজী এই কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

সিয়াং বিভাগের উপজাতিরা নিজেদের আবর বা আদি গোষ্ঠীর মানুষ বলে। নাগাদের মধ্যে যেমন অনেক সম্প্রদায়—আও অঙ্গামী নোটা সেমা প্রভৃতি, আবরদের মধ্যেও তেমনি পদম মিনিয়ং শিমোং গালং প্রভৃতি। সাধারণত এরা এক বিবাহে বিশ্বাসী, কিন্তু গালংরা বোধহয় সমগ্র আসামে এর ব্যতিক্রম। দক্ষিণ ভারতের টোডাদের মতো এদের মেয়েরা অনেক পুরুষের সংসার করে। সঙ্গতি থাকলে এক পরিবারের সবকটি ভাই বিবাহ করতে পারে, কিন্তু তা না থাকলে সবকটি ভাই মিলিত ভাবে কন্যাপণ দিয়ে একটি মেয়েকে ঘরে আনে,

সেই মেয়ে এদের সকলেরই স্ত্রী। ভাইরা পরে বিবাহ করলেও সব বউই সব ভাইয়ের স্ত্রী বলে মেনে নেওয়া হয়। এমনকি গোষ্ঠীর অন্যান্য পুরুষও তার দাবী জানাতে পারে। এই অদ্ভুত প্রথা স্বামী বিবেকানন্দের চোখে খারাপ লেগেছিল, কিন্তু গালংরা এই প্রথাকে চিরকালই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে।

গালংদের সমাজে আর একটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। অন্য সমস্ত উপজাতিদের গ্রামে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের পৃথক ভাবে রাখা হয়। তাদের থাকবার ঘরকে মোরাঙ মোশাপ রাশেঙ প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। বয়স্ক স্ত্রীপুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকে এই সব ঘর। কিন্তু পরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়, পরে তাদের মিলন হয় পরিণয়ে পরিণত। গালংদের মধ্যে এই প্রথা নেই, বোধহয় তার প্রয়োজনও নেই।

আবর মেয়েদের একটি আভরণের কথা কমলাকান্তবাবু আমাকে বলেছিলেন। এই অলঙ্কারটির নাম বেয়প, কোমরের ঘুনসি থেকে ঝোলানো কতগুলি চাকতি। সামনের চাকতিটিই সবচেয়ে বড়, পাশেরগুলো ক্রমশ ছোট হয়েছে। এই বেয়পে শরীরের সামান্য অংশই ঢাকা পড়ে, কিন্তু শুধু এইটি পরেই অনেক মেয়েকে থাকতে দেখা যায়।

আমি এ কথা বিশ্বাস করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বলেছিলেন: আমি এক সাহেবের লেখায় পড়েছি।

আর আপনি কী দেখেছেন?

আমি তাদের কোমরে কাপড় জড়ানো দেখেছি। বেয়প তারা নিচে পরে, আর একটি সন্তানের মা হয়েই তারা সেটি খুলে ফেলে বলে শুনেছি।

আবরদের লোকসঙ্গীত রচনার কথাও আমি কমলাকান্তবাবুর

কাছে শুনেছিলুম। পোনাঙ পেঙে প্রভৃতি নানা রকম লোকসঙ্গীত তাদের মুখে মুখে চলে আসছে। আর আবে নামে এক রকম গন্থ রচনাও আছে। কিন্তু তাদের কোন লিপি নেই বলে কিছুই লিখে রাখতে পারে না।

নাচগানে এদের অনুরাগ দেখা গেছে। শুধু ধর্মের অনুষ্ঠানে নয়, বাড়িতে মানী অতিথি এলেও এরা গান গায়। তাপো রিজা নামে এদের নৃত্যনাট্য আছে, যুদ্ধের নৃত্য। বানৃজি নোকি এদের রোমান্টিক নাচ, নাচের মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক কাহিনীর অভিনয় হয়।

সমস্ত উপজাতিদের মতো এদেরও দেবতা ও অপদেবতা আছে, মৃতদেহ এরা কবর দেয়, আর পঞ্চায়েৎ বসায় বিচারের জন্য।

কমলাকান্তবাবু বলেছিলেন: আমি এই আবরদের সঙ্গে মিশে আশ্চর্য হয়েছি। এরা নাকি দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর ও নরঘাতক বলে আহোম ও ইংরেজরা এদের ভয় পেত। সাহেবরা অনেক অদ্ভুত কথা এদের সম্বন্ধে লিখে গেছে। অথচ আমি এদের কাছে অমায়িক মধুর ব্যবহার পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

দফলাদেরও এই দুর্নাম আছে। তারাও আবরদের মতো নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। সমতলবাসীদের শান্তিপ্রিয় জীবন নাকি তারা একসময় দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কমলাকান্তবাবু বলেছিলেন: আমি তাদের চেহারায় বা ব্যবহারে কোন নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাই নি। দফলা মেয়ে পুরুষদের আমার বেশ সুন্দর বলে মনে হয়েছে। তাদের চোখে মুখে একটা প্রসন্নতা সারাক্ষণ লেগে আছে। এরা জাত শিকারী। অরণ্যময় পার্বত্য এলাকায় এদের বাস বলে বন্যজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করে এদের বাঁচতে হয়। সেখানেই এদের চাষবাস ও সংসার।

দফলা পুরুষ বহুবিবাহে অভ্যস্ত, তার স্ত্রীরা তাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করে। সতীনদের মধ্যে বিবাদের কথা শোনা যায় না। বিবাহের ব্যাপারে দফলাদের আশ্চর্য রকমের স্বাধীনতা। গর্ভধারিণী

মা বোন পিসি ও নিজের কন্যা ছাড়া আর যে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের বিবাহ হতে পারে। মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ প্রশস্ত। বিধবা সৎমা খুড়ি জেঠি মাসি মামী এমনকি পুত্রবধূর সঙ্গেও বিবাহ হতে পারে। বয়স কোন বাধা নয়, বিবাহ ব্যাপারে দফলা পুরুষ কন্যার বয়স নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দফলাদের সমাজজীবনে একটি বৈশিষ্ট্য হল যে তাদের মধ্যে মোড়ল বা পঞ্চায়েৎ নেই। তারা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিকে মেনে নিয়ে একটা সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এদের চেয়ে অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত এই সুবনসিরি বিভাগেরই আপাতানি উপত্যকার মানুষেরা। তারা আপাতানি উপজাতি নামে পরিচিত। প্রতিবেশী দফলাদের তারা আদৌ পছন্দ করে না, বলে, তাদের জন্যে আছে ন্যাড়া পাহাড় আর দস্যুবৃত্তি। নিজেরা গর্বিত আনন্দময় উপত্যকা ও পরিশ্রমের ফসলের জন্য। সত্যিই এরা দফলাদের মতো দুরন্ত জাত নয়, শান্তির জীবনই এরা ভালবাসে।

তবে এদের নৃশংসতা ধারণা করা যায় না। কমলাকান্তবাবু একটি গল্প আমাকে বলেছিলেন, সেই গল্প শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম। আপাতানি ছেলেমেয়েরাও বিবাহের পূর্বে যথেচ্ছ মেলামেশা করে, বেপরোয়া ভাবে তারা জীবন উপভোগ করলেও অভিভাবকরা তাদের বাধা দেয় না। কিন্তু বিবাহ হলেই তাদের সংযত জীবন যাপন করতে হবে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে আর রক্ষা নেই। স্ত্রীর প্রণয়ীকে খুঁজে বার করে আপাতানি স্বামী তাকে শাস্তি দেবেই। কমলাকান্তবাবু বলেছিলেন: শাস্তি মানে মৃত্যুদণ্ড। একজন লোক শুনেছি সেই পুরুষকে কচুকাটা করে তার মাংস রেঁধে স্ত্রীকে খেতে বাধ্য করেছিল।

আমি শিউরে উঠে বলেছিলুম: না না, এ অসম্ভব কথা। এ রকম ঘটনা এ যুগে সম্ভব নয়।

কমলাকান্তবাবু বললেন: আরও একটি বীভৎস গল্প শুনেছি।

একজন নাকি শত্রুপক্ষের এক মেয়ের হাত কেটে এনেছিল। সেই হাত নিয়ে গ্রামে মস্ত উৎসব হয়েছে।

এর পরে কামেঙ বিভাগের উপজাতিদের কথা।

রাত বেড়ে যাচ্ছিল বলে কমলাকান্তবাবুকে আমি বলেছিলুম : এবারে সংক্ষেপে বলুন।

আমার কথা ভদ্রলোকের পছন্দ হয় নি, বলেছিলেন : আজ থাক তাহলে।

না না, থাকবে কেন। বলুন আপনি।

কমলাকান্তবাবু নিজেও বুঝেছিলেন যে সংক্ষেপে না বললে নেফার মানুষদের কথা শেষ হবে না। তাই বললেন : কামেঙ বিভাগের প্রধান উপজাতি হল আকা মনপা ও শেরডুকপেন। আকাদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিবাদ হয়েছিল, কিন্তু সে বিবাদ স্থায়ী হয় নি। আকাদের সংস্কৃতি অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে উন্নত, গণতান্ত্রিক তাদের সমাজনীতি, সংসারে নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, আর দুজন নারীকে রাণী বলে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছে। এরা চাষ করে ঝুম প্রথায়, নাচ গান আনন্দে করে জীবন যাপন।

মনপা আর শেরডুকপেনরা হল বৌদ্ধ। শিল্পীর জাত তারা। শুধু হাতের কাজে নয়, অভিনয়েও তাদের অসামান্য ক্ষমতা।

কমলাকান্তবাবু তাঁর পোড়া সিগারেটে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন : এইটে শেষ হবার আগেই সকলের কথা শেষ করব।

আমি বলেছিলুম : এ আপনার রাগের কথা নয় তো ?

রাগ কিসের, যতটুকু ভাল লাগে ততটুকুই শুনুন।

বলে এক নিঃশ্বাসে লোহিত বিভাগের মিশমি ও তিরাপ বিভাগের তাংসাদের কথাও শুনিয়ে দিলেন।

সদিয়ার উত্তরে হল নেফার লোহিত বিভাগ, সদিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে পরশুরাম কুণ্ড। মিশমিরা নিজেদের পরশুরামের বংশধর

বলে দাবী করে। দুর্গম মিশমি পাহাড়ে তাদের বাস। খামতি আর সিংফো নামে দুটি বৌদ্ধ উপজাতিও এই বিভাগের অধিবাসী।

কিছু লজ্জিত ভাবে আমি বলেছিলুম: এত সংক্ষেপে বলতে আমি আপনাকে বলি নি।

কমলাকান্তবাবু নিজেও এতে খুশী হন নি, তাই বললেন: মিশমিরাই নেফার সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। মেয়েদের রূপ আর রঙ দেখে আপনি তাকিয়ে থাকবেন। যেমন নানা রঙের নকৃশা করা পোশাক, তেমনি অভিনব অলঙ্কার। এ সব তারা তিব্বত থেকে আমদানী করে। আসামের অন্যান্য উপজাতিদের মতো মিশমি মেয়েরাও হাতের কাজে ও তাঁতে কাপড় বোনায় খুবই পটু। পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে তারা ক্ষেতের কাজ করে।

কমলাকান্তবাবু একটু থেমে বলেছিলেন: একটা জিনিস দেখে আপনার আশ্চর্য লাগবে। পাইপে তামাক খেতে এরা ওস্তাদ। শুধু পুরুষে নয়, মেয়েরাও সারাক্ষণ তামাক খায়। তাদের ঠোঁট থেকে পাইপ নামাতে বড় একটা দেখা যায় না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন: বিশ্বাস হল না তো, যাবেন একবার ও অঞ্চলে। তীর্থ করাও হবে, আর নতুন অভিজ্ঞতাও হবে।

বলে আমার দিকে তাকালেন সকৌতুকে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: তারপর?

কমলাকান্তবাবু বললেন: ও অঞ্চলে গেলে লিডো ও মার্গারিটার হাটেও যাবেন। তাংসা মেয়েদের দেখবেন সেখানে। লোহিত বিভাগের দক্ষিণে তিরাপ বিভাগ, পূর্বে পাতকোই পাহাড় আর ব্রহ্মদেশ। পুরুষদের পরনে লুঙ্গি দেখে তাদের বর্মী বলেই মনে হবে। তাংসারা এখন শান্তশিষ্ট কৃষিজীবী, কিন্তু কিছুদিন আগেই তারা দুর্দান্ত নরমুণ্ড শিকারী যোদ্ধা ছিল। অতর্কিতে কোন গ্রাম

আক্রমণ করে গ্রামবাসীদের মুণ্ডু কেটে আনত, কখনও বা সম্মুখ সমরে আহ্বান করত শত্রুদের।

এই জন্যেই দেখা যায় যে তাংসাদের গ্রামে ঢোকবার মুখেই অবিবাহিত ছেলেদের রাত্রিবাসের জন্য একটি বিরাট মোরাং বা লুপপং। ছেলেরা সেখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থাকে, এবং কোন বিপদের আশঙ্কা দেখলেই মাদল বাজিয়ে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দেয়।

সেদিন আমরা সময়ের হিসাব রাখি নি। হোটেলের বোর্ডাররা একে একে খেতে আসছিলেন। বেয়ারা আমাদের কাছেও এসে উপস্থিত হয়েছিল। কমলাকান্তবাবু একটু বিরক্ত হয়েই তাঁর আধখানা সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন: আনো।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে আসবার জন্যে উঠে গিয়েছিলেন।

সময়ের অভাবে ডিব্রুগড় থেকেই আমরা ফিরে এলুম শিবসাগরে। নেফার কোন মানুষকে দেখবার সুযোগ পেলুম না।

শিবসাগরে আমরা সোজা ডাকবাংলোয় এসে উঠলুম। গাড়ি থেকে নেমেই শর্মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ছুটোছুটি করে আমার জন্যে একখানা ঘরের ব্যবস্থা করে বললেন: আপনি এবারে শুয়ে পড়ুন, চা এলে আমি আপনাকে ডেকে দেব।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: এমন অসময়ে আপনি আমাকে শুতে বলছেন কেন?

ভদ্রলোকও আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি হেসে বললুম: চা খেয়ে আপনাকে পোঁছে দিয়ে আসি, তারপরে অন্য কথা।

ডাকবাংলোয় এবারে আর এক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পেলুম। তিনি একখানা বই পড়ছিলেন, একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার পড়ায় মন দিলেন।

শর্মা ইতস্তত করে বললেন: গাড়িতে আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, আপনি বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। ক্লান্ত হবারই কথা, গত তিন দিন তো আর বিশ্রাম হয় নি।

গাড়িতে আমি যে একটিও কথা বলি নি, সে কথা আমার মনে পড়ে গেল। সে যে আমার ক্লান্তির জন্যে নয়, শর্মা সে কথা জানেন না। আমিও তাঁকে সে কথা জানালুম না। হেসে বললুম: আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত কিসে হল, তাও তো জানি নে। দিব্বি খাচ্ছি ঘুমচ্ছি, কাজের পরে নতুন জায়গাও দেখছি, এর পরে ক্লান্তির কথা বললে শরীর ও মন দুয়েরই বদনাম করা হয়।

একটু পরেই চা এল। চা ঢেলে আমি শর্মাকে দিলুম, যে ভদ্রলোক বই পড়ছিলেন তাঁকেও দিলুম এক পেয়ালা। ভদ্রলোক

প্রথমটায় বিব্রত বোধ করেছিলেন, তারপরে ইংরেজীতে বললেন : একটু আগেই আমি চা খেয়েছি।

আমি বললুম : চা নির্দোষ জিনিস, নেশা হলে জোর করতুম না।

ভদ্রলোক বললেন : অন্য নেশা করেন না বলেই চাকে নির্দোষ জিনিস বলছেন, চাকে বিষ পানের সামিল মনে করেন এমন লোকও দেশে আছে।

আমি হেসে বললুম : বুঝেছি, আজকের সন্ধ্যাটা আমাদের ভাল কাটবে।

চা শেষ করে শর্মা উঠে দাঁড়াতেই আমি বললুম : চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কিন্তু শর্মা আমাকে কিছুতেই সঙ্গে নিলেন না, বললেন : তাহলে আমি এখানেই থাকব।

অগত্যা আমি বসে রইলুম, আর শর্মা গেলেন তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি। কাল সকালে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন বলে গেলেন।

ভদ্রলোক এইবারে তাঁর বই মুড়ে রেখে আমার দিকে মনোযোগ দিলেন। বললেন : আপনি তো গাড়িতে এলেন দেখলাম।

বললুম : ঠিকই দেখেছেন। কাল সকালে আমরা গৌহাটি ফিরব।

ভদ্রলোক বললেন : আমি যাব ওপারে তেজপুরে।

তারপরে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। নাম প্রকাশ দত্ত, একটা বিদেশী ফার্মে ভাল চাকরি করেন, পৈতৃক বাড়ি তেজপুরে, সেখানে তাঁদের ব্যবসা আছে। কয়েক দিনের ছুটিতে বাড়ি এসে বিপদে পড়েছিলেন। ঠেলেঠুলে তাঁর কাকা তাঁকে কোহিমায় পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ব্যবসার কাজে, এই সুযোগে তিনি মনিপুরের রাজধানী ইম্ফলও একদিনের জন্যে ঘুরে এসেছেন।

এই সংবাদে আমার মন পুলকে দুলে উঠল। বললুম : আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার যে কী উপকার হল আপনি তা জানেন না।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন : আপনার উপকার কী হল ?

আমি বললুম : মনিপুর দেখবার বাসনা আমার অনেক দিনের, সে বাসনা কোন দিন পূর্ণ হবে কিনা জানি না। আপনার কাছে নিশ্চয়ই কিছু শুনতে পাব। সেইটুকুই আমার লাভ।

প্রকাশবাবু হেসে বললেন : তাহলে দেখছি আপনার জন্যেই আমাকে এই উলটো পথে আসতে হয়েছে।

এ অঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে এখনও আমার ধারণা স্পষ্ট হয় নি। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম : কী রকম ?

পরিচয় হবার পর থেকেই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে বাঙলায়। প্রকাশবাবু হেসে বললেন : আপনার অভিজ্ঞতাও দেখছি আমারই মতো। সকালবেলায় চা খেয়ে কোহিমা থেকে বেরিয়েছিলাম। একজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছিল, তিনিই মনিপুর রোড স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। তারপরে দেখলুম যে তাতে কোন লাভ হল না। বেলা সাড়ে এগারোটায় যে প্যাসেঞ্জারখানা ছাড়ছিল, তাতে নওগাঁ পৌঁছনো যাবে রাতে, কিন্তু শিলঘাটে না পৌঁছতে পারলে নদী পেরনো যাবে না। মিলিটারী বন্ধু বললেন, তবে নওগাঁয় রাত কাটাবেন কেন, আমার সঙ্গে শিবসাগরেই চলুন, শহরে অনেক কিছু দেখবার আছে।

আমি বললুম : এ তো উলটো দিকই হল।

প্রকাশবাবু বললেন : তবেই বুঝুন ব্যাপারটা। তিনি তো আমায় শহরে নামিয়ে দিয়ে নিজের অড্ডায় চলে গেলেন, এখন আমি চোখে অন্ধকার দেখছি।

কেন ?

সঙ্গে নিজের গাড়ি না থাকলে আপনিও চোখে আমার মতোই অন্ধকার দেখতেন। রাত দশটার পরে ট্রেন আছে, সেই ট্রেন ধরে গেলে রাত তিনটের পর মেন লাইনের জংসন থেকে ট্রেন পাব। সকালের অপেক্ষায় থাকলে সারা দিন জংসনেই বসে থাকতে হবে।

আমি চিন্তিতভাবে বললুম : আপনি কি আজ রাতেই চলে যাবেন ?

তাহলে এমন নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেখতেন না। আমাদের খানসামার বুদ্ধিতেই নিশ্চিন্ত হয়েছি। বুদ্ধি ওরাই রাখে, ওদের সঙ্গে পরামর্শ করি না বলেই আমাদের এই দুরবস্থা।

বলে নিজের পরিকল্পনাটি আমাকে জানালেন। শিবসাগর থেকে যোরহাটের বাস পাওয়া যায়। যোরহাটে পৌঁছলেই পাওয়া যাবে উড়োজাহাজ, আধ ঘণ্টায় তেজপুর। ট্রেন চাই না, নৌকো স্টীমার জাহাজও চাই নে। কোন রকমে যোরহাটে পৌঁছতে চাই।

এ কথা শুনে আমি বললুম : তাহলে আমাকে আপনি একটু পরোপকারের সুযোগ দিন। আমি তো সকালেই বেরব, আপত্তি না থাকলে আমি আপনাকে যোরহাটে পৌঁছে দিতে পারি।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : তাহলে তো উড়োজাহাজ সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ভদ্রলোক সত্যিই নিশ্চিন্ত হলেন। খুব সহজ হয়ে বসে বললেন : এবারে আপনার কী উপকার করতে পারি বলুন।

বললুম : যা দেখে এসেছেন, সেই সম্বন্ধেই কিছু বলুন।

যা দেখেছি তার চেয়ে বেশী দেখি নি। কাজেই আমার কাছে শুনলে আপনার অনেক কিছুই জানা হবে না।

কিছু জানা হবে তো, আমার কাছে তাই যথেষ্ট।

ভদ্রলোক আর আপত্তি করলেন না। প্রথমেই বললেন ডিমাপুরের কথা। ডিমাপুর নাম রেলওয়ের টাইম টেবল থেকে উঠে গিয়েছিল। স্টেশনের নাম এখন মনিপুর রোড হয়েছে। তবে লোকের অসুবিধার জন্যে স্টেশনকে নাকি ডিমাপুর মনিপুর রোড বলা হবে। উত্তর থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে গোলাঘাটের উপর দিয়ে ডিমাপুরে এসেছে, তারপরে কোহিমার উপর দিয়ে ইম্ফল। ইম্ফলেও এই সড়ক শেষ হয় নি, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

কোহিমা নাগাল্যাণ্ডের প্রধান শহর, আর মনিপুর রাজ্য শুরু হয়েছে কোহিমার মাইল কয়েক দক্ষিণেই।

প্রকাশবাবু বললেন: আমি এ পথে যাই নি, আমি গিয়েছিলুম ট্রেনে। তেজপুর থেকে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে এসেছিলুম শিলঘাট, সেখান থেকে ট্রেনে চেপে চাপারমুখ স্টেশনে গাড়ি বদল করে লামডিং জংসনের উপর দিয়ে মনিপুর রোড স্টেশনে এসেছিলুম। ফেরার পথে দেখলুম গরমপানি আর গোলাঘাট। ডিমাপুর থেকে গোলাঘাট পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে এসেছে। এই বনের নাম শুনলুম নামবড়। অন্ধকারে যাতায়াত খুবই বিপজ্জনক, সবরকমের বন্যজন্তু আছে, অনেক সময় বুনো হাতীও এসে পথের উপরে দাঁড়ায়। পথের ধারে গরমপানি নামে একটি উচ্চ প্রস্রবণ আমরা দেখেছিলুম। গোলাঘাটের পরেই গরমপানির নাম।

মানচিত্রে গরমপানি নাম আমি আর একটি দেখেছি। শিলঙের নিকটে জোয়াই থেকে একটি সরু রাস্তা গরমপানি গেছে, আর গরম-পানি থেকে একটি ভাল রাস্তা গেছে হাফলঙে। প্রকাশবাবুকে এ কথা বলতেই তিনি বললেন: গরমপানি নাম আমি আরও একটি দেখেছি। সেবারে নৈনিতাল থেকে রাণীক্ষেত যাচ্ছিলুম, কোশি নদী পেরবার আগে বাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গার নাম গরমপানি। আমরা সবাই সেখানে চা খেয়েছিলুম। তবে সেখানে কোন উষ্ণ প্রস্রবণ নেই।

সিমলার কাছে একটি উষ্ণ প্রস্রবণের কথা আমার মনে পড়ল। তার নাম তপ্তপানি, লোকে টাটাপানি বলে। কিন্তু এ কথা আমি বললুম না, তার বদলে প্রশ্ন করলুম: ডিমাপুরে কী দেখলেন?

প্রকাশবাবু বললেন: তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কোন এক সময় নাকি কাছাড়ী রাজাদের রাজধানী ছিল, তারই কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে। একটা ঘেরা জায়গায় কয়েকটি ভাঙা মন্দির আর দু সারি বালি পাথরের থাম আছে, তার ওপরে কিছু কারুকার্য। অনেকগুলি পুকুরের মধ্যে দুটি পুকুর বেশ বড়।

কোথায় যেন আমি পড়েছিলুম যে এই ডিমাপুরের নাম ছিল হেড়ম্ব-বিষয়। কাছাড়ীদের মধ্যে নাকি প্রবাদ আছে যে হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগিনী হিড়িম্বা ছিলেন কাছাড় রাজবংশের জননী। ভীম-হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ ছিলেন এই বংশের প্রথম রাজা। অনুসন্ধান করে আমি জেনেছিলুম যে ব্রহ্মখণ্ড নামে একখানি ভবিষ্যপুরাণে এই হেড়ম্ব দেশের উল্লেখ আছে, এবং দেশাবলী নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে আছে এই দেশের ও রাজবংশের অনেক কথা। পুরাকালে হেড়ম্ব রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত ছিল। উত্তরে কামরূপ ও ধর্মপুর, দক্ষিণে মন্থরা, পূর্বে মনিপুর ও পশ্চিমে শিয়ালকোট পর্যন্ত ছিল হেড়ম্ব রাজের অধিকার। এই শিয়ালকোট পাঞ্জাবের শিয়ালকোট নয়, কাশপুর থেকে আট যোজন দূরে একটি জনপদের নাম ছিল শিয়ালকোট। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটোৎকচ কর্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন। অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্যই কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে এগিয়ে দিয়েছিলেন কর্ণের সামনে।

দেশাবলীতে আমরা ঘটোৎকচের বংশেরও কিছু পরিচয় পাই। ঘটোৎকচের মৃত্যুর পরে তার পুত্র বর্বরীক রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের চক্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বর্বরীকের পরে তাঁর পুত্র মেঘবর্ণ হেড়ম্বদেশের রাজা হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রাজা রামচন্দ্র এই বংশেরই রাজা, তাঁর পিতা দর্পনারায়ণ মেঘবর্ণের অনেক পুরুষ পরে রাজত্ব করেছেন।

কাছাড় মনিপুর ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে বন্ধুতা ও বিবাদের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কাছাড়ের জন্য ইংরেজকেও এই বিবাদে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। কাছাড়ের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা বলেন যে একদা নাগা অধ্যুষিত অরণ্যময় প্রদেশ ছিল কাছাড় রাজ্য, আর ডিমাপুরে ছিল তাদের রাজধানী। নামবার অরণ্যে যে ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় তা এই রাজাদেরই প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কালক্রমে তাঁরা এই

অঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণে মাইবংএ গিয়ে রাজধানী স্থাপন করেন। অনেকে মনে করেন যে আহোমদের আক্রমণেই তাঁরা দক্ষিণাভিমুখী হয়েছিলেন। লামডিং জংসন থেকে বদরপুর যাবার সময় মাইবং স্টেশনে এখনও অনেকে কাছাড় রাজাদের পুরাকীর্তি দেখেন। এই রাজারা মাইবংএ এসে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন, তারপরে ত্রিপুরার রাজকন্যার পানিগ্রহণ করে এঁরা জাতে উঠেছিলেন।

প্রকাশবাবু যে এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, আমি তা খেয়াল করি নি। এবারে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখলুম যে তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। আমি লজ্জিত ভাবে বললুম : তারপর ?

ভদ্রলোক কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি ?

লজ্জা পেয়ে আমি বললুম : একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম।

কেন ?

কতগুলো পৌরাণিক কথা মনে পড়ে গেছে।

প্রকাশবাবু বললেন : বেশ তো বলুন না।

বললুম : এই ডিমাপুরে নাকি হেড়ম্ব রাজ্য ছিল, হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ ছিলেন এ রাজ্যের প্রথম রাজা। কিছু দিন আগে শুনেছিলুম যে কুলু উপত্যকায় ছিল হিড়িম্বার বাস। হিড়িম্বার এক মন্দিরও আছে সেখানে। হিড়িম্বা কি তাহলে ঘটোৎকচের জন্মের পরে এই অঞ্চলে চলে এসেছিলেন ?

প্রকাশবাবু ভয় পাবার ভান করে বললেন : কঠিন প্রশ্ন, আমার কাছে এর উত্তর চাইবেন না।

আমি হেসে বললুম : তাহলে তার পরের কথা বলুন।

তার পরে কোহিমা। নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী এই ছোট পাহাড়ী শহরটি ডিমাপুর থেকে ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণে। মোটরে দু ঘণ্টা সময় লাগে আর বাসে প্রায় ঘণ্টা চারেক। সমতল ভূমি থেকে পথ ক্রমে উপরে উঠে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে পৌঁছেছে। ডাইনে

ঘন অরণ্য। আর বামে গভীর খাদ। স্থানে স্থানে পথ খুবই বিপজ্জনক, মাঝে মাঝেই পাহাড় থেকে ধস নামে। একটি পাহাড়ের নাম শুনেছি পাগলা পাহাড়, সেই পাহাড়ের উপর থেকে যে কখন একটা বড় পাথর গড়িয়ে রাস্তার উপরে পড়বে তা কেউ জানে না। পথের ধারে মাঝে মাঝে ক্ষেত খামার দেখতে পাবেন, পথের ধারের বন জঙ্গল পরিষ্কার করে নাগারা এই সব চাষবাস করেছে। দূরে পাহাড়ের গায়েও তাদের ধানের ক্ষেত দেখা যায়। স্তরে স্তরে সেই ক্ষেত নিচে নেমে এসেছে, পাহাড়ী ঝর্ণাকে বেঁধে সেই ক্ষেতে তারা জলসেচ করে। আর একটি জিনিস দেখেছি, ক্ষেতের মাঝে মাঝে সরু বাঁশের ডগায় সাদা কালো কাপড়ের টুকরো বাঁধা আছে।

আমি বললুম ঃ নাগারা শুনেছি পথের উপরেও হামলা করতে আসে!

প্রকাশবাবু বললেন ঃ আমিও সেই কথা শুনেছি, আর সেই জন্যেই সমস্ত গাড়ি ক্যারাভানের মতো এক সঙ্গে চলে।

আপনি নাগাদের দেখেছেন ?

দেখেছি কোহিমার বাজারে। শাক সব্জী মুরগি বিক্রি করতে আসে। খুব লম্বা চওড়া চেহারা, শক্ত সমর্থ সুগঠিত দেহ, রঙ ফর্সা। নাগাদের নাকি অনেক জাত আছে, এরা শুনলুম অঙ্গামী নাগা। পুরুষদের গলায় শাঁখের মালা, বাহুতে হাতীর দাঁতের অদ্ভুত গয়না। আস্ত একটি গোটা শাঁখও দেখেছি এক সর্দারের গলায়।

আমি বললুম ঃ নাগারা নাঙ্গা নয়তো!

প্রকাশবাবু হেসে বললেন ঃ না। বুনো নাগাদের কথা জানি নে, তবে শহুরে নাগারা কাপড় পরে। পুরুষরা কোমরে জড়ায় একখণ্ড কালো কাপড়, আর গায়ে দেয় ফতুয়ার মতো একটা কালো জামা। বুড়োদের কোমরে কালো কাপড়ের উপরে কড়ির একটা মালাও দেখেছি। কিন্তু সবার কোমরে এই মালা নেই, মালায় কড়ির সংখ্যাও এক একজনের এক এক রকম।

কেন ?

এই প্রশ্ন আমার মনেও এসেছিল। তাই একজন পরিচিত লোককে জিজ্ঞেস করেছিলুম। তিনি যা বললেন তা শুনে আমার চক্ষুস্থির। শত্রুর মাথা কাটতে না পারলে কোমরে কড়ি ঝোলাবার অধিকার ওরা পায় না। একটি মুণ্ডু কেটে আনলে তবে একটি কড়ি ঝোলাতে পারবে, যার কোমরে যতগুলি কড়ি সে ততগুলি মানুষের মুণ্ডু কেটেছে।

এ যে সর্বনেশে কথা! এখনও ওরা মানুষের মাথা কাটছে নাকি!

প্রকাশবাবু হেসে বললেন: মাথা কাটা এখন বোধহয় সোজা কাজ নয়, তাই এ যুগের ছেলেরা নাকি মাথা না কেটেই কড়ির মালা পরছে। বুড়োরা এজন্যে দুঃখ করে, বাঘের বংশ একেবারে বেড়াল হয়ে গেল।

তারপরে প্রকাশবাবু নাগা মেয়ের কথা বললেন: হাসিখুশী নাগা মেয়েদের আমি স্কুলে যেতে দেখেছি। একগাদা বই নিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের মতোই স্কুলে যাচ্ছে। কোমরে জড়ানো কাপড় তাদের হাঁটুর নিচে অবধি নেমেছে, গায়ে জড়িয়েছে একখানা চাদর। এসব রঙ-বেরঙের পোশাক বোধহয় তাদের নিজেদেরই হাতে বোনা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কোহিমায় কী দেখলেন ?

ঘরবাড়ি হাটবাজার সবই দেখেছি, আর দেখেছি একটি সমাধি ক্ষেত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা কোহিমা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত তখনও স্বাধীন হয় নি। ভারতীয়রা ইংরেজের পক্ষেই যুদ্ধ করেছিল। এত বড় যুদ্ধ এ মুলুকে আর নাকি হয় নি।

প্রকাশবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: কোহিমায় গেলে আপনিও এ কথা বিশ্বাস করবেন।

কোন প্রমাণ আছে বুঝি ?

বাড়ির গায়ে ও রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে এখনও গুলির দাগ দেখতে

পাবেন। কত লোক নিহত হয়েছে ওয়ার সিমেট্রিতে গেলে তাও অনুমান করতে পারবেন। একটা কবরের উপরে সুন্দর একটি কথা লেখা আছে।

বলে ভদ্রলোক উঠে গিয়ে একটা নোটবুক বার করে আনলেন। তারপরে পড়ে শোনালেন:

When you go home, tell them of us, and say
For their tomorrow we gave our today.

বাড়ি ফিরে আমাদের কথা তাদের বলো, তাদের আগামীকালের জন্য আমরা আমাদের বর্তমানকে দান করছি।

কথাটি যে সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বেশি কথা আজ আর হল না। খানসামা এসে ডিনারের খবর দিল। প্রকাশবাবু বোধহয় ক্ষুধার্ত ছিলেন, বললেন: মনিপুরের কথা কাল বলব।

আমি বললুম: সেই ভাল।

কোহিমার কথায় আরও অনেক কথা আমার মনে পড়ছে।

খেয়েদেয়ে আমি শুয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু চট করে আমার ঘুম এল না। কোহিমার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম। নেতাজীকে সাহায্য করবার জন্যে নাগারাও এগিয়ে এসেছিল।

এই নাগাদের কথা আমি শিলঙে কমলাকান্তবাবুর কাছে শুনেছিলুম। অনেকে মনে করেন যে হিন্দুস্থানী নাঙ্গা শব্দ থেকেই নাগা শব্দের উৎপত্তি, নাগা মানে নগ্ন। এই উপজাতিকে বিবস্ত্র দেখেই যেন এদের নাগা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা মেনে নেওয়া যায় না। নাঙ্গা স্থানীয় শব্দ হলে, কিংবা প্রতিবেশী মানুষদের কথা হলে, এ ধারণা মেনে নিতে আপত্তি হত না। এর চেয়ে পৌরাণিক অনুমান মেনে নেওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত। বিধবা উলূপী বনবাসী অর্জুনকে এই দেশে টেনে এনেছিলেন। অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, সুভগে, তুমি কে? এ কোন্ দেশে আমাকে টেনে আনলে?

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে উলূপী বলেছিলেন,

ঐরাবত কুলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ।
তস্যাস্মিদুহিতা রাজন্নুলূপী নাম পন্নগী।

ঐরাবত বংশজাত নাগরাজ কৌরব্য আমার পিতা, আমি তাঁর কন্যা

ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদী আছে, আর নাগা অঞ্চলে ঐরাবতী নদী নামেও নাকি একটি নদী আছে। পুরাকালে হয়তো এই অঞ্চলবাসীরাই ঐরাবত বংশোদ্ভব বলে নিজেদের পরিচয় দিত।

এই অনুমানের আরও সমর্থন আছে। অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেছিলেন, তারপরে গিয়েছিলেন মনিপুরে। সেখানে তিনি মনিপুর

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। নাগরাজ্য ও মনিপুর যে পাশাপাশি দুটি রাজ্য ছিল, এই কথাই আমাদের প্রথমে মনে হয়। পরবর্তীকালে অশ্বমেধের ঘোড়ার পিছনে অর্জুন এসেছিলেন মনিপুরে, তখন তাঁর পুত্র বভ্রূবাহনের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন, আর এই সংবাদ পেয়ে উলূপী এসে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। কাছাকাছি না থাকলে কি উলূপী এই সংবাদ পেতেন, না ছুটে আসতেই পারতেন! দ্রৌপদী তো আসেন নি, আসেন নি আর কোন পাণ্ডব।

পুরাণে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এই সব কারণেই তাঁরা স্বীকার করেন যে নাগ শব্দই কালক্রমে নাগা হয়েছে, মহাভারতের নাগরাজ্য স্বাধীন ভারতে হয়েছে নাগাল্যাণ্ড।

কমলাকান্তবাবু বলেছিলেন যে নাগাদের মধ্যেই নাকি সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি। সম্প্রদায়ের আবার সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর গোষ্ঠী। তিনি কাছে থেকে দেখেছেন অঙ্গামী নাগাদের, তারা সভ্য বেশি, লেখাপড়া শিখে শহুরে মানুষের সঙ্গে সমান হবার চেষ্টা করছে। অন্য নাগাদের তিনি দূর থেকে দেখেছেন, মাও নাগা কাবুই নাগা টাংখুল নাগা। অনেক নাগা আবার দেখেন নি। কিংবা দেখেও চিনতে পারেন নি। যেমন কুইরেং চিরু মারিং কলিয়া খইরাও মারাং ইত্যাদি। মনিপুরের নাগাদের সম্বন্ধে বই আছে, বই আছে সেমা নাগাদের সম্বন্ধেও। সাহেবরা এই সব বই লিখে গেছেন।

অঙ্গামী নাগাদের সঙ্গে কমলাকান্তবাবু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদও তিনি সংগ্রহ করেছেন। অঙ্গামী নাগাদের উৎপত্তি বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একবার একটি ভেলা নদীর জলে ভেসে এসে পাহাড়ের গায়ে ঠেকল। ভেলার উপরে একটি সুন্দরী মেয়ে আর একটা সাদা কুকুর। যে নাগাদের রঙ ফর্সা তারা তাদেরই সন্তান।

কিন্তু কাছাড়ীরা বলে, না, নাগারা জৈন্তপুরের রাজবংশ।

রাজার ভাই পালিয়েছিলেন রাজকন্যাকে নিয়ে, ডিমাপুরে কাছাড়ের রাজার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু মনে তাঁদের শান্তি ছিল না। পাপে অনুতাপ আছে, তাতে মন জ্বলে। সুখ হয় অন্তর্হিত। সংবাদ পেয়ে জৈন্তরাজের সৈন্য যখন ডিমাপুরে এল, এঁরা পালিয়ে গিয়ে গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। কাছাড়ীরা বলে, নাগারা তাদেরই সন্তান।

একটি ভাল গল্পও কমলাকান্তবাবু আমাকে শুনিয়েছিলেন। নাগা সমাজে হিংসা কী করে এল, সেই গল্প। আজকের মতো হিংসা-দ্বেষে পূর্ণ ছিল না পৃথিবী। এ জগৎ এক সময় বড় সুখের জায়গা ছিল। তখন শুধু চারজন ছিল পৃথিবীর অধিকারী—দেবতা এক দম্পতি আর একটি বাঘ। ক্রমে সেই দম্পতির দুটি ছেলে হল, তারাও সুখে ও শান্তিতে বাস করতে লাগল। অনেক দিন পরে বুড়ো বয়সে যখন তাদের মা মারা গেল, তখন তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে সেই বাঘ মহা আনন্দে তাদের মায়ের বুকের রক্ত পান করছে। তাদের এত দিনের সুখের সংসার এক দিনেই গেল ভেঙে। দুই ভাইয়েও বিবাদ হল। তারপর দুজনে গেল দুদিকে চলে। বড় ভাইয়ের সন্তানেরা ফর্সা হল, আর ছোট ভাইয়ের ছেলেরা হল কালো।

নাগারা সাহসী সচ্চরিত্র এবং সত্যবাদী। যুদ্ধে যেমন পটু, বিবাদেও তেমনি, তখন তাদের মতো হিংস্র ও নিষ্ঠুর এদেশে দুর্লভ। প্রতিহিংসাপরায়ণ তারা, তাই আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তারা বাধ্য হয়। তাদের প্রত্যেকের বাসস্থান এক একটি দুর্গের মতো। পাহাড়ের গায়ে এমন ভাবে তারা গৃহ নির্মাণ করে যে দুটি পরিবারের স্থান সেখানে নেই, গৃহে যাবার পথ এমন সংকীর্ণ যে এক সঙ্গে একজনই অগ্রসর হতে পারবে। প্রথমে একটি পরিখা, ডালপালা পাতা ও হালকা ভাবে মাটি দিয়ে ঢাকা। অতর্কিতে শত্রু এলে তার ভিতর পড়বেই, আর পড়লেই বিপদ। বাঁশ ও বেতের গজাল সেই গর্তে পোঁতা আছে, তাতেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে শায়েস্তা

হবে। পরিখার পরেই বাঁশের বা পাথরের প্রাচীর, তার একটি ছোট দরজা। তারপরেই মস্ত একটি ঘর, তার মধ্যে কুঠুরি আছে কয়েকটি। সামনের অংশে শস্য রাখবার ব্যবস্থা, পিছনে মদ চোলাইএর আয়োজন, আর মাঝখানে তাদের বাসস্থান।

এ তো একটি পরিবারের কথা। এক একটি গ্রামেও একটি মাত্র প্রবেশের পথ। আর সেই পথের মুখেই একটি মোরাঙ। গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত ছেলেরা থাকে এই মোরাঙে, সঙ্গে সব রকমের অস্ত্রশস্ত্র, আর একজন বয়োবৃদ্ধ অভিভাবক। ছেলেদের তিনি নানা রকমের বীরত্বের গল্প শোনান, নিজেদের যৌবনকালে শত্রুপক্ষের কটা মাথা কেমন করে কেটে এনেছিলেন সেই সব দুঃসাহসের কাহিনী। লড়াই করে শত্রুর মাথা কেটে নিজের গ্রামে আনতে পারলেই গলায় ভালুকের দাঁতের হার ও কোমরে কড়ির মালা পরার অধিকার জন্মায়। যে যুবকের দেহে এই অলঙ্কার নেই, গ্রামের মেয়েরা তাকে দেখে হাসে, সকলের কৃপার পাত্র সে। বিয়ে করারও তার যেন অধিকার নেই, কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। এই সব দেখে আর পুরনো গল্প শুনে নাগা ছেলেরা মেতে উঠত। কোন একটা ছল ছুতো করে যুদ্ধ করতেই হবে। শত্রুর মাথা তার চাই। এ বীরত্ব যে কত অর্থহীন, এখন তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে।

মিসেস গ্রিমউড মনিপুরের নাগাদের সম্বন্ধে একটি মজার গল্প লিখেছিলেন তাঁর গ্রন্থে। এই ইংরেজ মহিলার স্বামী মিস্টার গ্রিমউড গত শতাব্দীর শেষদিকে মনিপুরের পলিটিকাল এজেন্ট ছিলেন। তিনি তাঁর উদ্যান পরিচর্যার জন্য কয়েকজন নাগাকে মালির কাজে বহাল করেছিলেন। সারা দিন তারা নগ্ন দেহেই বাগানের কাজ করত। গ্রিমউড দম্পতি এই দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিসেস গ্রিমউডের নিকট তাঁর এক অবিবাহিতা বান্ধবী এই কথা শুনে আঁতকে উঠেছিলেন এবং মালিদের ব্যবহারের জন্য কয়েক জোড়া স্নানের পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নাগারা তো নতুন

পোশাক পেয়ে ভারি খুশী। পরদিন তারা সেই পোশাক পরে কাজে এল। মিসেস গ্রিমউড আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে একজন সেই পোশাকে একটা মস্ত ফুটো করে মাথা গলিয়ে গায়ে পরেছে। আর একজন মাথায় বেঁধেছে পাগড়ির মতো করে। দেহ আগের মতোই দিগম্বর।

কমলাকান্তবাবু আমাকে বলেছিলেন: ভাববেন না যে সব নাগারাই কাপড় পরতে শিখেছে। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে যারা শহরের বাজারে আসে কেনাবেচা করতে, তারা কোমরে একটুকরো কাপড় জড়াতে ঠিকই শিখেছে, কিন্তু জামা পরতে অনেকেই শেখে নি। পাথর আর পুঁতির মালা দিয়ে মেয়েদের বুক আর কতটুকুই বা ঢাকে।

তারপরে তিনি আমাকে গভীর অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশের নাগাদের কথাও বলেছিলেন। সেখানে নিশ্চয়ই এখনও সভ্যতার আলো পৌঁছয় নি, দিনের আলোই যে সর্বত্র পৌঁছয় না। বিবস্ত্র নরনারী এখনও সেখানে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়।

কমলাকান্তবাবু বলেছিলেন: আমি তাদের জীবনযাত্রার কথা কিছু কিছু শুনেছি। অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশায় কোন বিধিনিষেধ নেই, অবাধে তারা মিলিত হতে পারে। তাদের পরিণয় হয় প্রেমের পরে, কিন্তু বিবাহ হয় সামাজিক নিয়মে। ঘটকীরাই বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করে। আর একবার বিবাহ হয়ে গেলে তাদের দাম্পত্য জীবন বড় বিশ্বস্ত, সংসারকে সর্বতোভাবে সুখের করবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর যত্নের আর সীমা থাকে না।

নাগা মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই যে বেশি অলঙ্কারপ্রিয়, এ কথাও আমাকে তিনি বলেছিলেন। পুরুষদের যুদ্ধ ও নৃত্যের সজ্জা একই রকম। তখন তারা গায়ে চাদর জড়ায় না, বুকের উপরে বাঁধে একখানি রঙীন কাপড়। মাথায় পাখির পালক ও কানে প্রজাপতির

পাখা। হাতে বর্শা নিয়ে তারা যুদ্ধ করে, নাচের সময়েও এই বর্শাটি তাদের চাই। কুমারী মেয়েরাও এই নাচে যোগ দিতে পারে। হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে তারাও বৃত্তাকারে দাঁড়ায়, বাজনার তালে তালে সেই লাঠি মাটিতে ঠুকে তারাও তাল দেয়। এই এক রকম নয়, আরও অনেক রকমের নাচ তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

নাগাদের কথা ভাবতে গিয়ে আমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন আমি স্কুলে পড়ি। জাপানীরা যুদ্ধ করতে করতে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে আছে নেতাজীর ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, আমরা সংক্ষেপে বলতুম আই-এন-এ। নাগারা ইংরেজকে সাহায্য করবে না, সাহায্য করবে না জাপানীদেরও। কিন্তু আই-এন-এ নেতাজীর দল শুনে বলল, আমরা তোমাদের দলে আছি। আই-এন-এ-র সেনাদের তারা সর্ব রকমে সাহায্য করেছে, পথ দেখিয়েছে, খেতে দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্যে।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নেতা সুভাষচন্দ্র দেশের বাহিরে গিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আদর্শেই গঠিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় ফৌজ নিয়ে প্রবল শক্তি ইংরেজকে উচ্ছেদ করা যাবে না ভেবেই তিনি জাপানীদের সঙ্গে একযোগে ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

১৯৪৪এর বসন্তকালে অভিযান শুরু হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজে তখন হাজার বারো সৈন্য, তাই দিয়ে চারটি ব্রিগেড গঠিত হয়েছে, কর্ণেল শাহনওয়াজের অধীনে সুভাষ ব্রিগেড, কর্ণেল ইয়ানৎ কিয়ানির অধীনে গান্ধী ব্রিগেড, কর্ণেল মোহন সিংএর অধীনে আজাদ ব্রিগেড আর নেহেরু ব্রিগেড কর্ণেল ধীলনের অধীনে। এরা চারিদিক থেকে মনিপুরের রাজধানী ইম্ফল আক্রমণের জন্য তৈরি হলেন। ইম্ফলের গুরুত্ব তখন খুবই বেশি। রাজনীতিজ্ঞরা

বলেছিলেন যে ইম্ফল যার হাতে থাকবে তারই হাতে অস্ত্র থাকবে ভারত বা ব্রহ্মদেশ আক্রমণের।

আমেরিকান নিগ্রোদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল ব্রহ্মদেশে, মনিপুরের সীমান্ত থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। নিগ্রোরা কালাপাণি নদীর উপরে একটা সেতু তৈরি করছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর রাতুরি তাঁর সেনাদল নিয়ে নিগ্রোদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বিধ্বস্ত করে দিলেন তাদের। নৌকোয় পালাবার চেষ্টা করেও তাঁরা ব্যর্থ হন, অনেকে মারা পড়ল, আর অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ সবই এল আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে।

দ্বিতীয় যুদ্ধ হল পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে, তারপর একেবারে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে। মাতৃভূমি উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা যাদের বুকের রক্তে, কোন যুদ্ধেই তারা পরাজিত হল না, সীমান্তের বৃটিশ সৈন্যকে পরাজিত করে বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে তারা ভারতের মাটিতে পদার্পণ করল।

ইম্ফলের দিকে পথ গেছে টিডিডম থেকে টামু থেকে আর উখরুল থেকে। উখরুলের উত্তরে কোহিমা আর দক্ষিণে ইম্ফল। ভারতবর্ষ থেকে দুটো পথ এসেছে ইম্ফলে। প্রধান পথ ডিমাপুর থেকে কোহিমার উপর দিয়ে আর দ্বিতীয় পথ শিলচর থেকে বিষেণপুর হয়ে ইম্ফলে পৌঁছেছে। সমস্ত দিক থেকে একযোগে ইম্ফল আক্রমণের জন্য গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হল।

২৮শে এপ্রিল শাহনওয়াজ নেতাজীর কাছে ইম্ফল আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নেতাজী উত্তর দিলেন, আজাদ ব্রিগেড আর গান্ধী ব্রিগেড ইম্ফল আক্রমণ করছে, আর তোমার সুভাষ ব্রিগেড তৈরি থাক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইম্ফল আমাদের হস্তগত হবে, আর তুমি এগিয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে।

শাহনওয়াজ আর এক মুহূর্ত নষ্ট করলেন না, অগ্রসর হলেন কোহিমার দিকে। ব্রহ্মদেশের দুর্গম অরণ্যে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করেছে সৈন্যদের। কিন্তু তার জন্যে উদ্যম কারও দমে যায় নি।

জাপানীদের জীপে চড়ে সৈন্যরা টামুতে এসে পৌঁছল, তারপর পায়ে হেঁটে উখরুল, উখরুল থেকে কোহিমা। কোহিমায় জাপানীরা যুদ্ধ করে নি ইংরেজের সঙ্গে, যুদ্ধ করেছিল ভারতের মুক্তিসংগ্রামী আজাদ হিন্দ ফৌজ, আর এই যুদ্ধে নাগারা তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। ইংরেজের উপরে নাগাদের রাগ অনেক কালের, ইংরেজরা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। তাদের মুক্তি-সংগ্রামের নেতা রাণী গাইডিলিওকে রেখেছে বন্দী করে। বিদেশী বন্ধু জাপানীদেরও তারা চায় না। তারা শুনেছে নেতাজীর নাম। নেতাজীর আদর্শ স্বাধীনতার আদর্শ। শুধু নাগাদের আদর্শ নয়, বিশ্বের সকল পরাধীন জাতির আদর্শ। এই আদর্শের জন্য তারাও প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে। তাই তারাও দলে দলে এগিয়ে এল, বলল, আমাদের দলে নাও, আমরাও তোমাদের সঙ্গে আছি। সুভাষচন্দ্র আমাদেরও নেতাজী, আমরাও তাঁকে তোমাদেরই মতো ভালবাসি।

তারপরে শুরু হল আসামের দুরন্ত বর্ষা। দুর্গম পাহাড়ে তাদের খাদ্য সরবরাহের পথ ভেসে গেল। পরিত্যক্ত পল্লী থেকে যে চাল পাওয়া গেল তাই তারা খেতে লাগল ঘাসের সঙ্গে সেদ্ধ করে। এ ছাড়া আর কোন খাদ্য নেই। এক ফোঁটা নুন পর্যন্ত জুটল না। তারপরে সেই ভীষণ মাছিগুলো, একবার কামড়ালে আর রক্ষা নেই, ঘা হয়ে পোকা হবে সেই ঘায়ে। ডাক্তার হাত গুটিয়ে বসে আছে, ফুরিয়ে গেছে ওষুধ। কিন্তু মনোবল কারও ফুরিয়ে যায় নি। সেনাপতিরা বলছেন, হুকুম দাও, ইম্ফল আমরা এখনও অধিকার করতে পারি।

কিন্তু জাপানী সেনাপতির অন্য হুকুম এল, অবস্থা এখন প্রতিকূল, পিছিয়ে এস।

বড় সেনাপতির আদেশ, মানতেই হবে। ভগ্ন মনোরথে শাহনওয়াজ খান তাঁর ক্ষুব্ধ সেনাবাহিনী নিয়ে কোহিমা থেকে পিছিয়ে এলেন। বর্ষা শেষ না হলে ইম্ফল আক্রমণ করা হবে না।

সৈন্যরা বলল, না, জাপানীদের কথা আমরা মানব না, ওরা ঠকাচ্ছে আমাদের।

এ কথা জানতে পেরে জাপানীরা নালিশ করল নেতাজীর কাছে। নেতাজী সবাইকে ফিরিয়ে আনলেন ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন নদীর পারে। বললেন, আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'করব, না, মরব' এই সংকল্পের বলেই জয়ী হচ্ছিলাম। বুকের রক্ত দিয়ে ত্যাগের যে ঐতিহ্য আমরা সৃষ্টি করেছি, স্বাধীন ভারতের ভাবী সৈন্যদের তাই অনুকরণ করতে হবে। প্রচণ্ড বর্ষাতেই আমাদের পরিকল্পনা ব্যাহত হল, আমাদের অভিযান আমরা সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখলাম।

দুঃখে কষ্টে খাদ্যাভাবে অন্যান্য ব্রিগেডের সৈন্যরাও পিছু হটতে চায় নি। নাগারাও এগিয়ে এসে বলেছিল, তোমরা পিছিয়ো না, আমাদের খাদ্য আমরা তোমাদের দেব। তোমরা ইংরেজদের তাড়াও, তোমরা বিদেশীদের তাড়াও, আনো নেতাজীকে, তাঁকে আমরা রাজা বলে মানব।

কিন্তু হাজার হাজার সৈন্যকে নাগারা কত দিন খাওয়াতে পারে! জাপানী সেনাপতিদের হুকুমে তাদেরও পিছিয়ে আসতে হল, মানতে হল নেতাজীর আদেশ।

এর পরে আর যুদ্ধ হয় নি। যুদ্ধ করবার জন্যে আদেশ দেয় নি কেউ। আজাদ হিন্দ ফৌজ হারিয়েছিল নেতাজীকে, নেতাজী হারিয়ে গিয়েছিলেন, আর তাঁকে কোনদিন দেখতে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু নাগাদের যুদ্ধ আজও থামে নি, আজও তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কবে তারা শান্ত হবে, সেই সুদিনের জন্য ভারত সরকার আজও অপেক্ষা করে আছেন।

৩৭

সকালবেলায় আমরা তৈরি হবার আগেই শর্মা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন : আজ আমাদের একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : পথে কোথাও কাজ আছে নাকি ?

শর্মা বললেন : কাজ নয়, সন্ধ্যাবেলায় গৌহাটি পৌঁছতে হবে তো ! ড্রাইভার বলছিল, দুপুরে কোথাও বিশ্রাম নেওয়া দরকার, তা না হলে রোদে কষ্ট হবে।

শর্মার সঙ্গে আমি প্রকাশবাবুর পরিচয় করে দিলুম। বললুম : ভারি বিপদে পড়েছেন ইনি। তেজপুরে এঁর বাড়ি, অথচ ঘটনাচক্রে এখানে এসে পড়েছেন।

শর্মা বললেন : এ আবার বিপদ কী ! শিলঘাটে আপনাকে নামিয়ে দেব, নদীর ওপারেই তো তেজপুর।

প্রকাশবাবু বললেন : আপনারা কি শিলঘাটের ওপর দিয়ে যাবেন ?

যেতেই হবে, শিলঘাটের ওপর দিয়েই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

এ কথায় প্রকাশবাবু খুবই আশ্বস্ত হলেন, সানন্দে বললেন : তবে তো আমার সমস্ত সমস্যাই মিটে গেল। প্লেনের ঝামেলাও করতে হবে না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : কী বলে যে আপনাদের ধন্যবাদ দেব !

আমি বললুম : ধন্যবাদ দিতে হবে না, গাড়িতে বসে মনিপুরের গল্প বলবেন।

নিশ্চয়ই বলব।

গাড়িতে বসে প্রকাশবাবু আমাদের মনিপুরের গল্প শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন : মোটর বাসে ডিমাপুর থেকে কোহিমা পৌঁছতে তাঁর

ঘণ্টা চারেক সময় লেগেছিল। কোহিমায় তিনি নেমে গিয়েছিলেন নিজেদের কাজে। কিন্তু যাত্রীরা অনেকেই সোজা ইম্ফলে গিয়েছিলেন। কোহিমার বাজারে তাঁরা সামান্য কিছু খেয়েছিলেন। সেই বাস ইম্ফলে পৌঁছয় সন্ধ্যাবেলায়, ঘণ্টা সাতেক সময় লাগে, দূরত্ব প্রায় ছিয়াশি মাইল। এখান থেকে পথ নেমে গেছে নিচের দিকে। দূরে দূরে নাগাদের গ্রাম।

একটু ভেবে বললেন: বোধহয় বলেছি, কোহিমার কাছেই কোহিমা নামে একটি গ্রাম আছে। নাগাদের এত বড় গ্রাম এ অঞ্চলে আর নেই। ইম্ফলের পথে একটি গ্রামের নাম শুনে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম। সেই গ্রামে আছে বিজলির আলো। সেখানকার একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান একটি ঝর্ণা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এ কি নাগাদের কোন প্রতিষ্ঠান?

প্রকাশবাবু বললেন: সে কথা জানতে চাই নি। নাগা এলাকায় নাগাদেরই সম্পত্তি হবে বলে ধরে নিয়েছিলাম।

তারপরে বললেন: মাও নামে একটি গ্রামে এসে বাস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। নাগাল্যাণ্ডের শেষ গ্রাম এটি, তারপরেই মনিপুর রাজ্য। সেখানে অনেক ছোট বড় ছেলেমেয়ে দেখেছিলাম, সকলেরই মাথা কামানো। শুনলাম যে বিয়ের পরে নাকি মেয়েরা আর মাথা কামাবে না। পুরুষেরা তাদের মাথার চারিধার কামিয়ে মাঝখানে একটা ঝুঁটি বেঁধেছে।

শিবসাগর শহর ছাড়িয়ে আহোম রাজাদের পুরাকীর্তি ছাড়িয়ে আমরা যোরহাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। শর্মা আজ ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন, আর প্রকাশবাবু আমার পাশে বসেছিলেন পিছনে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম: ইম্ফলে কখন পৌঁছলেন?

প্রকাশবাবু বললেন: রাত আটটায়। তার পরের দিনটাই শুধু সেখানে ছিলুম। যা দেখবার তা এক দিনেই দেখে নিয়েছি।

এর পরে তিনি আমাকে শহরের বর্ণনা দিলেন। সমুদ্র সমতল

থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচুতে এই শহরটির চারিদিক ঘিরে উঁচু পাহাড়। ছোট শহর, কিন্তু সুন্দর পরিচ্ছন্ন। প্রশস্ত রাজপথের ধারে বড় বড় গাছ ছায়া বিস্তার করে আছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে বৃটিশ রেসিডেন্সী, তার কাছেই পোলো খেলার মাঠ। পোলোকে মনিপুরীরা কাঙ্গাই বলে। আমি শুনেছিলুম যে পোলো আর হকি মনিপুরের নিজস্ব খেলা, মনিপুর থেকেই এই দুটি খেলা সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়েছে। পোলো খেলায় মনিপুরীরা এক সময় অপরাজেয় ছিল।

বৃটিশ রেজিমেণ্টের ময়দানের সামনে দিয়ে পুরনো রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে হয়। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বিরাট দুর্গ, দরবার গৃহ ঠিক প্রবেশ পথের মুখেই, খড় দিয়ে ছাওয়া তার ছাদ। এক সময় নাকি সামনে দুটি পাথরের বিরাট ড্র্যাগন ছিল, এই মূর্তির সামনেই অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হত। জল্লাদের কাজ করত ভীষণদর্শন নাগারা। ড্র্যাগনকে এরা বলে নংসা, আর দরবারকে বলে কংলা। এখন আর নংসা দুটো সেখানে নেই, আর কংলার সামনে হয় লামচেন, আধ মাইল লম্বা সিধে সড়কের উপরে দৌড়ের প্রতিযোগিতা। দুর্গের পিছনে আছে শুষ্ক পরিখা, তারও পিছনে ক্ষীণস্রোতা মনিপুর নদী। মনিপুরের রাজারা যখন এই দুর্গ সংলগ্ন প্রাসাদে বাস করতেন, পিছনের পরিখা তখন জলে পূর্ণ থাকত, আর বাচখেলার উৎসব হত প্রতি বছর, রাজা নিজে এসে নৌকোর হাল ধরতেন।

মনিপুরের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখে আশ্চর্য হতে হয়। খড়ের চালের রাজপুরী, তার পাশেই গোবিন্দজীর মন্দির আর নাটমন্দির। মন্দিরের দেওয়াল থেকে এখন চুন বালি খসে পড়ছে।

টিকেন্দ্রজিতের পরিত্যক্ত বাড়িও এখান থেকে দেখা যায়।

কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে প্রকাশবাবু কিছু বললেন না। অথচ এই টিকেন্দ্রজিতের কথাই মনিপুরের শেষ কথা। টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসিতেই স্বাধীন মনিপুরের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে।

প্রকাশবাবু বললেন : মনিপুরের নতুন রাজপ্রাসাদটিও দেখেছি। পুরনো প্রাসাদ থেকে অল্প দূরে মস্ত বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে এই প্রাসাদ। সামনে শান বাঁধানো চত্বর, তার মধ্যে ফোয়ারা। ডান দিকে দরবার-গৃহ, আর বাম দিকে গোবিন্দজীর মন্দির, সোনার পাতে মোড়া তার গম্বুজ দুটি। বিরাট একটি নাটমণ্ডপ মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন।

একটু থেমে প্রকাশবাবু বললেন : তবে মনিপুর দেখার সময় এ নয়। মনিপুর দেখতে হয় দুর্গাপুজোর সময়, বা রাসলীলা ও দোলে। দুর্গাপুজোর অষ্টমী ও বিজয়ায় সরকারী উৎসব আছে। গ্রাম-গ্রামান্তের সর্দারেরা সুসজ্জিত দোলায় চেপে শহরে আসে রাজদর্শনে, শহরের বাহিরে বরে নামে একটা জায়গায় দরবার হয়। আর বিজয়ায় কুয়াক তল্‌বা নামে আর এক উৎসব। রাসলীলা বা দোলে গেলে মনিপুরী সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি প্রশ্ন করলুম : মনিপুরের শিল্প সংস্কৃতির কিছু দেখে এসেছেন তো ?

প্রকাশবাবু হেসে বললেন : সুটকেশে আছে।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : মনিপুরীদের হাতের কাজ খুবই চমৎকার। যেমন তাদের হাতে তৈরি বাঁশ আর বেতের শৌখিন জিনিসপত্র, তেমনি তাঁতে বোনা কাপড়। নকশার বাহার আর সস্তা দাম দেখে কিছু কিনেই ফেললাম।

আমি বললুম : মনিপুরের নাচ দেখে আসেন নি ?

সুযোগ থাকলে দেখে আসতাম। তবে ওদের গানের সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে গান শোনবার শখ মোটেই নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কী রকম ?

ভদ্রলোক বললেন : সে নাকি বিকট চীৎকার, গান থামলেই প্রাণে আরাম পাওয়া যায়।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : এ কথা সত্য হতেই পারে না।

যাদের শিল্পানুভূতি সূক্ষ্ম, নৃত্যে যাদের রসবোধ সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে, তাদের সঙ্গীত কখনও শ্রুতিকটু হতে পারে না। আপনি বোধহয় নাগা কিংবা অন্য কোন উপজাতির গানের কথা শুনে থাকবেন।

প্রকাশবাবু সহজেই এ কথা মেনে নিলেন, বললেন: তাই হবে।

আমি বললুম: মনিপুরী কীর্তনের খুব নাম আছে। বোধহয় নবদ্বীপে শুনেছেন।

মনিপুরী নৃত্য আমি কলকাতায় দেখেছি। এই লোকনৃত্য এখন ধ্রুপদী নৃত্য রূপে সম্মানিত হচ্ছে। ভরতনাট্যম কথাকলি ও কথক এই তিনের সঙ্গে মনিপুরী নৃত্যও সমানে পাল্লা দিচ্ছে। আমি শুনেছিলুম যে মনিপুরের সব মেয়েকেই নাচ শিখতে হয়, আর পুরুষরা শেখে শখে। নাচগান মনিপুরের প্রাত্যহিক জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রত্যেক পরিবারের মেয়েকেই তাই নিষ্ঠার সঙ্গে নাচতে হয়।

রাসলীলা তাদের অত্যন্ত প্রিয় নাচ। আর একটি বিশিষ্ট নাচের নাম শুনেছিলুম লাই হরুয়াবা। এই নাচটি যে কত পুরনো তা জানা যায় না। এই নাচের উৎপত্তি নিয়ে প্রবাদ আছে দেশে। শিব আর পার্বতী লীলা করবেন, তার জন্য উপযুক্ত স্থান চাই, দুজনে সেই স্থান খুঁজতে বেরলেন। হিমালয় ছেড়ে তাঁরা মনিপুরের পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেন, দেখতে পেলেন এই সুন্দর উপত্যকাটি, কিন্তু জলে তা জলময়। শিব তখন তাঁর ত্রিশূল দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করলেন, আর তখনই সমস্ত জল পাহাড় বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। সেদিন থেকেই এই উপত্যকা হল নাচের উপযুক্ত একটি রঙ্গমঞ্চ। শিব হাতে নিলেন মৃদঙ্গ আর পার্বতী নিলেন একটি তারের যন্ত্র, আর দুজনে মিলে নাচলেন লাই হরুয়াবা। আজও মনিপুরের এই জনপ্রিয় নাচের সময় পাঙ ও পেনার দরকার—হরপার্বতী যে যন্ত্র বাজিয়েছিলেন সেই দুটি যন্ত্র।

সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরাও স্বীকার করেন যে

লাই হরুয়াবা অনেক প্রাচীন নাচ, এ অঞ্চলের লোক হিন্দু হবার আগে থেকেই এদেশে এই নাচের প্রচলন ছিল।

গ্রামে গ্রামে দেবতার সামনে এই নৃত্য হচ্ছে। মনিপুরে পূজারা ও পূজারিণীদের বলে মাইবা ও মাইবী, তাঁরাও যোগ দেন এই নাচে। শুধু ভক্তি নয়, আনন্দও আছে। পৃথিবীর জন্ম হল, তারপর এল মানুষ। মানুষের এই জন্ম বোঝাবার জন্য ফুল ও ভ্রমরের কল্পনা করা হয়েছে। তারপর দেবতার ভর হবে পুরুষ ও নারীর উপর, তখন তারা প্রেমিকের মতো জোড়ে নাচবে—মনিপুরের অমর প্রেম-কাহিনী খাম্ব ও থইবির কথা অভিনয় করে দেখাবে।

মনিপুরে আরও অনেক লোকনৃত্য আছে, কিন্তু সবই এই লাই হরুয়াবার অনুকরণ।

প্রকাশবাবু বললেন: নাচের সম্বন্ধে আমি খোঁজ নিয়েছিলুম। যে দেশে সবাই নাচে, সে দেশে নাচ দেখবে কে! আমাদের দেশে হল নাচ দেখাবার জন্যে নাচ, আর মনিপুরে নাচবার জন্যে নাচ। রাসলীলাই নাকি অনেক রকম আছে। দুর্গাপূজার সময় কুঞ্জরাস, রাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন প্রেমমধুর জীবনের নাচ। রাসপূর্ণিমায় মহারাস বিরহের নাচ, কৃষ্ণকে হারিয়ে রাধা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, সেই সময়ে কৃষ্ণ ফিরে এলেন। বসন্তরাস দোলপূর্ণিমায়, রাধিকার মানভঞ্জন করেন কৃষ্ণ, এছাড়া আছে নিত্যরাস, দিবারাস, অষ্টগোপী অষ্ট শ্যামরাস। নিত্যরাস সারা বছর হয় বলে ব্যবস্থা করে দেখা সম্ভব।

আমি বললুম: দিন কয়েক থাকলে বোধহয় দেখে আসতে পারতেন।

প্রকাশবাবু বললেন: অত শখ ছিল না। নাচের পোশাক তো ছবিতে দেখেছি, পুতুলও দেখেছি কেষ্টনগরের। ঝকমকে ফাঁপা ফোলা ঘাগরা পড়া মেয়েরা নাচছে, তা কল্পনা করে নিতে পারি। যা পারি নে, তাই দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: সেকি নাচের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়?

প্রকাশবাবু বললেন: মনিপুরের লোগতাক হ্রদ আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। শুনেছিলাম বিষেণপুর যাবার পথে মইরাঙে নেমে এই হ্রদ দেখতে হয়। বাস চলাচল আছে বলে অসুবিধা নেই। আরও কিছু খবরও সংগ্রহ করেছিলাম। মইরাঙ থেকে ডিঙির মতো নৌকো পাওয়া যায়, সরু একটা নদী গিয়ে হ্রদে পড়েছে।

আমি এই হ্রদের সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। বললুম: হ্রদের বৈশিষ্ট্য কিছু আছে?

প্রকাশবাবু বললেন: কাশ্মীরে ডাল লেক দেখেছেন?

দেখেছি।

ভাল লেগেছে নিশ্চয়ই। আমি শুনেছি যে লোগতাক লেক দেখলে প্রাকৃতিক হ্রদ সম্বন্ধে অনেক ভাল ধারণা হবে। মস্ত বড় লেক, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ আর পাহাড়, তার মধ্যে ফলের বাগান, মানুষের বাস। মেয়েরা সুতো কাটছে, তাঁত বুনছে, মাছ ধরছে নৌকোয় করে। তাদের নিরাবরণ বুক, সহজ জীবনযাত্রা, আত্মীয়ের মতো মধুর ব্যবহার।

একটু থেমে বললেন: মনিপুরের সর্বত্র আপনার একটি জিনিস নজরে পড়বে, মেয়েদের প্রাধান্য। হাটে বাজারে কৃষিক্ষেত্রে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় মেয়েরাই যেন আধিপত্য করছে।

আমি হেসে বললুম: প্রমীলার রাজ্য বলুন।

প্রকাশবাবুও হেসে উত্তর দিলেন: বোধহয় তাই।

ড্রাইভারের পাশে বসে শর্মা নিঃশব্দে আমাদের গল্প শুনছিলেন। তিনিও এ কথা শুনে হাসলেন।

এক সময় আমরা যোরহাট ছেড়ে এলুম। এর পরে কাজিরঙ্গার বন আসবে, তারপরে শিলঘাট। শিলঘাটে প্রকাশবাবু নামবেন। দুপুরের আহার আমরা সেখানেই করব। অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যে প্রকাশবাবু বোধহয় ক্লান্ত বোধ করেছিলেন, তিনি এবারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে রইলেন। ড্রাইভারের সঙ্গে শর্মা কিছু কথাবার্তা বলে এখন নীরবে আছেন। এখন আমরা নীরবেই পথ অতিক্রম করব।

পথ ভাল, নিশ্চিন্তে নিরাপদে এ পথ অতিক্রম করা যায়। মাঝে মাঝে এক আধটা মোটর কিংবা ট্রাক আসে সামনে থেকে। দূর থেকেই দেখা যায় বলে আরোহীদের মনের উপর কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করে না। উদ্বেগ পাহাড়ের পথে, যখন আমরা একপাশে খাদ দেখি, আর সামনে বাঁকের পরে কী আছে তা দেখতে পাই নে।

আমার নিশ্চিন্ত মন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারল না, দূর অতীতে চলে গেল সঞ্চরণশীল মন। মনিপুরের পুরনো ইতিহাস আমার মনে পড়ছে। খুব বেশি দিনের ইতিহাস নয়, এই স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত।

মনিপুরের অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে হরপার্বতী যখন মনিপুরে আসেন লীলার জন্য তখন তাঁদের নৃত্য দেখতে সমস্ত দেবতারাও এসেছিলেন। সাত দিন সাত রাত্রি নৃত্য হয়েছিল, আর নাগরাজ অনন্ত তাঁর মাথার মনির আলোয় দেশটা উদ্ভাসিত করেছিলেন। এই কারণেই দেশের নাম হয়েছে মনিপুর, আর অনন্ত নাগকেই মহাদেব রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সেই সময়ে দেবতারা খেলেছিলেন কয়েকটি খেলা—পোলো বাচ আর টাগ অব ওয়ারের মতো বাঁশ টানাটানির খেলা। এখনও এইসব খেলা মনিপুরে প্রচলিত আছে।

অনন্ত নাগ এখানে বেশি দিন রাজত্ব করেন নি। কিছু কাল পরেই তিনি নিজের রাজ্য পাতালে ফিরে গিয়েছিলেন। আর মনিপুরের রাজা হয়েছিলেন গন্ধর্ব চিত্রভানু। চিত্রাঙ্গদার পিতার নাম চিত্রবাহন। তিনি মহাভারতের যুগে মনিপুরের রাজা ছিলেন।

তারপর দীর্ঘ দিনের ঘটনা আমরা জানি না। সাতশো বছর আগে চীনারা নাকি একবার মনিপুর আক্রমণ করে, কিন্তু জয়লাভ করতে পারে নি। মনিপুরীরা অনেক চীনা সৈন্য বন্দী করেছিল। সেই চীনারাই নাকি মনিপুরে থেকে এ দেশের অধিবাসীদের গুটিপোকার চাষ আর ইঁট তৈরি করা শিখিয়েছিল।

মনিপুরীদের বলে মৈতেই, তারা মঙ্গোলীয় জাতির ভোটব্রহ্ম শাখার কুকি-চীন গোষ্ঠীর মানুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পানহেইবার নামে একজন নাগা যখন মনিপুরের রাজা তখন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এসেছিলেন তাঁর রাজসভায়। রাজাকে বলেছিলেন, তুমি চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়, অর্জুন তোমার আদিপুরুষ।

এই সংবাদ পেয়ে রাজা গৌরবান্বিত বোধ করলেন। তখনই তিনি বাঙালী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকদের নিকটে দীক্ষা নিলেন। তাঁর নাম হল গোপাল সিং। উপাধি নিলেন গরিব নেওয়াজ। পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা কিয়াম্বা ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সেই সময়েই মনিপুরে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলে অনেকে অনুমান করেন।

মনিপুরের রাজসিংহাসন কলঙ্কিত হয়েছে গৃহবিবাদে, স্বাধীনতা নষ্ট হবার কারণও এই গৃহবিবাদ। গরিব নেওয়াজ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাঁর চল্লিশ বছরের রাজত্বকালে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকেও দেশের উন্নতি বিধানে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু একটি ভুলে প্রবল গৃহবিবাদের সূত্রপাত করে গেলেন। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। প্রথমার পুত্রের নাম শ্যাম শাহ, আর দ্বিতীয়ার ছটি পুত্র, অজিত শাহ তাদের মধ্যে বড়। দ্বিতীয়া পত্নীর অনুরোধে ও গুরুর

প্রভাবে তিনি শ্যাম শাহকে বঞ্চিত করে অজিত শাহকে নিজের জীবদ্দশাতেই সিংহাসনে বসালেন। শ্যাম শাহ এতে আপত্তি করেন নি, শত্রুতাচরণও করেন নি, কিন্তু অজিত শাহ নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার আড়াই বছর পরে গরিব নেওয়াজ শ্যাম শাহকে নিয়ে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল কিছু রাজনৈতিক মীমাংসা। এই কাজে সফল হয়ে যখন তিনি ফিরছেন, তখন অজিত শাহ খবর পেলেন যে তাঁর পিতা শ্যাম শাহকে বঞ্চিত করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন এবং তাকে এখন সিংহাসনে বসাতে ইচ্ছা করছেন। এই সংবাদ পেয়েই অজিত শাহ পথে তাঁদের হত্যা করালেন। এদের সঙ্গে মনিপুরের জন কুড়ি নেতারও প্রাণ গেল।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কথা মনিপুরে গোপন রইল না। অজিত শাহর পঞ্চম ভ্রাতা ভরত শাহ একটি শক্তিশালী দল গঠন করে রাজাকে নির্বিবাদে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হুকুম করলেন। প্রাণের ভয়ে অজিত শাহ পালাতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু রাজ্য উদ্ধারের জন্য ইংরেজের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভরত শাহর মৃত্যুর পরে শ্যাম শাহর পুত্র জয় সিংহ তখন মনিপুরের রাজা। ইংরেজ জয় সিংহকে সমর্থন করল।

জয় সিংহের মৃত্যুর পরে আবার শুরু হল ষড়যন্ত্র। পর পর দুজন রাজা নিহত হবার পর তৃতীয় রাজাকে হত্যা করতে না পেরে অন্য এক ভ্রাতা খাল কেটে ব্রহ্মদেশের কুমীরকে ডেকে আনলেন। অন্য দিকে কাছাড় ও ইংরেজ। ব্রহ্মরাজ মনিপুর দখল করেছিল। ইংরেজ যুদ্ধ করল ব্রহ্মদেশের সঙ্গে। সন্ধি হল ইয়ান্দাবোর। এদিকে মনিপুরের এক রাজপুত্রও মনিপুর দখল করে রাজা হয়ে বসলেন, তাঁর নাম গম্ভীর সিংহ। বীর নরসিংহ তাঁর সেনাপতি হলেন।

নরসিংহ যোগ্য সেনাপতি ছিলেন। মনিপুরকে শত্রুমুক্ত করে তিনি রাজ্যের সীমা প্রসারিত করলেন। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত

হল। কিন্তু দীর্ঘ দিন এই শান্তি স্থায়ী হয় নি। গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর সময়ে তাঁর পুত্র চন্দ্রকীর্তি ছিলেন এক বৎসরের নাবালক। রাজা তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিকে পুত্রের অভিভাবক করে গেলেন এবং নরসিংহ এই বিশ্বাস সর্বতোভাবে রক্ষা করছিলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে আবার ষড়যন্ত্র শুরু হল। নরসিংহের এক ভাই দেবেন্দ্র সিংহ নবীন সিংহ নামে এক অনুচরের পরামর্শে রাণীকে বোঝালেন যে চন্দ্রকীর্তির বিপদ আসন্ন; কাজেই রাণীও ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। নরসিংহ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন, কিন্তু নেপথ্যে যে তাঁর ভাই দেবেন্দ্র সিংহ ও নবীন সিংহ আছে তা জানতে পারেন নি। ভয় পেয়ে রাণী চন্দ্রকীর্তিকে নিয়ে কাছাড়ে পালিয়ে গেলেন। নরসিংহ তখন নিজে রাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন।

কিন্তু তিনিও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারলেন না। ধীর ধার্মিক প্রজানুরঞ্জন রাজা যখন সন্ধ্যাবেলায় দেবতার মন্দিরে বন্দনারত, তখন অতর্কিতে নবীন সিংহ তাঁকে খড়্গ হাতে আক্রমণ করলেন। রাজা তাঁর জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হাতটা কাটা গিয়েছিল। সেই ক্ষত থেকেই তাঁর মৃত্যু হল।

এর পরে দেবেন্দ্র সিংহ রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। চন্দ্রকীর্তি কাছাড়ে আত্মগোপন করে ছিলেন, যৌবনে পদার্পণ করেই ফিরে এলেন মনিপুরে। একাকী পদব্রজে নিঃসম্বল অবস্থায় এসে পেঁ ছিলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় দিতেই মনিপুরীরা দলে দলে এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হল। অত্যাচারী দেবেন্দ্র সিংহকে তারা চায় না, চন্দ্রকীর্তিকেই তারা রাজা বলে মেনে নিল।

যুদ্ধে জয় হল চন্দ্রকীর্তির, দেবেন্দ্র সিংহ পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন।

এই চন্দ্রকীর্তিরই তৃতীয় পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ ছিলেন মনিপুরের

সমস্ত অধিবাসীর প্রিয় পাত্র। তাঁর মৃত্যুতেই মনিপুরে স্বাধীনতার দীপ চিরদিনের মতো নির্বাপিত হয়েছে।

চন্দ্রকীর্তি রাজত্ব করেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর, মৃত্যুর পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্রকে রাজপদে ও দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র কুলচন্দ্রকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করে যান। প্রবীণ সেনাপতির মৃত্যুর পরে টিকিন্দ্রজিৎ নিযুক্ত হলেন সেনাপতির পদে। যেমন সুন্দর সুগঠিত তাঁর দেহ, তেমনি রূপ। চারিদিকের বিদ্রোহ দমন করে তাঁর বীরত্বের খ্যাতিও দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে। সেনাপতির পদে তাঁর নিয়োগের সংবাদ পেয়ে প্রজাদের আনন্দের আর সীমা রইল না।

কিন্তু ঈর্ষায় জ্বলে উঠলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই পাক্কাসেনা। টিকেন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। বিরোধ ঘোরাল হয়ে উঠল মনিপুরের এক সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে। টিকেন্দ্রজিৎ তাকে বিয়ে করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু পাক্কাসেনা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন। যুবরাজ নিলেন টিকেন্দ্রজিতের পক্ষ, আর রাজা পাক্কাসেনাকে সমর্থন করলেন। সমস্ত রাজ-পরিবার দু দলে বিভক্ত হয়ে গেল।

এদিকে তরুণ রাজকুমার জিন্না সিংহের সঙ্গে পাক্কাসেনার ঝগড়া চলছিল। পাক্কাসেনার পরামর্শে রাজা একদিন রাজকুমারকে দরবারে অপমান করলেন। আর যায় কোথা! রাজকুমার একদিন মধ্যরাত্রে রাজপুরী আক্রমণ করলেন। চারিদিক থেকে গুলিবর্ষণ হচ্ছে দেখে ভীরু রাজা খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন, আশ্রয় নিলেন বৃটিশ রেসিডেন্সিতে। ইংরেজ এই রেসিডেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছিল চন্দ্রকীর্তির নাবালকি আমলে।

রাজা শূরচন্দ্র শুনেছিলেন যে টিকেন্দ্রজিৎ রাজকুমারের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ভয়ে তিনি রেসিডেণ্ট গ্রিমউড সাহেবকে দেশত্যাগের সংকল্প জানালেন, বললেন যে বাকি জীবন তিনি বৃন্দাবনে কাটাবেন।

গ্রিমউড দম্পতি টিকেন্দ্রজিতের পরম বন্ধু ছিলেন, কাজেই তিনি সহজেই রাজার প্রস্তাবে রাজী হয়ে রাজাকে রাজ্যের বাহিরে পৌঁছে দিলেন। কুলচন্দ্র এবারে রাজপ্রতিনিধি হলেন, আর টিকেন্দ্রজিৎ পেলেন যুবরাজের পদ।

এই গোলমালে রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয় নি। প্রকৃত প্রস্তাবে টিকেন্দ্রজিৎ ছিলেন দেশের শাসনকর্তা, আর তাঁর সুশাসনে প্রজাদের সুখ শান্তির কোন অভাব ছিল না। কিন্তু গোলমাল বাধাল ইংরেজ। শূরচন্দ্র বৃন্দাবনে যান নি, কলকাতা থেকে ইংরেজের কাছে তাঁর নির্বাসনের কথা জানিয়েছিলেন। বড়লাট ল্যান্সডাউন টিকেন্দ্রজিৎ এই গোলমালের মূলে আছেন মনে করে তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বড়লাটের আদেশ নিয়ে আসামের চীফ কমিশনার কুইন্টন সাহেব কয়েক শো সেনা ও সেনাপতি নিয়ে মণিপুরে এসে রেসিডেন্সীতে আশ্রয় নিলেন। ঠিক করলেন যে এক দরবারে টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করে নির্বাসনে পাঠাবেন।

কুইন্টন সাহেব দরবার ডাকলেন, কিন্তু তাঁদের দুরভিসন্ধি সফল হল না। টিকেন্দ্রজিৎ ইংরেজের ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে দরবারে এলেন না। দরবার পিছিয়ে দেওয়া হল, তবু তিনি এলেন না। বলে পাঠালেন, তাঁর শরীর অসুস্থ। নিরুপায় হয়ে ইংরেজরা রাতে রাজপুরী আক্রমণ করল। কিন্তু কোথায় টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ ও তাঁর পরিবারকে কোথাও পাওয়া গেল না।

ইংরেজরা ফিরে যেতেই মনিপুর দুর্গ থেকে মনিপুরীরা বেরিয়ে রেসিডেন্সি আক্রমণ করল। সারা দিন যুদ্ধের পরে ইংরেজরা সন্ধি করল। রাত্রে আবার রাজপুরীতে এল সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। টিকেন্দ্রজিৎ বললেন, অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করলেই সন্ধি হতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা বলল, সে বড় অসম্মানের কথা। কাজেই সন্ধি হল না। টিকেন্দ্রজিৎ ভিতরে চলে গেলেন, ও মনিপুরীরা আবার আক্রমণ করল সাহেবদের। একজন মনিপুরীর বর্শার আঘাতে

গ্রিমউড সাহেব মারা পড়লেন, আর বাকি চারজনের মুণ্ড কাটলেন দুর্ধর্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ থঙ্গাল জেনারেল। গোলমালের সময় থঙ্গাল তোপখানায় কর্মরত ছিলেন। আচম্বিতে একজন মনিপুরী বৃদ্ধ এসে তাঁকে শাস্ত্রের নির্দেশ শুনিয়ে দিয়েছিল—মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য শত্রুর পাঁচটি মাথা চাই। টিকেন্দ্রজিৎ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, আর থঙ্গালের আদেশে এক ঘাতক সাহেবদের মাথা কেটে নিল।

উত্তেজিত মনিপুরীরা তার পরেও গোলাগুলি চালিয়ে রেসিডেন্সিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিদেশীরা অনেক দুঃখে-কষ্টে পায়ে হেঁটে মনিপুর ত্যাগ করল। মিসেস গ্রিমউড তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। এই মিসেস গ্রিমউডই লিখেছেন My Three Years in Manipur। তাঁদের নবীন দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি হয়েছিল এই মনিপুরে, তবু তিনি টিকেন্দ্রজিৎকে দায়ী করেন নি তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য।

কিন্তু ইংরেজ এ অপমান সহ্য করে নি। ইংরেজরা চারিদিক থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে মনিপুর আক্রমণ করেছিল। মনিপুরীরা বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু প্রবল ইংরেজশক্তির সামনে বেশি দিন দাঁড়াতে পারে নি। রাজধানী ইম্ফল জয় করে তারা রাজাকে পায় নি, পায় নি টিকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গাল জেনারেলকে।

এঁদের ধরে দেবার জন্যে ইংরেজ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। ধরা পড়েছিলেন রাজা কুলচন্দ্র ও থঙ্গাল জেনারেল, কিন্তু টিকিন্দ্রজিৎ ধরা পড়েন নি। অসুস্থ অবস্থায় তিনি এক গ্রামবাসীর আশ্রয়ে নিরাপদেই ছিলেন। দীর্ঘ দিন তাঁর এই পলাতক জীবন ভাল লাগে নি, শেষে তিনি নিজেই ধরা দিয়েছিলেন।

ইংরেজের বিচারে রাজার নির্বাসন হল, আর ফাঁসি হল টিকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গাল জেনারেলের। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের তেরই আগস্ট বিকেলবেলায় ইম্ফলের পোলো খেলার মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। কাতারে কাতারে লোক এসেছে, মনিপুরী আর নাগা কুকি

প্রভৃতি উপজাতীয়েরা। বত্রিশ বছরের বীর টিকেন্দ্রজিৎকে তারা শেষ দেখা দেখবে। আর দেখবে অশীতিপর বৃদ্ধ থঙ্গাল জেনারেলকে, একদা যার নামে মনিপুরের মেয়ে পুরুষ আতঙ্কে আত্মগোপন করত। এই জনতার মধ্যে টিকেন্দ্রজিতের আটজন পত্নী ও একমাত্র পুত্র চৌবারও আছেন, বয়স তাঁর দশ বছরও হয় নি।

পাশাপাশি ছুটি ফাঁসির মঞ্চ। একজন স্মিতহাস্যে এগিয়ে গেলেন, আর একজনকে আনা হল ধরাধরি করে। তুজনেই নির্ভীক, মৃত্যুকে তাঁরা হাসিমুখে বরণ করলেন।

আকাশে সূর্যাস্ত হল। স্বাধীন মনিপুরের শেষ সূর্য। মাটি হল অশ্রুসিক্ত আর বাতাস ভারি হল রোদনরবে।

কাজিরঙ্গার অরণ্য আমরা কখন পেরিয়ে এসেছি খেয়াল করি নি। মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড যখন মাথার উপরে, তখন আমরা শিলঘাটে এসে পৌছলুম। শিলঘাটেই আমরা আহার সেরে নিলুম, তারপরে বিদায় নিলুম প্রকাশবাবুর কাছে। তিনি আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন, আর দিলেন তাঁর কলকাতার ঠিকানা। বললেন: কোন দিন কলকাতায় এলে আমাকে জানাতে যেন ভুল না হয়।

বললুম: মনে রাখব।

দুপুরে বিশ্রামের পর আবার আমরা যাত্রা করলুম। এবারে শর্মা আমার পাশে বসলেন। বললেন: সন্ধ্যার আগেই আমরা গৌহাটি পৌঁছতে পারব।

আমি বললুম: তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ চলবার পরে শর্মা বললেন: প্রকাশবাবু খুব কষ্ট পেয়েছেন। ইম্ফল থেকে ওঁর প্লেনে আসা উচিত ছিল। শিলচর আগরতলা হয়ে গৌহাটি আসতেন। গৌহাটি থেকে তেজপুর। দুতিন ঘণ্টা সময় লাগত, শারীরিক পরিশ্রম একেবারেই হত না।

আমি বললুম: ওঁর কোহিমায় কাজ ছিল কিনা। তাই এই অসুবিধা ভোগ করতে হল।

শর্মা এ কথার প্রতিবাদ করলেন না, বললেন অন্য কথা: মনিপুর ঠিক ওভাবে দেখবার জায়গা নয়। মনিপুরের শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় না হলে মনিপুর দেখা নিরর্থক। বনবাসী অর্জুনও মনিপুরে

এসে তিন বৎসর ছিলেন, তারপর পঞ্চতীর্থ ঘুরে আবার ফিরে এসেছিলেন মনিপুরে।

সত্যি কথা।

মহাভারতের কাহিনী আমার মনে পড়ল। নাগকন্যা উলূপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ দর্শন করলেন। তারপর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্র তীর ধরে মনিপুরে এলেন। এখানে তিনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখলেন। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী। অর্জুন মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁকে দেখে। তাই রাজা চিত্রবাহনের নিকট নিজের পরিচয় দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। রাজা বলেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ প্রভঞ্জন তপস্যা করে শিবের বর পেয়েছিলেন যে এই বংশে একটি মাত্র সন্তান হবে। এই প্রথমবার এ বংশে কন্যাসন্তান হয়েছে, কিন্তু আমি তাকে পুত্র বলে মনে করি। তার সন্তান আমার বংশধর হবে, এই প্রতিজ্ঞা করে তুমি চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করতে পার।

অর্জুন তাই করেছিলেন। চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করে তিন বৎসর বাস করেছিলেন মনিপুরে, বভ্রুবাহনের জন্মের পরে আবার বেরিয়েছিলেন তীর্থ পর্যটনে। কিন্তু এ অঞ্চল থেকে বিদায় নেবার আগে আর একবার গিয়েছিলেন মনিপুরে। চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন, এখন তুমি আমাদের পুত্রকে পালন কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন তখন তুমি তোমার পিতার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যেয়ো। আমার মা ও ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি আনন্দ পাবে। বিরহে এখন কাতর হয়ো না।

তারপরে অর্জুন মনিপুর থেকে পশ্চিম সীমান্তের তীর্থ প্রভাসে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমরা যে চিত্রাঙ্গদার কাহিনী জানি, সে অন্য রকম। সে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু সেই চিত্রাঙ্গদাই যেন সত্য। সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা একদিন অনুভব করেছিলেন যে যৌবনের মায়া দিয়ে তিনি

প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছেন, তাঁর 'সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন বলে ধিক্‌কার' দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী ছিলেন না, তাঁর রূপ ছিল 'ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।'

ঘন বনে পূর্ণা নদী তীরে ব্রহ্মচারী অর্জুনকে দেখে তিনি নিজেকে চিনলেন।—

'শিখে পুরুষের বিদ্যা, পরে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি,
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।'

পরদিন প্রাতে পুরুষের বেশ ফেলে দিয়ে চিত্রাঙ্গদা রক্তাম্বর পরলেন, কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। কিন্তু অর্জুনকে ভোলাতে পারলেন না। অর্জুন বললেন—

'ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

চিত্রাঙ্গদা নিজেকে তাই ধিক্‌কার দিয়েছেন—

'পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে।'

তাই মদনকে বলেছিলেন—

'এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।'

বসন্তকে বলেছিলেন—

'ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী।'

বসন্ত বলেছিলেন—

'তথাস্তু। শুধু এক দিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।'

এই ধার করা রূপ নিয়ে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তাই এক গভীর বেদনা তাঁর নারীহৃদয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। অন্তরে যদি যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে 'তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই।'

চিত্রাঙ্গদাও তাই শেষরাত্রির সূর্যোদয়ে তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে ফেললেন, বললেন—

'প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।'

'এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রাত তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।'

এক সময় শর্মা আমাকে জাগিয়ে দিলেন, বললেন: আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, শর্মার ডাকেই আমার ঘুম ভাঙল। গৌহাটিতে হোটেলের দরজায় আমরা পৌঁছে গেছি, আর দরজা খুলে ইভা দাঁড়িয়ে আছে আমাকে অভ্যর্থনার জন্য। মুখে তার প্রসন্ন হাসি।

ইভাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম, কিন্তু আমার জন্য যে

আরও অনেক বিস্ময় সঞ্চিত হয়ে আছে তখনও তা জানতে পারি নি। ইভাকে কিছু বলবার আগেই দেখলুম যে অন্ধকারে একখানা রিকৃশা এসে দাঁড়াল, আর যাঁরা নামলেন তাঁরাও আমার পরিচিত। বুড়ো মেধিবাবু আমাদের অফিসের খাজাঞ্চী, তাঁকে ধরে এনেছে কাকতি।

শর্মাও আশ্চর্য হয়েছিলেন, বললেন: ব্যাপার কি কাকতি ?

কাকতি সবিনয়ে বলল: সব ভাল খবর। আপনারা বিশ্রাম করুন, তারপর সব বলছি।

মুখ হাত ধুয়ে আমরা চায়ের টেবিলে এসে বসলুম। চা এল, তার সঙ্গে নানা রকমের খাবার জিনিস। সে সব খেতে খেতেই সব কথা শুনলুম।

কাকতি বলল: ইভা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাইতেই সমস্ত ব্যাপারটা আমরা জানতে পারলাম।

আজ ইভার মুখের হাসি যেন আরও মিষ্টি দেখাচ্ছে।

কাকতি বলল: কালকের ডাকে আমাদের সমস্ত স্টাফের কনফার্মেসন এসেছে, এখন আমাদের সকলের পাকা চাকরি। কিন্তু বড়ুয়া সাহেব ক্ষেপে গেছেন, তিনি সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তা দিন, তাতে আমাদের ক্ষতি হবে না।

উত্তেজিত ভাবে এক সঙ্গে কয়েক চুমুক চা খেয়ে কাকতি বলল: কিন্তু ঐ শকুন আপনার ক্ষতি করতে চেয়েছিল। কাল কুচবিহারে একটা কন্‌ফারেন্সে আপনার যাবার কথা, কাউকে না জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে যে আপনি যেতে পারবেন না।

শর্মা বললেন: এ কথা তোমরা জানলে কী করে ?

কাকতি বলল: কাল রাতে ইভা শুনে এসেছে, সাহেব গৌরব করে তাঁর মেমসাহেবকে বলছিলেন।

হাসতে হাসতে ইভা বলল : কাকতির সাহস দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য হচ্ছি। ও টেলিফোন করে আপনার খবর নিয়েছে, মেধিবাবুকে ধরে এনেছে টাকার জন্য।

কাকতি সহাস্যে মেধিবাবুকে ইশারা করল। বৃদ্ধ তাঁর পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করলেন, আর একটা রসিদে আমার সই করিয়ে নিলেন।

নিশ্চিন্ত হয়ে কাকতি বলল : রাত সাড়ে দশটার পরে এ.টি. মেল ছাড়বে, আপনার জন্যে একখানা বার্থ আমি বুক করে এসেছি। সকাল সাতটার পরে আলিপুর জংসনে গাড়ি বদল করে দশটার পরেই কুচবিহারে পৌঁছবেন। টেলিফোনে আমি ওদেরকে খবর দিয়ে দিয়েছি, স্টেশন থেকে ওরা আপনাকে নিয়ে যাবে।

এদের আন্তরিকতায় আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। কোন কথাই বলতে পারলুম না।

যাবার আগে ইভা আমাকে একখানা চিঠি দিল। বলল : আপনার পার্সোনাল চিঠি বলে অফিস থেকে নিয়ে এসেছি।

চিঠিখানা হাতে দিয়ে ইভা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। স্বাতির চিঠি এসেছে, কাশ্মীর থেকে চলে আসবার পরে এই তার প্রথম চিঠি। আমার মুখে ইভা কী দেখল সেই জানে, প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বেরিয়ে গেল।

স্বাতি তাদের সমস্ত খবর দিয়েছে। দুর্যোগের আশঙ্কাতেই তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। এখন সামলে নিয়েছে তারা। স্বাতি লিখেছে : মা তোমাকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বাধা দিয়েছি। সুখের দিনে যখন আমরা তোমার কথা ভাবব, তখনই আমাদের দুঃখের দিনে তোমাকে ডাকবার অধিকার জন্মাবে।

তখনই আমি স্বাতিকে এই চিঠির উত্তর লিখে ফেললুম : দুঃখের দিনে যে স্মরণ করে, বিষ্ণু তাকে ভক্ত বলে মানেন না। যে তাঁকে স্মরণ করে সুখে দুঃখে সমস্ত ক্ষণ, সে-ই তাঁর ভক্ত। কিন্তু শিবের অন্য নিয়ম। অনেক দুঃখের দু ফোঁটা চোখের জল তাঁর মাথায় পড়লেই তিনি খুশী, দু হাত তুলে বর দেন সেই ভক্তকে। এই জন্যেই মেয়েদের বিষ্ণু পূজার অধিকার নেই, আর শিব পূজা করতে হয় শৈশব থেকে। পুরুষেরা জাত শৈব, আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

কামরূপ পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভ্রমণের আনন্দ চিরন্তন—নতুন দেশ দেখার বাসনা একটা নেশার মতো। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের কাছে তো অপরিহার্য; যাঁরা ভ্রমণ না করেও ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁরাও রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর রম্যাণি বীক্ষ্যর পর্বগুলি পর পর পড়ে যান। ভ্রমণের শখ তাঁদের অনেকাংশে মিটবে।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, রম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই কথা। আর বাস্তবিক, রম্য-দর্শনই হল রম্যাণি বীক্ষ্যর মূল সুর, তার বিস্তার অতীতের ঐতিহ্য আলোচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, পৌরাণিক কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। এতে সমগ্র ভারতের বিচিত্র দর্শনীয় স্থানগুলির সবিস্তার বর্ণনার সূত্র ধরে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট আলোকিত কুঠরীতেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তীর্থ-মাহাত্ম্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্যের বা সংশ্লিষ্ট তীর্থ ও জনপদের বর্তমান পরিচয় দানেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার অতীত কাহিনী কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে বিবৃতি হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ—নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টির সমক্ষে।

শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। রম্যাণি বীক্ষ্যর একটিমাত্র খণ্ডও যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এ বইয়ে ভ্রমণ-কাহিনীর পাশে পাশে একটি রম্য কাহিনীও গ্রথিত আছে। এই জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনী বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। এতে শুধু যে কাহিনীই

জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই নয়, ভ্রমণের রসের ভিতর উপন্যাসের রসেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভ্রমণে যাঁরা ততটা উৎসাহী নন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাঁরা প্রাণরসের সন্ধানী, একমাত্র উপন্যাসের রসের আকর্ষণেই তাঁরাও যে রম্যাণি বীক্ষ্যর প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন তা অসংশয়ে বলা যায়। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসরসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী, মামী ও তাঁদের অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত। তাঁরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাঁদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এই সময় প্লাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগ্‌নে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। কিন্তু পদ-মর্যাদা বা সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মাপকাঠিতে গোপালের বাজারদর যাই হোক, সঙ্গী হিসাবে তার মতো রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ও জ্ঞানান্বেষী যুবককে সঙ্গে পাওয়া আনন্দের কথা। মামা তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন আর গোপালও স্বাতির চোখের তারায় আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। ফলে সেও হল দক্ষিণ ভারতের যাত্রী।

প্রথম গ্রন্থ **দক্ষিণ ভারত পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ধরা দেবার মত সহজ পাত্রীও সে নয়। সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। মাদ্রাজে, মহাবল্লীপুর ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি ও রামেশ্বরে আমরা দুজনকে পাশাপাশি দেখি। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে এক অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **দ্রাবিড় পর্ব**। তাদের ঘরে ফেরার পালা। কেরালা রাজ্য থেকে মহিসুর রাজ্য। হালেবিদ বেলুর ও শ্রাবণ-বেলগোলায় প্রাচীন নিদর্শন দেখে এল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই দ্রাবিড় পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও

আগ্রা অঞ্চলে ভ্রমণরত দেখা গেল। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে।** গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়। মামা অঘোর গোস্বামী গোপালকে গরিব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু মামীর তাতে গভীর আপত্তি। গোপালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজেদের ধনী মানী সমাজে মুখ দেখাতে তিনি ভয় পান।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি চতুর্থ গ্রন্থ **রাজস্থান পর্বে।** দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতোই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থস্থান দ্বারকা সোমনাথ ও জুনাগড়ের কথা **সৌরাষ্ট্র পর্বে** বিবৃত হয়েছে। একদা এই রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্যস্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃত-সংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি, ষষ্ঠ গ্রন্থ **মহারাষ্ট্র পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুণা ভ্রমণে ব্যস্ত। তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু, বিদিশা ও উজ্জয়িনী, ঝাঁসি সাঁচী খাজুরাহো, নাগপুর ও জব্বলপুর।

সপ্তম ও অষ্টম গ্রন্থ **উৎকল পর্ব** ও **উত্তর ভারত পর্বে** সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল শ্বেতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। আবার বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও

মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তারা বিবাহ করে সুখী হয়েছে। গোপালকে দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

নবম গ্রন্থ **হিমাচল পর্বে** গোপাল আবার মামা-মামী ও বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান।

অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীর গেলেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্যদিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে যাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রম্যাণি বীক্ষ্যর দশম গ্রন্থ **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

বাকি আছে শুধু আসাম ও বাঙলার কথা; একাদশ গ্রন্থ **কামরূপ পর্বে** সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ-কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগারাজ্য ও মনিপুরের কথা এবং এই স্বল্প পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীর আশ্চর্য পরিচয়।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক